ভারতের লোকসংস্কৃতি গ্রন্থমালা

আসামের লোকসংস্কৃতি

আসামের লোকসংস্কৃতি

যোগেশ দাশ

অনুবাদ

ক্ষিতীশ রায়



ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, নয়াদিল্লি

1983 (*Saka* 1905)

Reprinted 1986 (*Saka* 1908)

মূল্য : Rs. 15.00

Original Title : FOLKLORE OF ASSAM *(English)*

Bengali Translation : ASAMER LOKSANSKRITI

Published by Director, National Book Trust, India, A-5 Green Park, New Delhi-110016 and printed by Jupiter Offset Press, B-10/3, Jhilmil Industrial Area, Delhi-110032,

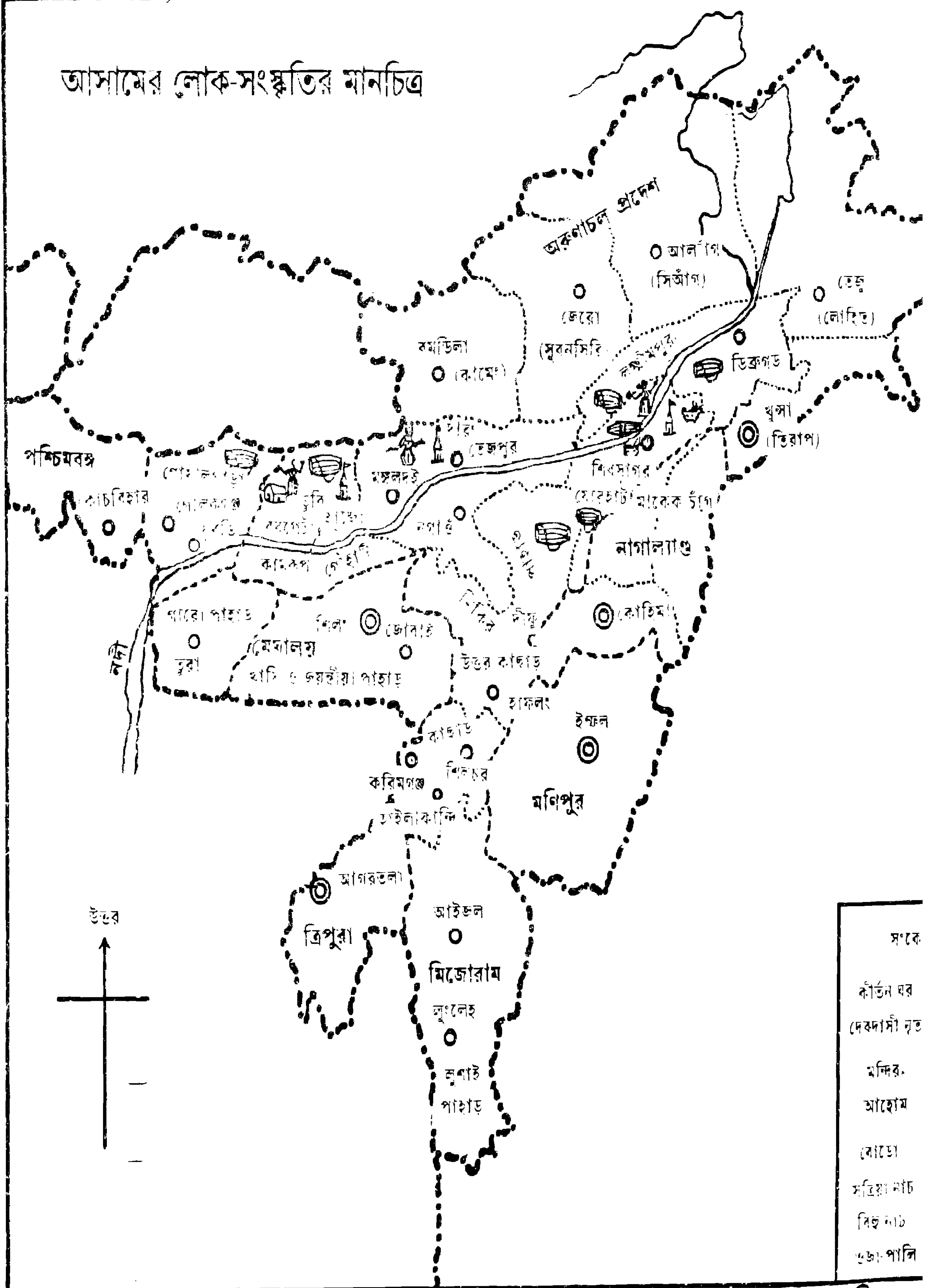
কৃতজ্ঞতা

এই বই রচনায় নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন প্রখ্যাত লেখক শ্রীহেম বরুয়া এম. পি., আসামের ললিত কলা একাডেমীর সচিব শ্রীপ্রদীপ চালিহা, অধ্যাপক হীতেন্দ্রনাথ দত্ত, অধ্যাপক নন্দ তালুকদার, অধ্যাপক নগেন শইকীয়া, অধ্যাপক সৈয়দ আবদুল মালিক, আসামের তথ্য ও জনসংযোগ দফতরের সহযোগী নির্দেশক শ্রীরুদ্র বরুয়া, গৌহাটির সঙ্গীত সত্র-এর অধ্যক্ষ শ্রীরসেশ্বর শইকীয়া বয়ান, শ্রীচক্র বরুয়া, শ্রীউমেশ দাশ, শ্রীবর্মন ও অগণিত বন্ধুবান্ধব. আমি এদের সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

—যোগেশ দাশ

সূচী

চিত্রসূচী



ভারতীয় সর্বেক্ষকের অনুমতিক্রমে ভারতীয় সর্বেক্ষণ বিভাগের মানচিত্র অবলম্বনে

মাটি ও মানুষ

একজন অসমীয়া মানুষের চেহারাটা কি রকম ? একই ভাবে প্রশ্ন করা যায়, একজন ভারতীয় মানুষকে দেখতে কি রকম ? সোজাসুজি দুটি প্রশ্নেরই উত্তর দেওয়া শক্ত। চেহারার ব্যাপারে কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। বিশ্বের প্রায় সকল জাতির উপাদানই ভারতীয় উপমহাদেশের সকল অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সমগ্র ভাবে বলা চলে মানব জাতির সকল বিভাগেরই প্রতিনিধিত্ব করে ভারতবাসী জনসাধারণ। তবু লক্ষ্য করা কঠিন নয় বিভিন্ন জাতির বিশেষ এক ভাগ মানুষ বিভিন্ন দেশের বিশেষ কোন অঞ্চলে গুরুত্ব লাভ করেছে। বিষ্ণুপুরাণ ও মার্কণ্ডেয় পুরাণে এই বিভাজন প্রায় সঠিক ভাবেই বর্ণিত হয়েছে এই ভাবে: 'ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রেরা অবস্থান করে ভারতের মধ্যভাগে। পূর্বে আছে কিরাতেরা এবং পশ্চিমে যবনেরা।' এইভাবে দেখলে সহজেই বুঝতে পারা যায় যে ককেশীয় নর্ডিক আর্যেরা ও ভূমধ্য সাগরীয় দ্রবিড়েরা যথাক্রমে ভারতের উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের বাসিন্দাদের মধ্যে গুরুত্ব লাভ করেছে। তেমনি আসাম, অরুণাচল, নাগাল্যাণ্ড ও মণিপুর সমন্বিত পূর্ব অঞ্চলে গুরুত্ব লাভ করেছে মঙ্গোলীয়েরা।

অবশ্য এ-কথার অর্থ এমন নয় যে বিশেষ জাতি দ্বারা অধ্যুষিত কোন অঞ্চলে অন্যান্য জাতির চিহ্নমাত্র দেখা যায় না। নীগ্রয়ডদের সঙ্গে যেমন এক কালে প্রোটো-অস্ট্রলয়ডদের সংমিশ্রণ ঘটেছিল, তেমনি আর্যেরা যখন পশ্চিম পাঞ্জাবের দিক থেকে এসে উত্তর বিহারে ছড়িয়ে পড়েছিল, সেইসময় থেকে আর্য, দ্রবিড় ও অস্ট্রিক ভাষা-ভাষী লোকেদের মধ্যে জাতিগত সংমিশ্রণ ঘটতে থাকে। এডওঅর্ড গেট-এর মতে: 'সুরমা উপত্যকা বাদ দিয়ে আসামে ও উত্তর-পূর্ব বঙ্গের অনেক খানি অঞ্চল জুড়ে মঙ্গোলীয়েরা দ্রাবিড় শ্রেণীর স্থান গ্রহণ করে। অপর পক্ষে সুরমা উপত্যকায় ও বঙ্গদেশের অবশিষ্ট অংশে বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ ঘটেছিল। সেই সংমিশ্রণে প্রত্যক্ষ মঙ্গোল উপাদান পশ্চিমের দিকে ক্রমশ কমতে কমতে বিহার পৌঁছবার আগেই সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যায়।'

আসামের বাসিন্দাদের মধ্যে এই জাতিগত সংমিশ্রণ ঘটে আসছে বহুকাল ধরে।

বহু সংখ্যক জনজাতি এই জতিপুঞ্জের অন্তর্গত থাকার ফলে আসামে মঙ্গোল প্রভাব অনেকটা বেশি। তাদের শারীরিক গঠন বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে : 'ক্ষুদ্র শির, বিস্তৃত নাসা, চেপ্টা ও অপেক্ষাকৃত কেশবিহীন মুখমণ্ডল, বেঁটে খাটো অথচ পেশীবহুল শরীর এবং ত্বকের বর্ণ হরিদ্রাভ।' কিন্তু মঙ্গোল ছাড়া অন্য অসংখ্য জাতি আছে আসামে। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন, কোন কোন দক্ষিণ-ভারতীয় জনজাতির মতো নাগাদের মধ্যেও নীগ্রয়ড চিহ্ন বা লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায়। অনুমান হয় আসাম অঞ্চলে প্রব্রজন করার পূর্বেই খাসিয়ারা কোন একটি প্রোটো-অস্ট্রলয়ড জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে তাদের অস্ট্রিক ভাষা আয়ত্ত করে থাকবে। কৈবর্তেরা আসামের অনুসূচিত জাতির মধ্যে অন্যতম ; কেউ কেউ বলেন 'দেখলেই মনে হয় এরা দ্রবিড় মূলোদ্ভূত।' এদের দৈহিক গঠন ও মুখাকৃতিতে দ্রবিড় লক্ষণ চিহ্নিত হয় এইভাবে : 'দীর্ঘ শির, আয়ত কৃষ্ণ চক্ষু, প্রলম্বিত শ্মশ্রু, ঘোর কৃষ্ণ কিংবা শ্যাম বর্ণ, প্রশস্ত নাসিকার নিচের দিক চেপ্টা যদিচ মুখমণ্ডল তেমন চেপ্টা নয়।' অতঃপর আসে আর্যদের প্রসঙ্গ—দীর্ঘ তাদের মুখমণ্ডল, দীর্ঘ ও শক্ত সমর্থ তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, উন্নত ও সূক্ষ্মাগ্র তাদের নাসা, পরিষ্কার তাদের গায়ের রঙ। এদের সকলেই আসামে এসেছিল বিহার ও বঙ্গদেশ পার হয়ে। এই সমস্ত বিভিন্ন জাতির দৈহিক বৈশিষ্টগুলি আসাম দেশের বাসিন্দাদের মধ্যে অল্পাধিক পরিমাণে লক্ষ্যগোচর হয়।

সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশে কোন এক বিশেষ জাতির উদ্ভব হয়েছিল বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ভারতে বসবাসকারী যে-কোন জাতি বা উপজাতি এদেশে এসেছিল পূর্ব বা পশ্চিম সীমান্ত অতিক্রম করে। ভারত তথা আসামের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হবার বহু আগে, কোন সুদূর অতীত কালে, এই উপ-মহাদেশে নানা জাতি ও উপজাতির স্রোত একটার পর একটা বয়ে এসেছিল। প্রাক্-ঐতি-হাসিক আদি প্রস্তর যুগের স্তরে নীগ্রয়ডরাই বোধহয় সর্বপ্রথম আসামে পদার্পণ করে থাকবে। তাদের শারীর লক্ষণ কিছু কিছু এখনো নাগাদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। নাগা গোষ্ঠীর জনজাতিগুলি অবশ্য মোঙ্গলীয়—তারা আসামে এসেছিল আদি প্রস্তর যুগের অনেক পরে। তাদের বহু পূর্ববর্তী নীগ্রয়ডদের সঙ্গে নাগাদের রক্তের কিছু সংমিশ্রণ সম্ভবত ঘটে থাকবে। আদি প্রস্তর যুগে নীগ্রয়ডদের পর ভারতে আসে প্রত্ন-প্রস্তর যুগের প্রোটো-অস্ট্রলয়ডরা। এদের ভাষা ছিল অস্ট্রিক গোষ্ঠীভুক্ত। মধ্য ভারতের কোল ও মুণ্ডা জাতি যেমন অস্ট্রিক ভাষাভাষী, খাসিয়া ও জয়ন্তীয়াদের (সিণ্টেং) ভাষাও অস্ট্রিক (মন্-খ্মের)—যদিচ জাতি হিসাবে এরা মোঙ্গল। মনে হয়

কোন সুদূর অতীতে আসাম অঞ্চলে পা দেবার আগে বা পরে এরা মন্‌খ্‌মের ভাষা গ্রহণ করে থাকবে। কালানুক্রমে প্রোটো-অস্ট্রলয়েডদের পরে এসেছিল দ্রাবিড় ভাষাভাষী ভূমধ্যসাগরীয় জাতিসমূহ। কেউ কেউ অনুমান করেন উল্লিখিত কৈবর্তেরা এবং আসামের বেনিয়া শ্রেণীর লোকেরা এই দ্রাবিড় ভাষীদেরই বংশধর। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর আবিষ্কারগুলি দেখলে মনে হয় দ্রাবিড় জাতির সভ্যতা ছিল খুবই উচ্চ স্তরের। খৃষ্টপূর্ব 1500 অব্দেরও আগে, উত্তরপশ্চিম থেকে আর্যদের আক্রমণ শুরু হবার কাছাকাছি কোন একটা সময়ে দ্রাবিড়েরা উত্তরাঞ্চলের গৃহভূমি থেকে উৎখাত হয়ে থাকবে বলে অনুমান করা হয়।

গাঙ্গেয় উপত্যকা দিয়ে পূর্ব ভারত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে আর্যদের কয়েক শতক সময় লেগেছিল। বলা হয় উত্তর বিহারে তারা এসে থাকবে খৃষ্টপূর্ব 700 অব্দ নাগাদ। সুতরাং আসামে তারা এসে পৌঁছেছিল নিশ্চয় তার পরবর্তী কোন কালে। সে যাই হোক, খৃষ্টপূর্ব 500 থেকে খৃষ্টপূর্ব 400 অব্দের মধ্যে রামায়ণ ও মহাভারত লিখিত হয়েছিল বলে বলা হয়। এই দুই মহাগ্রন্থে যে-সব উল্লেখ আছে তা থেকে প্রমাণ হয় যে আর্য ও মোঙ্গল জাতির মধ্যে কিছু কিছু সংযোগ ঘটেছিল। এমন কি রামায়ণে উল্লেখ করা হয়েছে যে অমূর্তরাজস প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁর পৌত্র বিশ্বামিত্র কৌশিক নদীর (সম্ভবত আধুনিক কোশী) তীরে তপস্যা করেছিলেন। প্রাগ্‌জ্যোতিষ আসামের সুপ্রাচীন নাম। দুই মহাকাব্যেই আসামের মোঙ্গল জাতি সম্ভূত কিরাতদের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে: 'সোনার মতো উজ্জ্বল তাদের গায়ের রঙ, যুদ্ধে তারা পারদর্শী এবং আকৃতি তাদের ভয়ংকর।'

মোঙ্গল বাসিন্দাদের পূর্বপুরুষেরা সর্বপ্রথম কখন যে আসামে আসতে শুরু করে সে কথা নিশ্চয় করে বলা শক্ত। তবে এটা নিশ্চিত যে যে-সময়ে আর্য, অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষাভাষীরা ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে হিন্দু সংস্কৃতির ভিত্তি রচনায় ব্যস্ত, সেই সময়ে উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের জীবনযাত্রা মূলত প্রভাবিত হয়েছিল এই সব মোঙ্গল-দের দ্বারা। সেই খৃষ্টপূর্ব 1500 অব্দের শেষ ভাগে যখন আর্যেরা উত্তর-পশ্চিমের গিরিপথ অতিক্রম করে ভারতে আসতে শুরু করেছিল, সেই সময়ে অথবা তার কিছু পরবর্তী কালে মোঙ্গলদের আগমন হয় আসামে। পশ্চিম চীনের মূল বাসস্থান ত্যাগ করে খৃষ্টপূর্ব প্রথম হাজার বছর কাল তারা সদলবলে যাযাবর বৃত্তি অবলম্বন করেছিল বলে শোনা যায়। এইসব ভ্রাম্যমান মোঙ্গলেরা কখন যে ব্রহ্মপুত্রের দুই পারের অঞ্চলে এসে পৌঁছায়, সে কাল নিশ্চয় করে বলা কঠিন। তাদের মূল বাসস্থান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তারা বহু দেশ অতিক্রম করে ছড়িয়ে পড়ে থাইল্যাণ্ড,

ইন্দোচীন ও ব্রহ্মদেশে। অন্যদিকে তারা তিব্বত থেকে লাদাখ পর্যন্ত হিমালয়ের সুবিস্তৃত পার্বত্য অঞ্চল অধ্যুষিত করে।

বহুবিধ মোঙ্গল জাতির মানুষ আসামের পর্বতে প্রান্তরে বসবাস করে। তারা নাগাল্যাণ্ড ও অরুণাচলেও ছড়িয়ে আছে। আসামের জনসংস্কৃতির জটিল নকশায় এদের কার কি স্থান, তার একটা মোটামুটি হিসাব দিলে, এবিষয়ে আমাদের ধারণা খানিকটা স্পষ্ট হতে পারে। নাগাদের এখন নিজেদের রাজ্য হয়েছে। ব্রিটিশ-শাসিত আসামে যে নাগাপাহাড় জেলা ছিল তার সঙ্গে নেফা অর্থাৎ অরুণাচলের টুয়েনসাং বিভাগ জুয়ে দিয়ে এই নাগাল্যাণ্ড রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় 1960 অব্দে। অরুণাচলের টিরাপ সীমান্তের অধিবাসী দুটি নাগা জাতির মানুষ সুদূর অতীত কাল থেকে, নিকটবর্তী সমতলীয় লখিমপুর (অধুনা ডিব্রুগড়) জেলার লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করে আসছে। এদের মধ্যে নক্টেদের সংখ্যা হল 12,000 এবং ওয়াঞ্চোদের সংখ্যা প্রায় 20,000। ব্রিটিশ-শাসিত আসামে খাসিয়া ও জয়ন্তীয়ারা তাদের নামাঙ্কিত জেলায় বাস করত। এখনো তারা সেই একই জায়গায় বসবাস করে কিন্তু আজকাল এই জেলা নবগঠিত মেঘালয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। 1961 অব্দের জনগণনা অনুসারে খাসিয়া-জয়ন্তীয়াদের জনসংখ্যা 3,50,000-এর কিছু বেশী। মেঘালয়ের অপর জেলা গারো পাহাড়ে গারোদের জনসংখ্যা ওই একই অব্দের জনগণনা অনুসারে 3,00,000-এর কিছু বেশী। আসামের মধ্যভাগে অবস্থিত মিকির পাহাড় জেলায় মিকিরদের জনসংখ্যা প্রায় 1,50,000। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষার নিরিখে কুকি ও নাগাদের সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে লিখেছেন: 'মিকিরদের কিছু কিছু লোক-কথা শুনে মনে হয় কল্পনাপ্রবণতা তাদের মনের সহজাত গুণ।'

পূর্ব ভারতে মোঙ্গলসম্ভূত জাতিদের মধ্যে সকলের চেয়ে উল্লেখযোগ্য হল বোড়ো অথবা বোড়ো-রা। 1961-এর জনগণনা অনুসারে আসামে বোড়োদের সংখ্যা প্রায় 3,50,000। কিন্তু তাদের সমগোত্রেরা বঙ্গদেশ ও বিহারের উত্তর অঞ্চলে ছড়িয়ে তো আছেই, এমন কি টিপরাই জাতি হিসাবে ত্রিপুরা রাজ্য তারাই স্থাপন করেছিল। বাংলাদেশের শ্রীহট্ট ও ময়মনসিংহ জেলায় টিপরাইদের দেখা মেলে। হয়তো এক কালে তারা কুমিল্লা ও নোয়াখালি জেলা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। চীন-তিব্বতীয় ভাষাসমূহের অন্তর্গত তিব্বত-বর্মী ভাষাগোষ্ঠী থেকে বোড়ো ভাষার উদ্ভব। অসমীয়া ভাষার বিকাশে বোড়ো ভাষার প্রভূত প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। মেচ, রাভা, গারো ও কাছাড়ি ভাষা এই বোড়ো ভাষারই শাখা। আসামে তৎ তৎ নামের উপজাতীয়েরা

এই সব ভাষা ব্যবহার করে। এই সব উপজাতি ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার সমগ্র সমভূমি অঞ্চলে ছড়িয়ে তো আছেই, তদুপরি দক্ষিণে উত্তর কাছাড় অঞ্চলে ও পশ্চিমে গারো পাহাড়ে অল্পাধিক পরিমাণে বোড়োদের দেখা যায়। বলা হয় মোঙ্গল জাতি হিসাবে বোড়োরা প্রথমে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বসতি স্থাপন করে এবং পরবর্তীকালে এই উপত্যকার ধারে কাছে কিংবা দূরে দূরান্তরে ছড়িয়ে যায়। এই ঘটনার প্রমাণ হিসাবে বলা হয় উপত্যকার অনেক নাম বোড়োদের দেওয়া। বোড়োদের অন্যতম এবং বোড়োদের সম্পর্কে ঘনিষ্ঠ ও বিস্তৃতভাবে যিনি অধ্যয়ন করেছিলেন, সেই প্রখ্যাত অসমীয়া শিল্পী স্বর্গত বিষ্ণুপ্রসাদ রাভা বলতে চেয়েছেন যে 'ব্রহ্মপুত্র' কথাটা আসলে 'ভুল্লুং বুথুর' কথাটার আর্য অথবা সংস্কৃত রূপ। বোড়ো ভাষায় 'ভুল্লুং বুথুর' কথার অর্থ হল 'কল্লোলিত বৃহৎ নদী'। তিনি এমনও বলেছেন 'কামাখ্যা' নামে মহতী দেবীর আদি নাম ছিল কোন মোঙ্গল জাতির ভাষায় 'কামাখে' অথবা 'কামলখী'। নদীর নামের প্রারম্ভে 'দি' উপসর্গটিও বোড়ো ভাষার অবদান বলা হয়। 'দি' অর্থে নদীর জল। ব্রহ্মপুত্রের কয়েকটি সুপরিচিত উপনদীর নাম: দিসাং, দিখৌ, দিব্রু, দিগারু, দিবাং, দিহাং। কবিতা ও গানে অসমীয়ারা 'ব্রহ্মপুত্র' নামের বদলে 'লুইত' কথাটা ব্যবহার করে থাকে। বিষ্ণুপ্রসাদ রাভার মতে 'লুইত' কথাটাও বোড়ো ভাষার 'লাওতি', 'তিলাও' ও 'দিলাও' কথাগুলির অপভ্রংশ মাত্র।

ব্রিটিশ-শাসিত আসামের একেবারে দক্ষিণে অবস্থিত মিজোপাহাড় জেলার মিজো-রা অর্থাৎ লুসাই-রা এসেছিল চিন পাহাড় থেকে। চীন-তিব্বতী ভাষাসমূহের অন্তর্ভুক্ত তিব্বতী-বর্মী গোষ্ঠীর কুকি-চিন ভাষা মিজো-দের ভাষা। মিজোপাহাড় জেলা এখন ভারতের অন্যতম কেন্দ্র-শাসিত রাজ্য—মিজোরাম। মিজোদের জনসংখ্যা প্রায় 2,16,000। জাতি হিসাবে এরা খুবই সংস্কৃতিবান, এদের সাক্ষরতার গড়পড়তা হারও বেশ উঁচু। নগাঁই জেলার লালুং-রাও ছিল একটি মোঙ্গল জাতি। কিন্তু সাম্প্রতিক একটি প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে লালুং-দের ভাষার সঙ্গে সীন্টেং অথবা জয়ন্তীয়াদের ভাষার সাদৃশ্য রয়েছে, লালুংরাও মনে করে সীন্টেংদের থেকেই তাদের উদ্ভব। লালুংরা বসবাসও করে খাসিয়া-জয়ন্তীয়া পাহাড়ের কাছাকাছি।

আসামের একেবারে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে, সুবনশিরী নদীর উপর দিকে এবং অরুণাচলের পর্বতমালার ঠিক তলদেশে, সদিয়া অঞ্চলে অধিকাংশ চুটীয়াদের বাসস্থান। পরবর্তীকালে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করলেও চুটীয়াদের ভাষা বোড়ো শ্রেণীর। নিজেদের এক রাজবংশের সঙ্গে জড়িত হয়ে চুটীয়াদের একটি বেশ বর্ণাঢ্য ইতিহাস আছে। এই রাজবংশকে সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত করে আহোম নামে এক শক্তিশালী মোঙ্গলজাতি

একাদিক্রমে সাত শ' বছর ধরে আসাম শাসন করে। আদিকালে এবং কিছু পরিমাণে আজকের দিনেও চুটীয়ারা মহামাতৃদেবীকে পূজা করে তাঁর 'কেঁচাইখাতী' (কাঁচাখাগী) রূপে। ব্রাহ্মণ্য প্রভাবে চুটীয়ারা তাদের রাজবংশের উদ্ভব পৌরাণিক কাল পর্যন্ত টেনে নিয়ে নিজেদের একটি ইতিহাস রচনা করেছিল। আহোমদের কাছে রাজ্য হারাবার পর চুটীয়ারা অন্য জাতিদের সঙ্গে মিলেমিশে যায়। তাদের অনেকে এখন ছড়িয়ে গেছে লখিমপুর, ডিব্রুগড়, শিবসাগর ও দরং জেলায়।

মিরি-রা নিজেদের 'মিশিং' নামে পরিচয় দিতে ভালোবাসে। এরা আরও একটি বহুবিচিত্র মোঙ্গল জাতি। চুটীয়াদের মতো এরাও বসবাস করে লখিমপুর, ডিব্রুগড়, শিবসাগর ও দরং জেলার নদী-তীরবর্তী এলাকায়। আদিতে এরা সম্ভবত ছিল তিব্বত-বর্মী ভাষাভাষীদের সঙ্গে। তাদেরই একটা দলের সঙ্গে এরা দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে চলে আসে ব্রহ্মপুত্রের উত্তরে উপ-হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে। সম্ভবত মিশিং-দের সঙ্গে সহযাত্রী হয়ে এসেছিল অরুণাচলের অকা, আবর বা আদি ও মিশিমি উপজাতিদের পূর্বপুরুষেরা। মিশিং লেখক তরুণচন্দ্র পামেগামের অনুমান যে আবরদের মিয়ং ও ডামরা নামে দুই গোষ্ঠী থেকে মিশিং-দের উদ্ভব। তিনি আরও বলেন আহোমদের হাতে চুটিয়াদের পরাজয়ের পর মিশিংরা পর্বত ছেড়ে সমতলে নেমে আসে। হিন্দুধর্মে ধর্মান্তরিত এই মিশিংরা তাদের চিত্তাকর্ষী লোকগীত ও আনন্দপূর্ণ নৃতের জন্য বিখ্যাত।

উত্তরবঙ্গ এবং পশ্চিম আসামে সপ্তদশ শতক পর্যন্ত রাজত্ব করেছিল কোচ-রা। চুটীয়া ও কাছাড়িদের যেমন পূর্বাঞ্চলীয় বোড়ো বলা হয়, কোচ-রা তেমনি মোঙ্গল গোষ্ঠীর পশ্চিম অঞ্চলের বোড়ো। কেউ কেউ অনুমান করেন কোচদের আদিপুরুষ ছিল দ্রবিড়, কিন্তু তাদের শারীরিক গঠন দেখলে স্পষ্টই বুঝতে পারা যায় যে তারা মোঙ্গল বংশ সম্ভূত। অবশ্য তাদের মধ্যে এই উভয় জাতির সংমিশ্রণ ঘটে থাকা বিচিত্র নয়। কোচ-রা হিন্দুধর্মাবলম্বী ও অসমীয়া ভাষা-ভাষী। তাদের বিখ্যাত রাজা নরনারায়ণ তার ভাই চিলারায়ের কাছে পরাস্ত হন। এরা দুজনেই ছিলেন প্রখ্যাত বৈষ্ণব প্রচারক শ্রী শঙ্করদেবের (1449-1569 খৃষ্টাব্দ) একান্ত উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক। কোচ-রা সমগ্র ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় ছড়িয়ে আছে। পশ্চিমে গোয়ালপাড়া জেলায় এরা নিজেদের রাজবংশী বলে পরিচয় দেয়—সম্ভবত এক কালে তারা যে শাসক-শ্রেণী ছিল, সেই কথা সগৌরবে স্মরণ করার জন্য। অধুনা পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত কোচবিহার ছিল তাদের মূল শাসনকেন্দ্র ; গোয়ালপাড়া ও কোচবিহার পরস্পরের পাশাপাশি।

আরও একটি মোঙ্গলসম্ভূত জাতি হল মোরান বা মতক-রা। সূচনায় এদের ভাষা ছিল বোড়ো গোষ্ঠীর। পরে এরা অসমীয়া ভাষা গ্রহণ করে এবং আহোমদের অভ্যুত্থানের পূর্বে আসামের পূর্ব প্রান্তে একটি রাজ্য স্থাপন করে। আহোমরা মতক-দের জয় করে তাদের রাজ্য নিজেদের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেয় এবং নানা ভাবে তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে। খৃস্টীয় অষ্টাদশ শতকে একটি বৈষ্ণব সম্প্রদায়রূপে মতক-রা আহোমদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে কিছুকালের জন্য সিংহাসনও অধিকার করেছিল। ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ-স্থিত সৈখোয়াঘাট থেকে ডিব্রুগড় পর্যন্ত, সদিয়ার নিকটবর্তী অঞ্চলে অধিকাংশ মতক-এর বসবাস। চুটীয়া ও মিশিং-দের মতো দরং ও শিবসাগর জেলাতেও কিছু কিছু মোরান বা মতক কোথাও কোথাও বসতি স্থাপন করেছে।

আহোমরা একমাত্র মোঙ্গল জাতি যাদের আসাম আগমনের কথা ইতিহাসের পাতায় লিখিত আছে। এর কারণ এই যে আহোমরা আসে বেশ দেরী করে, 1228 খৃষ্টাব্দে, এবং তারা নিজেদের কার্যকলাপ লিখে রাখত 'বুরঞ্জী' (না-জানা কথার ভাণ্ডার) নামক পুঁথিতে। এই সব পুঁথি হল ঘটনাপঞ্জী অর্থাৎ ইতিহাস। বোড়োদের পর একমাত্র আহোম-রা বহু শতাব্দী ধরে দূর দূরান্তরে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিল। অন্যান্য মোঙ্গলসম্ভূত জাতিদের ভাষা ছিল চীন-তিব্বতী, কিন্তু আহোমদের ভাষা ছিল চীন-তাই গোষ্ঠীর। অন্যান্য মোঙ্গলসম্ভূত জাতির মতো এদেরও আদি বাসস্থান ছিল পশ্চিম চীন। অন্যদের মতো এরা কিন্তু দক্ষিণ দিকে না নেমে, চলে গিয়েছিল উত্তর ব্রহ্ম ও পশ্চিম য়ুনান-এর পার্বত্য অঞ্চলে। সেইসব অঞ্চলে তারা 'শান' নামে নিজেদের পরিচয় দিত। শান-রা যেসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করেছিল তাদের মধ্যে যেটি সর্বশ্রেষ্ঠ, মণিপুরীদের কাছে সে রাজ্য খ্যাত ছিল পং নামে। আহোমরা নিজেদের তাই বলে পরিচয় দিতে পছন্দ করে। উত্তর ব্রহ্ম থেকে প্রায় ন' হাজার তাই যোদ্ধাদের একটা দল সুকাফা-র, নেতৃত্বে ত্রয়োদশ শতকের অগ্রভাগে নাগাভূমির পাতকৈ পর্বত শ্রেণী ভেদ করে নেমে আসতে শুরু করে। নামরূপ হয়ে শিবসাগরের সমতল ভূমিতে এসে পৌঁছতে তাদের সময় লেগেছিল প্রায় তেরো বছর, 1225 থেকে 1228 অব্দ পর্যন্ত। একটা উপনিবেশ স্থাপন করার মতো উপযুক্ত স্থান খুঁজে নিতে তাদের বেশ কয়েক বছর কেটে যায়। অবশেষে সুকাফা বর্তমান মহকুমা সদর শিবসাগর থেকে কিছু দূরে চরাইদেও নামে একটি শহর স্থাপন করেন 1253 অব্দে। ঘুরতে ফিরতে সুকাফা ও তার অনুচর-বৃন্দের যে দীর্ঘ সময় লেগেছিল, তারই মধ্যে আহোমরা মোরান, বরাহী প্রভৃতি

একাধিক জনজাতিকে পরাস্ত করে পদানত করে। এই ভাবে সূত্রপাত হয় একটা দীর্ঘকালস্থায়ী রাজবংশের। এই বংশের রাজারা একে একে পূর্বতন শাসক সামন্তদের পরাভূত করে, সমগ্র ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা জুড়ে এমন একটি বিরাট একচ্ছত্র সাম্রাজ্য গঠন করে যা নাকি ইতিপূর্বে স্বপ্নেরও অতীত ছিল। ব্রহ্মপুত্রের দুই পার ধরে এই সাম্রাজ্যের বিস্তার ছিল পশ্চিমে কোচবিহার ও দক্ষিণে কাছাড় পর্যন্ত। আশেপাশে পার্বত্য রাজ্যগুলির সঙ্গে আহোম রাজারা মিত্রতার সম্পর্ক রক্ষা করে চলতেন। হেম বরুয়ার মতে, 'এমনটা সম্ভবনার হয়েছিল যেহেতু তাঁরা যুদ্ধ ও শান্তি উভয়বিধ অবস্থার সঙ্গে মোকাবেলা করার মতো একটা কার্যকর শাসন-যন্ত্র গঠন করতে পেরেছিলেন।' একাদিক্রমে বহু বর্ষব্যাপী রাজ্যশাসনের পর আহোম রাজবংশ আসামের বুরঞ্জী অর্থাৎ ইতিহাসের ধারাকে আধুনিক কালের ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত করে দেন 1826 অব্দে। সেই বছর উর্যুপরি তিন তিন বার আসাম আক্রমণ ক'রে, লোকজন ধনসম্পত্তির অবর্ণণীয় ধ্বংস সাধন ক'রে, প্রজাসাধারণের মনে সন্ত্রাসের সৃষ্টি ক'রে, বর্মী বা মান-রা ইংরেজের হাতে আসামের শাসন-ভার তুলে দিতে বাধ্য হয়। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার সর্বত্র যদিও বহু সংখ্যক আহোম এখনো ছড়িয়ে আছে, তাদের অধিকাংশ বসবাস করে পূর্বতন শাসনকেন্দ্র শিবসাগর জেলায়।

আসাম রাজ্যের বর্তমান নামটা খুব সম্ভব আহোমদের অবদান। অসমীয়ারা তাদের দেশকে বলে 'অসম', দেশের ভাষা ও বাসিন্দাদের বলে 'অসমীয়া।' সংস্কৃতে 'অ-সম' কথাটার অর্থ হতে যার সমান কেউ নেই অথবা প্রতিদ্বন্দ্বীবিহীন ; সেই অর্থে আহোমদের রাজশক্তিকে অপরাজেয় বলে মনে করা হত। আবার এমনও হতে পারে যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে আসামের সমতুল্য আর কোন দেশ নেই বলে আসামের নাম 'অ-সম'। সংস্কৃতে 'অ-সম' কথাটার আবার একটি অর্থ অ-সমান অর্থাৎ পাহাড় পর্বত নদী-উপনদী বেষ্টিত একটি অসমতল দেশ। ডক্টর বাণীকান্ত কাকতি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন, পুরাতন অসমীয়া পুঁথিতে ব্যবহৃত 'আসাম' কথাটা আসলে হয়তো এসেছে একটি তাই কিংবা আহোম শব্দ থেকে। তাই এবং প্রাচীন আহোম ভাষায় 'চাম' কথাটার অর্থ হল 'পরাজিত হওয়া'। নঞর্থে তার সঙ্গে অসমীয়া 'আ' উপসর্গ যোগ করলে হয় 'আ-চাম' অর্থাৎ 'অপরাজেয়' কিংবা 'বিজয়ী'। 'চাম' বা 'সাম' কথাটার সঙ্গে আবার হয়তো তাই বা আহোমদের জাতিগত নাম 'শান্' কথাটার কিছু সম্পর্ক থাকতেও পারে। ডক্টর কাকতি লিখেছেন : "আশ্চর্যের কথা এই যে শান্ আক্রমণকারীরা তাই বলে নিজেদের

পরিচয় দিত যে সময়ে, প্রায় তখন থেকেই স্থানীয় লোকেরা তাদের বলত আসাম, আসম, অসম ও অচম। ষোড়শ শতকে দরং-এর কোচ রাজাদের বিষয়ে সূর্যখড়ি দৈবজ্ঞ 'দরং রাজবংশাবলী' নামে যে ঘটনাসূচী রচনা করেছিলেন, তাতে বিজয়ী শান্দের উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি সবসময় 'অসম' কথাটি প্রয়োগ করেছেন। 'শঙ্কর চরিত' গ্রন্থে শান্দের উল্লেখ করা হয়েছে আসাম, আসম, অসম প্রভৃতি নামে। বহু পরবর্তীকালের 'কামরূপর বুরঞ্জী' গ্রন্থেও 'অচম' কথাটা পাওয়া যায়।'' এইসব নানা কারণে অনুমান করা হয় যে আধুনিক 'আহোম' কথাটা 'আসাম' থেকে এইভাবে : আসাম—আসম—আহম—আহোম। ইংরেজরা 'অসম' অথবা 'আসাম' কথাটা ইংরেজীতে লিপ্যন্তর করল ASSAM বলে।

বোড়োদের মতো আহোমরাও আসামের বিভিন্ন ভৌগলিক নামে নিজেদের চিহ্ন রেখে গেছে। বোড়ো 'দি' উপসর্গের মতো তাই 'নাম' উপসর্গেরও অর্থ হল জল অথবা নদী—যথা নামরূপ ও নামদাং। আহোম ভাষায় ব্রহ্মপুত্রের নাম হল নাম-তি-লাও এবং নাম-দাও-ফি। এ দুটি নাম এখন অপ্রচলিত।

আহোমদের আগমনের পর শান্ গোষ্ঠীর আর আর যেসব শাখা-জাতি সেই একই পাতকৈ পাহাড় অতিক্রম করে আসামে প্রবেশ করে, তাদের নাম হল খাম্‌তি, নরা, ফাকিয়াল, আইতনিয়া, তুরুং ও খামজাং। এরা সকলেই বৌদ্ধ, কেবল আহোমরাই বৌদ্ধ ছিল না।' এ থেকে প্রমাণ হয় শান্দের অন্য সব শাখা-জাতি সিয়াম ছেড়ে চলে আসে আহোমদের অনেক পরে—বৌদ্ধ ধর্ম অবলম্বন করার পর। একসময়ে খামতিরা বসবাস করত যোরহাট মহকুমায়, নানা কারণে তাদের সরে যেতে হয় অরুণাচলের লোহিত জেলায়। খাম্‌তিরা খুবই সংস্কৃতিবান জাতি। ফাকিয়ালরাও তদ্রূপ ; এরাও সূচনায় আহোমদের সঙ্গে মিলে মিশে থাকত, পরে অরুণাচলের তিরাপ বিভাগের নিকটবর্তী নাহরকটীয়া, মারঘেরিটা ও লিডু অঞ্চলে নিজেদের বর্তমান বাসস্থানে উঠে যায়। নরা, তুরুং ও আইতনীয়ারা শিবসাগর জেলার গোলাঘাট ও যোরহাট মহকুমায় বসবাস করে। এইসব উপজাতি উনিশ শতকের অগ্রভাগে আসামে উপস্থিত হয়ে থাকবে বলে মনে হয়। বিখ্যাত আহোম ইতিহাসবিদ সর্বানন্দ রাজকুমার এইপ্রকার অনুমান করেন। তিনি আরও বলেন খাম্‌তিরা যে তুরুং ও আইতনীয়াদের নিজেদেরই দুটি গোষ্ঠী বলে দাবী করে সে দাবী হয়তো ভিত্তিহীন নয়। এরা কেবল যে বৌদ্ধ এমন নয়, এদের জামাকাপড় পরবার ধরণও একইরকম। নরা-রা আসামে আসার আগে সিয়ামের এই জ্ঞাতিকুটুম্বদের সঙ্গে আহোমরা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করে চলত। আসামে আসার পরে তাদের

কাউকে কাউকে আহোম সমাজ নিজেদের মধ্যে টেনে নেয়। অন্যেরা বৌদ্ধ ধর্মে অবিচলিত থেকে নিজেদের জীবনযাত্রা অক্ষুণ্ণ রাখল। আসামের পূর্ব অঞ্চলে এই শান্ উপজাতিরা এখনো একটি বৌদ্ধ দ্বীপরূপে বিরাজ করছে। উত্তর ব্রহ্মের ইরাবতী নদীর উৎস অঞ্চল থেকে শান্ উপজাতিদের প্রায় সমসময়ে সিংফো নামে আরো এক উপজাতি আসামে প্রবেশ করে। বৌদ্ধ খাম্‌তিদের পাশাপাশি বাস করলেও সিংফোরা সর্বপ্রাণবাদী. এদের ভাষার সঙ্গে শান্‌দের ভাষার যতটা না সাদৃশ্য তার চেয়ে অনেক বেশি সাদৃশ্য আরবদের তিব্বত-বর্মী ভাষার সঙ্গে। লোহা থেকে অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করায় সিংফোদের পটুতা ছিল সর্ববিদিত।

আসামে আর্য হিন্দুদের শাখা-প্রশাখা অনেক। ডক্টর বিরিঞ্চিকুমার বরুয়া তাঁর 'অসমর সাংস্কৃতিক ইতিহাস' গ্রন্থে উপরি লিখিত জনজাতিদের বাদ দিয়ে, আসামের বাসিন্দাদের নিম্নলিখিত জাতি বা শ্রেণীতে বিন্যাস করেছেন : ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কলিতা, কোচ, কেউট, গণক বা দৈবজ্ঞ, কৈবর্ত্ত, কুমার ও হাড়ি। এদের মধ্যে শেষ দুটি জাতি হল মাটির পাত্র প্রস্তুতকারক। এই শ্রেণী বিভাজনের ভিত্তি হল পুরাতন তথ্য ও নজীর এবং বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থা। এইসব লোকেরা সমতলের আনাচে কানাচে দেশের সর্বত্র বসবাস করে। সূচনায় এরা এসেছিল পশ্চিম দিক থেকে। উত্তর ভারতের অন্যান্য আর্যসম্ভূত জাতিদের মতো এরাও ছিল দীর্ঘদেহী ও শ্বেতবর্ণ বিশিষ্ট। কলিতা-দের জীবিকার উপায় ছিল কৃষি, কিন্তু আহোম রাজাদের কালে যোদ্ধারূপেও এরা তাদের বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিল। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থেরা সচরাচর শিক্ষা-দীক্ষা, কূটনীতি, রাষ্ট্রব্যবস্থা ও ধর্মীয় শিক্ষার মতো বুদ্ধিগত বৃত্তিতে ব্যাপৃত থাকত। মূলত তাদেরই প্রচেষ্টায় শাস্ত্রসমূহের প্রচার, সাহিত্যের সৃষ্টি ও অসমীয়া ভাষার বিকাশ সাধন সম্ভবপর হয়েছিল।

সর্বপ্রথম আর্যেরা ঠিক কোন সময়ে আসামের সমতলে এসে উপস্থিত হয়েছিল, সে কথা নিশ্চয় করে বলা শক্ত। আর্য, দ্রবিড় ও অস্ট্রিক জাতির সংমিশ্রণের ফলে যে হিন্দু সভ্যতার উদ্ভব তার ঢেউ এসে উত্তর বিহারে পৌঁছেছিল খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতকে। সেই সূত্রে বলা যায় তখন থেকেই আর্যেরা আসামের সংস্পর্শে এসে থাকবে। তার বহু আগে, বেদসমূহ সংকলনের সময়, অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব দশম শতকেই, মোঙ্গল জাতির অস্তিত্ব লক্ষ্যগোচর হয়ে থাকবে। বোধ হয় এটা সম্ভবপর হয়েছিল ইতিপূর্বে আসামে দ্রবিড় ও অস্ট্রিক জাতির লোকেদের বসতি স্থাপন করার ফলে। এদেশ থেকে তারা হয়তো পশ্চিম খণ্ডের জ্ঞাতিকুটুম্বদের সঙ্গে কোন প্রকার সংযোগ রক্ষা করছিল। সেখানে তাদের এইসব সগোত্রেরাই তখন হিন্দু সভ্যতার বুনিয়াদ গড়ে

তুলছিল। এই সংযোগ-রক্ষা-সম্পর্কিত অনুমানের সপক্ষে তথ্য নজিরের জন্য আমাদের নির্ভর করতে হয় মূলত দুটি মহাকাব্য এবং বিভিন্ন পুরানের উপর। খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতক থেকে চতুর্থ শতকের মধ্যে রামায়ণ ও মহাভারত একটি নির্দিষ্ট আকার ধারণ করে। সে যুগের প্রাগ্‌জ্যোতিষ ও কামরূপ নামে খ্যাত আসামের পশ্চিম সীমা লঙ্ঘন করে আর্যদের এ দেশে আগমনের সেইটাই একমাত্র সম্ভাব্য ঐতিহাসিক কাল। বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হুয়ান চোয়াং 643 খৃষ্টাব্দে যখন আসামে আসেন তার আগেই এ দেশ ছিল কামরূপ নামে পরিচিত। তিনি স্বয়ং লিখে গেছেন যে তিনি পূর্বদেশে এসেছিলেন পুর-ন-ক-টন্‌-ন (পৌণ্ড্রবর্ধন) থেকে, ক-লো-তু (করতোয়া) নামে একটি বড় নদী পার হয়ে তিনি পোঁছেছিলেন কা-মো-লু-কো অর্থাৎ কামরূপে। রামায়ণে বলা হয়েছে যে প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন অমূর্তরাজস্ নামে একজন আর্য নৃপতি যাঁর আদি নিবাস ছিল কোশী নদীর তীরে। মহাভারতে আসামের উল্লেখ আছে প্রাগ্‌জ্যোতিষ ও কামরূপ উভয় নামেই। এমনও হতে পারে যে বহু প্রচলিত প্রাগ্‌জ্যোতিষ নামের স্থানে নূতন কামরূপ নামটা মহাভারতের যুগেই প্রচলিত হতে শুরু করেছিল। সেই জন্যই কনকলাল বরুয়া তাঁর Early History of Kamrupa গ্রন্থে এই মত প্রকাশ করেছেন যে প্রাগ্‌জ্যোতিষ ছিল আসামের অতি প্রাচীন নাম, কিন্তু মধ্যযুগ থেকে পুরাণে তন্ত্রে কামরূপ নামটাই প্রচলিত ছিল। বিদেহ বা উত্তর বিহারের প্রখ্যাত পৌরাণিক রাজা নরকাসুর এদেশে এসে একটি নূতন রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। বিষ্ণুর ঔরসে তাঁর জন্ম কিন্তু তাকে লালন পালন করেছিলেন। বিদেহ রাজ জনক। মহাভারতে বলে যে নরকাসুর ও তাঁর বংশের অন্যান্য রাজাদের রাজধানী ছিল প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর অর্থাৎ বর্তমান গৌহাটি শহরে। শক্তিশালী কিরাত রাজা ঘটকাসুরকে বধ করে নরকাসুর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ঘটকাসুরের পূর্বে এ দেশে রাজত্ব করত মহীরঙ্গ দানবের বংশাবলী। নরকের পুত্র ভগদত্ত ছিলেন একজন মহাবীর। কিরাত, চিন ও সাগরতীর-বাসী অন্যান্য নানা জাতির সৈনিক দ্বারা পরিবৃত হয়ে কুরুক্ষেত্র মহারণে তিনি দুর্যোধনের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করেছিলেন। এই সৈনিকেরা যে মোঙ্গলসম্ভূত, মহাভারত পড়ে তা স্পষ্ট বুঝা যায়। উভয় মহাকাব্যেই এদের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে—প্রিয়দর্শন, হেমাভ, চর্ম-পরিহিত, ভয়ংকর ইত্যাদি বলে। রাজাদের নামের সঙ্গে দানব, অসুর আদি উপাধি সূচিত করে যে এরা ছিল অনার্য বংশোদ্ভব। অপর পক্ষে নরকাসুর যে উত্তর বিহার থেকে এসেছিল এবং তার পুত্র ভগদত্ত যে দুর্যোধনের হয়ে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করেছিল—তা থেকে

অনুমান করা যায় যে আর্য ও মোঙ্গলদের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নিশ্চয় গড়ে উঠেছিল ইতিমধ্যে। এই সূত্রে স্মরণ রাখা দরকার যে আর্যদের রচিত যজুর্বেদ গ্রন্থে কিরাতদের উল্লেখ আছে। এটা সম্ভবত হিন্দু সভ্যতার বিবর্তনে জাতিগত সংমিশ্রনের ইঙ্গিত বিশেষ। মহাভারত ও অষ্টাদশ পুরাণের রচয়িতা, আর্য সাহিত্যের জনক, চতুর্বেদের সংকলন ও সম্পাদনা করেছিলেন যে ব্যাসদেব তিনি নিজে নিশ্চয় ছিলেন একজন বর্ণসঙ্কর ব্যক্তি। তাঁর পিতা পরাশর ছিলেন ব্রাহ্মণ (আর্য) ও মাতা সত্যবতী ছিলেন দাসের—সম্ভবত দ্রবিড় বংশীয় কোনো ধীবরের কন্যা। পুরাণে ও তন্ত্রে নরকাসুরের কাহিনী পড়তে গেলেও আর্য ও আর্যেতর জাতির সংমিশ্রনের অনেক উদাহরণ দেখা যায়। এইসব কাহিনীতে বলা হয়েছে যে নরকাসুর প্রাগ্জ্যোতিষে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার পর বহু ব্রাহ্মকে এনে কামাখ্যায় বসিয়েছিলেন। বিষ্ণু নাকি নরকাসুরকে বিশেষ সমাদর করতেন ও কামাখ্যা দেবীকে পূজা করার জন্য তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। এইসব কাহিনী আসামে আর্য উপনিবেশ পত্তনের ঘটনা সূচিত করে। অতঃপর ধর্মভ্রষ্ট হয়ে স্বয়ং দেবীকে নরকাসুর যখন পত্নীরূপে গ্রহণ করতে চায়, বিষ্ণু তার প্রতি বিরূপ হন। বশিষ্ট মুণির মতো রাজা ব্রাহ্মণদের উৎপীড়ন করতে আরম্ভ করে, ষোলো হাজার রমনীকে নিজ অন্তঃপুরে বন্দিনী করে রাখে। বিষ্ণু তখন কৃষ্ণ অবতারের রূপ ধরে নরকাসুরের শাস্তি বিধান করতে আসেন এবং ভয়ংকর একটা যুদ্ধে তাকে নিধন করেন। এই অনার্য দেশে কৃষ্ণ নিশ্চয় সসৈন্য এসেছিলেন কোন আর্য আক্রমণকারী রূপে। ইতিহাসে এইরকম একাধিক অভিযানের উল্লেখ পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় 105 অব্দে ব্রহ্মদেশের উত্তরাঞ্চলে রাজত্ব করতেন সমুদ্র নামে একজন ভারতীয় রাজা। ভারতের উত্তর পশ্চিম অঞ্চল থেকে অপর একজন রাজা সিয়াম দেশে রাজ্যপাট বসিয়েছিলেন। এইসব বিজয় অভিযান নিশ্চয় ঘটেছিল আসামের মধ্য দিয়ে .

আরো যে দুজন পৌরাণিক রাজার সঙ্গে কৃষ্ণের সম্পর্ক ঘটেছিল তাদের একজন ছিলেন শোণিতপুরের (বর্তমান তেজপুরের) বাণ রাজা এবং সদিয়ার নিকটবর্তী কুণ্ডিনের ভীষ্মক। এদের দুজনাই ছিলেন অনার্য রাজা এবং সম্ভবত মোঙ্গল বংশীয়। সুদূর গুজরাটের দ্বারকা থেকে এসে কৃষ্ণ স্বয়ম্বর সভা থেকে ভীষ্মকের কন্যা রুক্মিণীকে হরণ করে নিয়ে যান। রুক্মিণী হরণের কাহিনী পাওয়া যায় দুখানি পুরাণে—'হরিবংশ' ও 'ভাগবত'-এ। বাণ রাজার কাহিনী আছে 'হরিবংশ' ও 'বিষ্ণুপুরাণ'-এ। বাণ ছিল নরকাসুরের সমসাময়িক, নরকের উপর প্রভাব বিস্তার করে বাণ তাকে ধর্মের পথ থেকে বিচ্যুত করে। ফলে কৃষ্ণের হাতে নরক নিহত হয়। কৃষ্ণের পৌত্র

অনিরুদ্ধ পিতামহের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আসামে আসে ও বাণ রাজার কন্যা উষার পাণি প্রার্থনা করে। উষার নির্জন প্রাসাদে অনিরুদ্ধ হাতে নাতে ধরা পড়ে এবং ক্রোধান্ধ হয়ে বাণ তাকে বন্দী করে রাখে। পৌত্রকে উদ্ধার করা কর্তব্য মনে করে কৃষ্ণ উপস্থিত হলেন এবং বাণের সঙ্গে এমন এক ভয়ংকর ও সুদীর্ঘ রণে প্রবৃত্ত হলেন যে রক্তের নদী বয়ে গেল (শোণিতপুর নাম হল তার থেকে)। বাণ অবশ্য পরাজিত হল, প্রেমিক-প্রেমিকার মিলন হল। এইসব কাহিনীকে অনার্য জাতির দেশে আর্যদের অনুপ্রবেশের আখ্যান বলা যেতে পারে। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন যে ব্যাসদেবের মতো কৃষ্ণ স্বয়ং আর্য রাজকুমার বসুদেব ও মথুরার অনার্য রাজা কংসের ভগ্নী দেবকীর সন্তান ছিলেন। কৃষ্ণের শিক্ষার মধ্যে প্রধান কথাটা হল বিভিন্ন মতের ও পথের মধ্যে সমন্বয় সাধন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় দ্রবিড়দের উদ্ভাবিত অ-বৈদিক পূজা অনুষ্ঠানের কোন কোন অঙ্গ কৃষ্ণ গ্রহণ করেছিলেন। তেজপুরের উত্তরে অকা নামে যে গিরিজন বাস করে তারা আজও বলে যে তারা বাণ রাজার বংশধর।

এই পৌরাণিক যুগ থেকে শুরু করে বিশ্বাসযোগ্য ঐতিহাসিক তথ্যাদি না পাওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ খৃস্টীয় চতুর্থ শতাব্দী অবধি, একাধিক রাজার কথা শোনা যায় যাদের নামের সঙ্গে কোন-না-কোন ঐতিহ্য বিজড়িত। তাদের সম্বন্ধে লোকপ্রিয় কাহিনীগুলি আর্য অনুপ্রবেশের ইঙ্গিতবাহী। পশ্চিম অঞ্চল থেকে ধর্মপাল নামে একজন ক্ষত্রিয় গৌহাটির কাছাকাছি কোন একটা স্থানে একটি রাজ্য স্থাপন করেন। তিনি নাকি উত্তর ভারত থেকে ব্রাহ্মণের মতো কয়েক ঘর উচ্চ বর্ণের হিন্দু এনে তাঁর রাজ্যে বসিয়েছিলেন। তাঁর বংশের শেষ রাজা রামচন্দ্র উত্তর পূর্ব আসামে পৃথিবীর বৃহত্তম নদীবেষ্টিত দ্বীপ মাজুলীতে তাঁর রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। আজো দাঁড়িয়ে আছে এমন তিনটি সু-উচ্চ দুর্গপ্রাকারের ভগ্নশেষের সঙ্গে তিনজন রাজার চিত্তাকর্ষী কাহিনী বিজড়িত আছে বলে শোনা যায়। একদা যজ্ঞ করতে গিয়ে রামচন্দ্র তাঁর সুন্দরী মহিষীকে ব্রহ্মপুত্রের নিকট উৎসর্গ করেন। অন্তঃসত্ত্বা রানী নদীর জলে ভাসমান অবস্থায় একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দেন। অরিমত্ত নামে সেই পুত্র কালে বৈদ্যগড়ে একটি রাজ্য স্থাপন করে। উত্তর কামরূপে এখনো সেই সু-উচ্চ দুর্গপ্রাকারের অবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। নিজের পিতাকে চিনতে না পেরে অরিমত্ত যুদ্ধক্ষেত্রে রামচন্দ্রকে হত্যা করে। অরিমত্তকে আবার হত্যা করে ফেঙ্গুয়া। বৈদ্যগড়ের 16 কিলোমিটার পশ্চিমে ফেঙ্গুয়া যে উচ্চ দুর্গপ্রাচীর নির্মাণ করেছিল সেই ফেঙ্গুয়াগড় আজো দেখা যায়। ফেঙ্গুয়াকে শেষ পর্যন্ত পরাস্ত করে অরিমত্তের পুত্র

রত্নসিং, কিন্তু একজন ব্রাহ্মণের অভিশাপে রত্নসিং তার রাজ্য হারায়। অরিমত্তের অপর একজন পুত্র জোঙাল বলহু খুব উঁচু করে দুর্গপ্রাকার রচনা করে নিজের রাজধানী সুরক্ষিত করতে চেয়েছিল। নওগাঁ জেলায় জোঙাল বলহু গড় নামে সেই দুর্গ এখনো দেখা যায়। স্থানীয় এক মোঙ্গল জনজাতি-বোড়ো কাছাড়িরা জোঙালকে রাজ্যচ্যুত করে। এইসব লোক-কাহিনীর যদিচ কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই, এগুলি থেকে অন্তত এইটুকু প্রমাণ হয় যে বহিরাগত আর্যেরা যতটা পারে পূর্ব আসামের দিকে অগ্রসর হবার চেষ্টা করেছিল—প্রয়োজনমতে অস্ত্র প্রয়োগ করেও, কারণ স্থানীয় লোকেরা তাদের বাধা দিতে কসুর করেনি। ফিরিস্তা-র ইতিহাস থেকে জানা যায় যে কামরূপের শক্তিশালী কোচ রাজা শঙ্কলাদিব বঙ্গ ও বিহার জয় করে গৌড় বা লখৌতি-তে রাজধানী স্থাপন করেছিল। অতঃপর উত্তর ভারতের অন্য একজন সমান শক্তিশালী রাজা কেদার ব্রাহ্মণকেও সম্পূর্ণ পরাস্ত করেছিল। অবশেষে ইরানের রাজা আফ্রাসিয়াব-এর হাতে শঙ্কল পরাভূত হয়—অবশ্য 10,000 মোঙ্গল সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী নিয়ে প্রচণ্ড যুদ্ধের পর। কেদারের সঙ্গে শঙ্কলের সংঘর্ষ আর্য অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে স্থানীয়-প্রতিরোধের অন্যতম দৃষ্টান্ত।

খৃস্টীয় চতুর্থ শতক থেকে আসামের ইতিহাসের একটি স্পষ্টতর ছবি আমরা পাই। হুয়ান চোয়াঙ-এর ভ্রমণ বৃত্তান্ত, বাণের হর্ষচরিত এবং সর্বোপরি তাম্রফলক ও তাম্রশাসনগুলি মূল্যবান ঐতিহাসিক তথ্যের যোগান দেয়। এই সব তথ্যের সূত্রে আমরা জানতে পেরেছি যে বর্মণ বংশের পুষ্যবর্মণ খৃস্টীয় চতুর্থ শতকে কামরূপে রাজত্ব করতেন। সেই বংশের অন্যান্য রাজারা সপ্তম শতক অবধি নিরবচ্ছিন্ন রাজত্ব করেছিলেন। ভাস্করবর্মণ ছিলেন এই বংশের শেষ রাজা। বর্মণ বংশ নরকাসুরের বংশোদ্ভব বলে মনে করা হয়। কামরূপ ও ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মধ্যে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংযোগ যে ঘটেছিল তার সমর্থিত বিবরণ এই তিনশো বছরের ইতিহাসে পাওয়া যায়। বর্মণ রাজাদের অনেকেই অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিল—এটা ক্রমবর্ধমান আর্য প্রভাবের অন্যতম প্রমাণ। পুষ্যবর্মণ ছিলেন প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক ও ব্যক্তিগত মিত্র। সেই যুগের কোন কোন বর্মণ রাজা মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। এই সব বর্মণ রাজাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রাজা ছিলেন ভাস্করবর্মণ। এর বিষয়ে এড্‌ওআর্ড গেইট বলেছেন, 'বর্মণ বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা এবং মধ্যযুগীয় ভারতের অন্যতম উল্লেখযোগ্য শাসক ভাস্করবর্মণ নিঃসন্দেহে অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করার মতো একটি ঐতিহাসিক চরিত্র।' ভারত ইতিহাসের অপর একটি মহৎ নাম থানেশ্বরের রাজা হর্ষের সঙ্গে

তিনি বন্ধুত্ব স্থাপন করেছিলেন। তাঁরা পরস্পরের মধ্যে কেবল রাজদূত বিনিময় করেছিলেন এমন নয়, মূল্যবান উপঢৌকনও বিনিময় করেছিলেন। ভাস্করবর্মণ শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন ও নিজের জ্ঞানের ভাণ্ডার বর্ধন করার জন্য নিয়ত যত্নবান ছিলেন। হুয়ান্ চোয়াঙ আসামে যাতে আসেন সেই উদ্দেশ্যে তিনি নালন্দার আচার্য শীলভদ্রের কাছে পত্র প্রেরণ করেছিলেন। চীনদেশের এই পরিব্রাজক আসামে এসে কামরূপের রাজার জ্ঞানপিপাসা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। হর্ষবর্ধন কনৌজে যে বিরাট ধর্মসভার অধিবেশন করেছিলেন রাজা ও পরিব্রাজক একসঙ্গে তাতে যোগদান করতে গিয়েছিলেন। পাঁচশোটি হাতির পিঠে অনুচর পরিচর পরিবৃত হয়ে ভাস্করবর্মণ গিয়েছিলেন সেই ধর্মসভার মুখ্য অতিথি রূপে। অধিবেশন শেষ হবার পর হুয়ান চোয়াঙ ভাস্করবর্মনের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় প্রতিশ্রুতি দেন রাজার জন্য তিনি লাও-ৎস রচনাবলী সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করাবেন। রাজার কাছ থেকে একমাত্র পার্থিব উপহার যা তিনি সানন্দে গ্রহণ করে চীন দেশে প্রত্যাবর্তন করেন, সে হল ভিতরে লোমের আস্তর দেওয়া একটি পশমের টুপি। ভাস্করবর্মণ ছিলেন অকৃতদার, তাঁর সঙ্গে সঙ্গে বর্মণ রাজবংশও লুপ্ত হয়ে যায়।

বর্মণদের পর কামরূপে রাজত্ব করেছে এমন তিনটি রাজবংশের উল্লেখ আমরা দেখতে পাই। তাদের প্রথমটির সূচনা করেছিল শালস্তম্ভ, দ্বিতীয়টি ছিল পাল বংশ এবং তৃতীয়টি খেন বংশ। খেন রাজাদের সময়ে মুসলমানেরা সর্বপ্রথম আসাম আক্রমণ করে। খৃস্টীয় 1204 অব্দে সম্রাট মহম্মদ ঘোরীর বঙ্গস্থ সুবেদার বক্তিয়ার খিলজী প্রথম খেন রাজা নীলধ্বজকে আক্রমণ করে এবং তার হাতে পরাস্ত হয়ে পালিয়ে যায়। বঙ্গের পরবর্তী সুবেদার গিয়াসুদ্দীনও নীলধ্বজকে আক্রমণ করেছিল 1228 অব্দে, এবং তার রাজ্যের একটা অংশ কেড়ে নিয়ে সুবে-বাংলার অন্তর্ভুক্ত করেছিল। অতঃপর উপর্যুপরি দু-দু'বার আক্রমণ করে পাঠানেরা খেন শাসন ও খেনদের রাজধানী কামতাপুর ধ্বংস করে ফেলে। মুসলমানদের এই অধিকার কিন্তু বহুকাল স্থায়ী হয়নি। আক্রমণকারীদের অনেকেই কিন্তু রয়ে গিয়েছিল এদেশে—তারাই আসামের প্রথম মুসলমান অধিবাসী।

খেন বংশের পতনের পর 1515 খৃস্টাব্দের কাছাকাছি একটা সময়ে কোচরা শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকে। কিন্তু ইতিমধ্যে আহোমরাও পূর্বদিক থেকে তাদের রাজ্য বিস্তার করে আসতে শুরু করল। একেবারে উত্তর-পূর্ব প্রান্তে চুটীয়ারা রাজত্ব করছিল, কাছাড়িরা রাজত্ব করছিল মধ্য আসামে। চুটীয়া ও কাছাড়িদের মাঝখানে ভূঞা নামে কয়েকজন ছোট ছোট রাজা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় প্রাধান্য বিস্তার

করেছিল। আহোমরা এদের প্রায় সকলকে অধীনস্থ করে এবং সমগ্র উপত্যকাখণ্ডকে একত্র মিলিত করে একটি সাম্রাজ্যে পরিণত করে। দীর্ঘ সাত শতাব্দী ধরে আহোমরা এই সাম্রাজ্য সুদক্ষ ভাবে শাসন করে—যদিচ পশ্চিম অঞ্চলের কোচরা এবং একেবারে দক্ষিণ প্রান্তের কাছাড়িরা আহোমদের হাতে সম্পূর্ণ পরাভূত হয়নি।

পর্বতে হোক সমতলে হোক, যেখানেই ক্ষুদ্র কিন্তু বিশিষ্ট কোন জাতি বা গোষ্ঠি নিজেদের বসবাসের একটা ব্যবস্থা করে নিয়েছিল, নিজেদের ঐতিহ্য অনুসারে তারা তাদের উপযোগী বিশেষ ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থাও সেখানে করে নিয়েছিল। সেইসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের হয় কোন অধিপতি বা গোষ্ঠীপতি থাকতেন ছোট ছোট যোধ্দলের দলপতি রূপে। পাহাড়ে পর্বতে এখনও এই ধরনের রাজা দেখা যায়। এইসব গোষ্ঠিপ্রধানদের বেশির ভাগের সঙ্গে আহোমরা সর্বদা সদ্ভাব রেখে চলত—এমন কি বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন করেও। কিন্তু এইসব ছোট ছোট রাজা বিষয়ে ঐতিহাসিক তথ্যাদি বিশেষ কিছু পাওয়া যায়না কারণ এইসব গিরিজনেরা লিখন-বিদ্যা জানত না।

অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে কুশাসন জনিত আভ্যন্তরীন কলহ-কোন্দলের ফলে আহোমদের মধ্যে ভাঙন ধরে। 1818 খৃস্টাব্দে হাজারে হাজারে ব্রহ্মদেশীয় সৈন্যসামন্ত আসামের উপর আক্রমণ চালায়। তাদের ডেকে এনেছিল গৌহাটির আহোম রাজ্যপাল, বদন বরফুকন। আহোম রাজের মন্ত্রী ছিল বদনের বৈবাহিক, উভয়ের মধ্যে বনিবনা ছিল না। স্বয়ং রাজার আচরণও ছিল অশোভন ও অসঙ্গত। কিন্তু বদনের আমন্ত্রণে বর্মীরা যে আসে তা অন্যায় দূরীকরণের জন্য ততটা নয় যতটা লুঠতরাজের জন্য। অবাধ লুঠনের লালসায় তারা দ্বিতীয়বার, 1819 অব্দে, এবং তৃতীয় বার, 1821 অব্দে, সমগ্র আসাম অধ্যুষিত করে। 1819 থেকে 1824 পর্যন্ত, নৃশংসভাবে নরহত্যা করে, বিষয় সম্পত্তি লুণ্ঠন করে, গ্রামের পর গ্রাম অগ্নিসাৎ করে, অবলীলায় স্ত্রীজাতির সম্মান হানি করে, এই বর্মী লুটেরার দল কার্যত পাঁচ বছর ধরে আসামের উপর তাদের দুঃশাসন চালিয়েছিল। এর ফলে সারা দেশ ধ্বংস হয়ে যায়, সমগ্র সমাজ-ব্যবস্থা ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। প্রায় 30,000 মানুষকে বর্মীরা বন্দী করে নিয়ে যায় নিজেদের দেশে দাস করে রাখবে বলে। আসামের প্রায় অর্ধেক মানুষের শিরশ্ছেদ করে। বহু শতাব্দী ধরে যে রাষ্ট্রিক ও সামাজিক ব্যবস্থা অল্পে অল্পে গড়ে উঠছিল, তার ভিত্তিমূল এরা ভেঙে দেয়। সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর ব্যক্তিরা সীমান্ত অতিক্রম করে পালিয়ে যায়। অনেকে আশ্রয় নেয় পাহাড়ে পর্বতে। চাষবাসের উপায় ছিল না বলে গরিব মানুষেরা বনজঙ্গল থেকে কচুকন্দ জোগাড় করে

কোনপ্রকারে প্রাণধারণ করত। কিন্তু শেষপর্যন্ত যখন বর্মী মানদের সঙ্গে ব্রিটিশের সংঘর্ষ বাঁধল গোয়ালপাড়ায় তখন ব্রিটিশরা তাদের উন্নততর অস্ত্রশস্ত্র ও রণকৌশলের সাহায্যে ওদের হটিয়ে দিয়ে সম্পূর্ণ পরাস্ত করল। এর ফলে 1826 অব্দে যান্দাবু-র সন্ধি স্বাক্ষরিত হয় এবং তারই শর্ত অনুসারে ব্রহ্মদেশের রাজা আসামকে ব্রিটিশের হাতে সমর্পণ করে। যেসব দেশ নিয়ে তথাকথিত ব্রিটিশ ভারত গঠিত তাদের মধ্যে সর্বশেষ দেশ হল আসাম। তাই একজন অসমীয়া কবি বলেছেন আসাম হল ভারতের সর্বকনিষ্ঠ কন্যা 'ভারতর নুমলী জী'।

স্বাধীনতা লাভের পর ভারতের তাবৎ জনজাতি ও গিরিজনেরা চাইল নূতন ভারতে তাদের ন্যায্য স্থানটুকু অধিকার করে নিতে। জহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে ভারতের জাতীয় সরকার এমন সব পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে লাগলেন যাতে গিরিজন, হরিজন ও জনজাতিদের বিকাশের পথ খুলে যায় এবং তারা ভারতের অন্যান্য ভ্রাতৃবৃন্দের সমকক্ষ হয়ে উঠতে পারে। স্বাধীনতা উচ্চ আশা ও নূতন আকাঙ্ক্ষার পথ খুলে দিয়েছে। কিন্তু ভারত সংবিধানের ষষ্ঠ অনুসূচির তালিকাভুক্ত বিভিন্ন মোঙ্গলসম্ভূত জনজাতিরা নানা দিক থেকে অন্যান্যদের তুলনায় পিছিয়ে পড়ে আছে। সেই কারণে তারা যাতে আধুনিক কালের অগ্রগতির সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারে তার জন্য বিশেষ সুযোগ সুবিধা দেবার ব্যবস্থাদি নেওয়া হয়েছে। এইসব হরিজন, গিরিজন ও অন্যান্য অনুন্নত জাতিদের শিক্ষাদীক্ষার জন্য বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে, জীবিকার জন্য সরকারী চাকুরীতে নিয়োগের সুবিধা দেওয়া হয়েছে এবং বিধানমণ্ডলীতে তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের জন্য আসন সংরক্ষণ করা হয়েছে। গারোদের জন্য, খাসিয়া ও জয়ন্তীয়াদের জন্য, মিকির ও কাছাড়িদের জন্য, নাগা ও মিজোদের জন্য, ছয়টি স্বায়ত্ত-শাসিত জেলা-পরিষদ গঠন করা হয়েছিল। সংবিধান-অনুসারে নেফাকে আসামের অংশ বলে ধরা হলেও, কেন্দ্রীয় সরকার নেফাকে নিজেদের শাসনে রেখেছিলেন যাতে এ অঞ্চলের জনজাতি নিজেদের প্রতিভা ও প্রবণতা অনুসারে বিকশিত হয়ে উঠতে পারে। সেই নেফা এখন অরুণাচল নামে একটি কেন্দ্রশাসিত রাজ্যক্ষেত্র। অরুণাচলের দূর দূরান্তে গ্রামে গ্রামে স্কুল স্থাপন করা হয়েছে, সমতল থেকে বহু শিক্ষক গিয়ে সেইসব স্কুলে শিক্ষাদান করেন। নাগাদের নিজস্ব গ্রাম-শাসন-পদ্ধতির সঙ্গে সংগতি রেখে অরুণাচলে পঞ্চায়েত প্রথা প্রবর্তন করা হচ্ছে। তিরূপ, লোহিত, চিয়াং, সুবনশিরি ও কামেং বিভাগ নিয়ে অরুণাচল প্রায় 35,000 বর্গমাইল জায়গা জুড়ে বিস্তৃত। এর উত্তরেই তিব্বতের সীমান্ত। এখানকার জনজাতিরা অল্পে অল্পে অখিল ভারতের বহু প্রশস্ত

জীবনধারার সঙ্গে যুক্ত হবার আকর্ষণ অনুভব করতে লেগেছে। সেদিন পর্যন্ত একজন মনোনীত সদস্য কেন্দ্রীয় রাজ্যসভায় অরুণাচল জনজাতির প্রতিনিধিত্ব করতেন। ভারতের খাদ্য ও কৃষি-মন্ত্রকের ভূতপূর্ব উপমন্ত্রী দাইং ইরিং বহুকাল ধরে এইভাবে নেফা উপজাতিদের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। সম্প্রতি তিনি পরলোকগমন করেছেন। কিছুকাল আগে লুম্বের দাই নামে একজন নাগা তরুণ জনজাতির জীবনের একটি বাস্তবসম্মত ছবি রচনা করেছিলেন, অসমীয়া ভাষায় লেখা তার একটি উপন্যাসে। ভারত সরকার সাহিত্য পুরস্কার দিয়ে লুম্বের দাইকে সম্মানিত করেছিলেন। দাইং ইরিং ও লুম্বের দাই উভয়েই সিয়াং অঞ্চলের আদি বা আবর গোষ্ঠির মানুষ।

পর্বতে প্রান্তরে গ্রামে শহরে স্বাধীনতা নানাবিধ পরিবর্তন ঘটিয়েছে। নূতন নূতন নগর পত্তন হয়েছে। বহু কারখানা খোলা হয়েছে, স্কুল কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে প্রচুর। 1951-অব্দে আসাম প্রদেশের জনসংখ্যা ছিল 90 লক্ষ 1968-অব্দে দাঁড়িয়েছিল 144 লক্ষতে। 1966-67-অব্দে সেই সংখ্যা 20 লক্ষ অতিক্রম করে যায়। পূর্বের তুলনায় জীবনযাত্রা কঠিন ও জটিল হওয়া সত্বেও নূতন পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিপূরণ হয়েছে কিছু কম নয়। জনজাতীয় তাঁতে বোনা বিচিত্র নকশার বস্ত্রাদি নগরবাসীদের মন মুগ্ধ করছে আজকাল। ইতিপূর্বে যেসব পূর্বাপর ঐতিহ্য-বাহী লোকসংগীত ও লোকনৃত্য গ্রামের চতুঃসীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং গ্রামের বাইরে যা ছিল অনাদৃত ও অবহেলিত আজ সে-সব শিক্ষিত ও উচ্চপদস্থ লোকেদের মনোরঞ্জন করছে। লোকসংগীতের সুর ও লোকনৃত্যের ছন্দোভঙ্গ আধুনিক রুচির সঙ্গে খাপ খাইয়ে আজকাল প্রখ্যাত সব রঙ্গমঞ্চে পরিবেশিত হচ্ছে। ভারতের রাজধানীতে প্রজাতন্ত্র দিবসের সাম্বাৎসরিক উৎসবে যোগদানের আমন্ত্রণ লাভের জন্য, লোকশিল্পীদের বিভিন্ন দল পরস্পরের প্রতিযোগিতায় কোমর বেঁধে লাগতে শুরু করেছে। যে-সব গ্রামীণ সংগীত শিল্পীর খ্যাতি ইতিপূর্বে গ্রামের চতুঃসীমার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল, আজ তাঁরা বিরাট বিরাট সমাবেশে তাঁদের সংগীত পরিবেশন করছেন, রেডিয়ো-যোগে তাঁদের কণ্ঠস্বর গিয়ে পৌঁছচ্ছে হাজার হাজার শ্রোতার কানে। বহু বহু লোকের কাছ থেকে তারা প্রশংসা অর্জন করছেন। শহরে নগরে দূরদূরান্তরের জনজাতিদের গ্রাম থেকে আগত শিল্পীরা তাদের চিরাতীত কালের বাদ্যযন্ত্রাদি নিয়ে নৃত্যগীত পরিবেশন করছে। এই সরল জনগণ সর্ব-ভারতীয় বিরাট রাষ্ট্রচেতনা নিজেদের মধ্যে অনুভব করছে এবং এই নূতন জাতীয় সংহতির বেদীতে নিজেদের অর্ঘ দান করছে। গৌহাটি তথা রাজধানী দিল্লীতেও আবরদের জামা-পরিহিত তরুণ ভারতীয়দের দেখতে পাওয়া এখন আর বিচিত্র নয়। বোড়োদের

নিজস্ব ফালি বা গলবন্ধ এখন বোড়ো-নয়-এমন লোকদের গলায় শোভা পায়; মহিলারা নাগাদের শাল ব্যবহার করতে লেগেছেন। নাগা বর্শার রূপকল্প বা ডিজাইন এখন নেকটাই-এ শোভা পায়। নিত্য ব্যবহার্য গৃহস্থালীর সামগ্রীতে উত্তরোত্তর বেশি করে লোককলা সম্মত ডিজাইন দেখা যাচ্ছে।

কিন্তু জাতীয় জীবনে এই বিরাট পরিরবর্তনের একটা অন্ধকার দিকও আছে। স্বাধীনতা এমন সব অজ্ঞাতপূর্ব সুখসুবিধা হাতের নাগালে এনে দিয়েছে যে এর ফলে একটা উগ্র আত্মসম্মান বোধ কিছু কিছু মানুষকে মানুষের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিচ্ছে। অগ্রণী ভায়েরা এইসব অনগ্রসর মানুষকে অবহেলা ভরে পিছু ঠেলে যে রেখেছিল এক কালে—সেকথা অস্বীকার করার জো নেই। এদের অনেকে অবশ্য সুদূর অতীত কাল থেকেই নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে রেখে এসেছে, বৃহত্তর জগতে বেরিয়ে আসার কোনো প্রচেষ্টাই তারা করেনি। এরা যে-সব অঞ্চলে বসবাস করত, সেগুলি জেলা বা মহকুমা-কেন্দ্র থেকে বহুদূরে ও দুর্গম অঞ্চলে অবস্থিত ছিল বলেও বৃহত্তর জনসমাজ এদের বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। আধুনিক জীবনের সর্বস্তরে এদের পক্ষে যোগ দেওয়া কঠিন। দেশের সরকার ও সংবিধানের রচয়িতারা কোন কালেই এদের প্রতি সহানুভূতি শূন্য হন নি। কিন্তু অগ্রণী ও অনগ্রসর ব্যক্তিদের মধ্যে ব্যবধান এতই বিস্তীর্ণ যে উভয়ের মধ্যে সেতু রচনা খুবই সময়সাপেক্ষ। তথাকথিত অগ্রণী ব্যক্তিরা অনেক ক্ষেত্রে এমনই সংস্কারচ্ছন্ন যে তাদের কাছ থেকে যে-প্রকার সহায়ক ও সহানুভূতিশীল মনোভাব আশা করা হয়েছিল, সে-আশা সকল সময় পূর্ণ হয়নি। এর ফলে স্বভাবতই এই সব দুর্ভাগা লোক নিরাশ হয়ে পড়েছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অস্থির হয়েও পড়েছে। বিদ্রোহী নাগা ও মিজোরা যে অনেক সময় পৃথক রাষ্ট্রিক ও প্রশাসনিক সংগঠনের দাবি করে, এমন কি ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার জন্যও আন্দোলন করে—এ সমস্তই হল তাদের সেই বিপুল নৈরাশ্যের বহিঃপ্রকাশ। তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার জন্য কিছু প্রশাসনিক পরিবর্তন করতে যে হয়নি এমন নয়।

নাগাপাহাড় জেলাকে আসাম থেকে কেটে নিয়ে নেফার টুয়েনসাং বিভাগের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল 1960 অব্দে, নূতন নাগাল্যাণ্ড রাজ্য গঠন করার জন্য। এর দশ বছর বাদে, 1970 অব্দে আসামের অভ্যন্তরস্থ আরও দুটি জেলা, খাসি-জয়ন্তীয়া পাহাড় ও গারো পাহাড়, একত্রযুক্ত করে মেঘালয় নাম দিয়ে একটি স্বায়ত্তশাসিত উপরাজ্য গঠন করা হল। আত্মগোপনকারী নাগা ও মিজোদের সশস্ত্র বিদ্রোহের কথা সুবিদিত। খাসিয়া ও গারো নেতৃবৃন্দ একত্রযুক্ত হয়ে একটি পৃথক পার্বত্য

রাজ্য গঠনের জন্য যে-আন্দোলন চালিয়েছিলেন, তা এমনি এক দীর্ঘমেয়াদী সমস্যা যে তার সমাধানের প্রশ্নটি জওহরলাল নেহরু প্রমুখ রাষ্ট্রনেতাদের মন বিভ্রান্ত করেছিল অনেক দিন ধরে। ইতিমধ্যে পরিত্যক্ত তাদের একটি পরিকল্পনায় প্রস্তাব করা হয়েছিল যে পার্বতীয় ও সমতলীয়দের জন্য পৃথক পৃথক সংগঠন থাকবে এবং প্রত্যেক সংগঠন হবে স্বাধীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। কিছু কিছু লোক এই প্রস্তাবের সুযোগ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের জন্য এইরকম সংগঠনের দাবি করতে লাগল। প্লেনস্ ট্রাইবেল্ কাউন্সিল্ অর্থাৎ সমতলীয় জনজাতি পরিষদ স্বজাতিদের উন্নতিকল্পে ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তর তীরবর্তী সমগ্র অঞ্চলে অনুরূপ পৃথক সংগঠনের দাবি করেছে। তাই-মোঙ্গল পরিষদও (বর্তমান নাম উজনি অসম রাজ্য-পরিষদ) আহোম বা মোঙ্গলসম্ভূত জাতিদের জন্য শিবসাগর ও লখিমপুর জেলায় এইরকম ব্যবস্থার দাবি করেছে। মেঘালয় গঠনের পর মিকির ও উত্তর কাছাড়ের সংযুক্ত জেলা পরিষদকে দুটি পৃথক জেলা পরিষদে বিভক্ত করা হয়েছে। গোয়ালপাড়ার কোকরাঝার অঞ্চলের অধিকাংশ অধিবাসী বোড়ো জাতীয় বলে সেখানে একটি নূতন মহকুমা স্থাপিত হয়েছে। তেমনি হয়েছে লখিমপুরের ধেমাজিতে, কারণ সেখানে মিরি বা মিশিংরা সংখ্যায় গরিষ্ঠ। বোড়ো অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বোড়ো ভাষা প্রবর্তন করা হয়েছে, এবং আসাম সরকার সেইসব অঞ্চলের মাধ্যমিক স্তরেও বোড়ো প্রবর্তন করায় সম্মত হয়েছেন। অন্যান্য কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ও যেখানে যেখানে তাদের সংখ্যাধিক্য সেখানে সেখানে নূতন মহকুমা স্থাপনের দাবি করেছে।

গোটা আসাম দেশটা এইভাবে খণ্ড-ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে—এমন কথা বলার জন্য এইসব ঘটনার অবতারণা করছি না। এইসব উল্লেখের একমাত্র কারণ এইটুকু দেখাবার জন্য যে নূতন ভারতে নূতন নূতন আশা ও আকাঙ্ক্ষা আত্মপ্রকাশের নানারকম পথ সন্ধান করছে। এইসব দাবি দাওয়া সেই আশা আকাঙ্ক্ষার বহিঃপ্রকাশ। আসলে, আসাম দেশে বহু ভিন্ন ভিন্ন জাতি বা গোষ্ঠী পরস্পর দেওয়া নেওয়া মেলামেশার সূত্রে বর্তমান আসামের জনগণকে গড়ে তুলেছে। আসামের সংস্কৃতি ও এইসব জাতি বা গোষ্ঠীর আন্তঃমিশ্রিত সংস্কৃতি। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, 'জাতিতে জাতিতে কিংবা সংস্কৃতিতে সংস্কৃতিতে যখন পরস্পর যোগাযোগ ঘটে, তার প্রভাব কখনো একপেশে হতেই পারে না।'

দুই
পৌরাণিক বিশ্বাস

ডক্টর ভেরিয়র এলউইন্ 1955 অব্দে প্রথম যে বার অরুণাচলের সুবনশিরি বিভাগের অতি উত্তরে টাগিন অঞ্চলে সফরে গিয়েছিলেন গ্রামের প্রবীন প্রধানকে ডেকে শুধিয়েছিলেন, 'আচ্ছা, বলতে পারো জগৎখানা সৃষ্টি করল কে?' জনজাতীয় মোড়লটি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিয়েছিল, 'বলতে পারব না। আমি করিনি এইটুকু বলতে পারি। আমার জন্মের অনেক আগেই ব্যাপারটা ঘটে থাকবে।' ঈশ্বর ও ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে সেই মোড়ল ও তার অনুচরদের সত্যিই যে কোন ধারণা ছিল না, এমন নয়। বৃদ্ধ মুখ খুলতে চায়নি ; সে ভেবেছিল কিছুদিন আগে একটা যে শোকাবহ ঘটনা ঘটেছিল, সায়েব সরকারের হয়ে সেই বিষয়ে তদন্ত করার জন্য তাদের সেই দুর্গম দেশে এসে থাকবেন। ঘটনাটা আর কিছু নয়, প্রধানের জনাকয়েক অনুগামী আসাম রাইফেল্‌স-এর একদল সৈনিককে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল।'

A Philosophy for NEFA গ্রন্থে এল্‌উইন্ লিখেছেন যে সুবৃহৎ জনজাতি আবর বা আদিদের গোষ্ঠীবিশেষ টাগিনদের বিশ্বাস, স্বর্গে সর্বময় কর্তৃত্ব করেন ডনি-পলো অর্থাৎ সূর্য-চন্দ্র দেবতা। 'এই দেবতা সর্বদর্শী, ইনি সত্যের সাক্ষী, ইনি মানুষকে পথ দেখিয়ে দেন, তাকে রক্ষা করেন, তার প্রতি কৃপা করেন। সর্বোপরি যেহেতু তিনি সত্যের প্রভু তাঁর নামে যে শপথ গ্রহণ করা হয় সে শপথ সবচেয়ে বেশি কার্যকর…। সিয়াঙ থেকে উত্তরপূর্ব কামলা পর্যন্ত এবং সম্ভবত তারও বাইরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে, জনবিশ্বাসের অন্তরালে থেকে, ডনি-পলো আদি জনজাতির বিভিন্ন গোষ্ঠির মধ্যে ঐক্যবন্ধনের শক্তি রূপে কাজ করছেন। তাঁর সবচেয়ে বিশিষ্ট গুণ হল সত্য ও শিব। হয়তো সেই পথে আদি ধর্মের বিকাশ সাধন সম্ভবপর হবে। সে যাই হোক, সূর্য যে এক অতি সুপ্রাচীন দেবতা এবং অনেক উন্নততর সভ্যতাও যে সূর্যের পূজা করে এসেছেন—তা নিয়ে তো কোন সন্দেহ নেই।'

জনজাতিদের মধ্যে ঈশ্বর ও সৃষ্টি বিষয়ে ধারণা অনেক ও বহুবিচিত্র—তা গুণে শেষ করা যায় না। তাদের মধ্যে কয়েকটি সুসভ্যতর ও উন্নততর সভ্যতার পরিচায়ক। আসামের সমতল খণ্ডে বসবাস করে মিরি অথবা মিশিংরা। এদের বিশ্বাস চন্দ্র ও

সূর্য থেকে এদের উদ্ভব এবং চন্দ্র হলেন দেবতা ও সূর্য দেবী। তিরাপ-এর টাংসা-রা একটি লোক কথায় তাদের নিজেদের বিশ্বাস ব্যক্ত করে বলেছে—সুদূর অতীতে কেবল দিনই ছিল, রাত্রি ছিল না, কেননা চন্দ্র ও সূর্যের অধিষ্ঠিত দেবতারা আকাশে উদিত হয়ে আলো দিতেন—একজনের পর আরেকজন। পাদাম আদি-রাও বিশ্বাস করে যে সূর্য অস্ত যাবার সঙ্গে সঙ্গে সেকালে চন্দ্র উদিত হত, ফলে কখনো অন্ধকার হত না। যখন আর্যদের মধ্যে চন্দ্র বংশীয় ও সূর্য বংশীয় রাজারাজড়াদের কথা পড়ি, এইসব সরল মানুষের সরল বিশ্বাসের কথা আমাদের মনে পড়তে বাধ্য।

যে-সব বিভিন্ন জাতি ও উপজাতি আসামে বসবাস করতে এসেছিল, পরস্পরের উপর তারা প্রভাব বিস্তার করে এসেছে বলা যেতে পারে। আর্যেরা তাদের উন্নততর সংগঠন ক্ষমতা ও সুবিকশিত ভাষার সাহায্যে নিঃসন্দেহে সমগ্র দেশের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে পেরেছিল। কিন্তু আসামে আগত আর্যদের খানিকটা বাধ্য হয়েই কোন কোন অনার্য দেবদেবী ও আচার অনুষ্ঠান গ্রহণ করতে হয়। তারা শিবকে গ্রহণ করলেন কিরাতদের কাছ থেকে আর গ্রহণ করলেন কামাখ্যাকে; তিনিও কিরাতদের দেবী ছিলেন বলে অনুমান করা হয়। ডক্টর বিরিঞ্চি কুমার বরুয়া বলেছেন, সাধারণ ভাবে বলা চলে যে আসামের লোকসংস্কৃতির সঙ্গে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের লোকসংস্কৃতির অনেক সাদৃশ্য আছে। আসামের বর্তমান বাসিন্দাদের পূর্বপুরুষেরা যেসব অবদান রেখে গেছেন, সেগুলি পরস্পরের সঙ্গে মিলে মিশে সুন্দর ভাবে সমন্বিত হয়ে গেছে বলা চলে। নানা ধারা এসে মিশেছে এই মহানদীতে—তাদের মধ্যে তিব্বত-বর্মী ধারার প্রভাবটাই সব চেয়ে প্রবল। মিশর, ভারত প্রভৃতি মানব সভ্যতার প্রাচীন সব কেন্দ্রে দেখা যায়, সভ্য মানুষের সমাজ সচেতনতার অন্যতম প্রকাশ হল গো-জাতির পূজা। মহেঞ্জোদারোর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ষণ্ডের রূপকল্প আবিষ্কৃত হয়েছে। শিবের অন্য একটি নাম পশুপতি। আসামের গ্রামবাসীরা তাঁদের সর্বপ্রধান উৎসব বিহু-তে এক ধরনের গো-জাতি পূজা পালন করে। আসামের জনজাতিদের এমন কয়েকটি উৎসব ও সামাজিক অনুষ্ঠান আছে যেখানে বন্য মহিষ বলিদান হয়।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হল কীভাবে? যে আর্যেরা সর্বপ্রথম ভারতে প্রবেশ করেছিলেন তাদের ধারনা ছিল, সৃষ্টির আদিতে ছিল কেবল জল, জল ছাড়া কিছুই ছিল না। ঋগ্বেদ-এর মতে পঞ্চভূতের মধ্যে অপ্‌ অর্থাৎ জল থেকে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়েছিল। সৃষ্টির আদিতে সেই একাকার জল থেকে উদ্ভূত হয়েছিলেন হিরণ্যগর্ভ-রূপে পরম পুরুষ প্রজাপতি অথবা ব্রহ্মা। সেই হিরণ্যগর্ভের মধ্যে নিহিত ছিল এই

জগৎ এবং সর্ব দেবতা, অর্থাৎ তিনিই ছিলেন ব্রহ্মা বা সৃষ্টিকর্তা। এই হিরণ্যগর্ভের ধারণা থেকেই সম্ভবত ব্রহ্মাণ্ড (ব্রহ্ম+অণ্ড) ধারণার উৎপত্তি। সে যাই হোক না কেন, ব্রাহ্মণসমূহে প্রজাপতি-সৃষ্ট এই ব্রহ্মাণ্ডের ধারণা অনেকখানি স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। শতপথ ব্রাহ্মণে বর্ণিত কাহিনীটি বুঝতে সব চেয়ে সহজ: 'আদিতে জল ছাড়া আর কিছুই ছিলনা। নিজেকে বৃদ্ধি করার বাসনায় জল নিজেকে নিজে এমন ভীষণ ভাবে আলোড়িত করল যে সেই আলোড়নের ফলে একটি সোনার ডিমের উদ্ভব হল। সেই ডিম থেকে বেরিয়ে এলেন প্রজাপতি। কিন্তু তাঁর দাঁড়াবার মতো ঠাঁই না থাকায় তার মুখ থেকে একটি শব্দ নিঃসৃত হল 'ভূঃ'। এই ভূঃ শব্দ থেকে সৃষ্টি হল পৃথিবী। অতঃপর প্রজাপতি বললেন 'ভুবঃ'—সৃষ্টি হল বায়ুমণ্ডল। তারপর তিনি বললেন 'সুবর' এবং সেই শব্দ থেকে জন্ম নিল আকাশ। দেবতারা সৃষ্ট হলেন তাঁর মুখ থেকে। তিনিই সৃষ্টি করলেন দিন যা-থেকে এল আলো। তিনিই সৃষ্টি করলেন রাত্রি—যা থেকে এল অন্ধকার। বৃহদারণ্যক উপনিষদ বলেছেন, জল হল সকল বস্তুর উৎস। জল থেকে জন্ম নিল সত্য, সত্য থেকে ব্রহ্ম, ব্রহ্ম থেকে প্রজাপতি এবং প্রজাপতি থেকে সর্বদেবতা। মনুস্মৃতির মতে আদিতে ছিল কেবল মাত্র গভীর অন্ধকার; স্রষ্টা সৃষ্টি করলেন জল এবং সেই জলে তাঁর বীজ স্থাপন করলেন। সেই বীজ পরিনত হল স্বর্ণ অণ্ডে এবং সেই অণ্ড থেকে স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা জন্মগ্রহণ করলেন ব্রহ্মারূপে। ব্রহ্মাই সমগ্র বিশ্বের জন্মদাতা, তিনি সেই ডিম্বকে দু-ভাগ করে স্বর্গ ও মর্ত্যের সৃষ্টি করলেন।' হিন্দু সংস্কৃতির মধ্যে প্রায় সকল লোকই এই প্রকার সৃষ্টিতত্ত্বে বিশ্বাস করে। অসমীয়া বৈষ্ণবদের পবিত্রতম গ্রন্থ শ্রীশঙ্করদেব-বিরচিত 'কীর্তন'-এর সূত্রপাতে যে কয়েকটি ছত্র আছে, তাতে গ্রামবাসী সাধারণ অসমীয়ার সৃষ্টি-বিষয়ক ধারণা সুন্দররূপে প্রতিফলিত:

প্রথমে প্রণামো ব্রহ্ম-রূপী সনাতন
সর্ব অবতারের কারণ নারায়ণ ॥
তযু নাভি-কমলত ব্রহ্মা ভৈলা জাত।
যুগে যুগে অবতার ধরা অসংখ্যাত ॥
মৎস্যরূপে অবতার ভৈলা প্রথমত।
উদ্ধারিলা চারি বেদ প্রলয়-জলত ॥

এখানে সেই প্রথম প্রলয় পয়োধি জলের কথা, ব্রহ্মার ও শাশ্বত সনাতন সৃষ্টিকর্তার কথা বলা হয়েছে।

আসামের সরল মানুষের কয়েকটি সরল বিশ্বাস পরীক্ষা করে দেখা যাক। একটি

কাছাড়ি কাহিনীতে বলা হয়েছে, পৃথিবীতে প্রথমে বিরাজ করছিল গভীর এক নিস্তব্ধতা। সেই বিরাট নিস্তব্ধতা থেকে উদ্ভূত হল একটি পুরুষ, একটি নারী, তাদের মিলনে নারী হল গর্ভবতী। যথাসময়ে সে ডিম পাড়ল সাতটি। প্রথম ছয়টি ডিম থেকে জন্ম নিল রাজা, মানুষেরা ও দেবতারা। সপ্তম ডিম থেকে বেরিয়ে এল বীভৎস সব ভূত-প্রেত। বোড়ো গোষ্ঠীর কাছাড়ি-দের ধারণা, তাদের পূর্বপুরুষেরা এসেছিল সেই প্রথম ছয়টি ডিম থেকে এবং সপ্তমটির সন্তান হল আধিব্যধি মহামারীর অপদেবতারা।

মানুষের উদ্ভব সম্বন্ধে বোড়ো সমাজে আরো একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। ভগবান আহামগুরু দুটি পাখি সৃষ্টি করেছিলেন—তার মধ্যে একটি পুরুষ, একটি নারী। নারী পাখি তিনটি ডিম পাড়ল। হাজার হাজার বছর ঘুরে গেল কিন্তু ডিম থেকে বাচ্চা আর হয় না। তখন নারী পাখিটি একটি ডিম ভেঙে দেখতে চাইল ভিতরে কী আছে। ছানাপোনার চিহ্নমাত্র নেই। আহামগুরু দেখা দিয়ে বলে গেলেন আর দুটি ডিম ভাঙা যেন না হয়। আর বললেন, ভাঙা ডিমের টুকরোগুলো চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিতে। সেই সব টুকরো থেকে জন্মাল ভূত-প্রেত, কীট-পতঙ্গ এবং গাছপালা। তারপর আরো একটা হাজার বছর কেটে যাবার পর অন্য দুটি ডিম থেকে মানুষের সৃষ্টি হল।

উপরোক্ত দুটি কাহিনীতেই স্বর্গ, মর্ত্য ও পরলোকের আস্তিত্ব স্বতোসিদ্ধ ভাবে মেনে নেওয়া হয়েছে। কাহিনী দুটির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল অণ্ড-বিষয়ক ধারণা, যার সঙ্গে সংস্কৃত শাস্ত্রের ব্রহ্মাণ্ড কিংবা স্বর্ণ ডিম্বের ধারণার বিশেষ একটা মিল দেখা যায়।

একটি টাংসা উপকথায় বলা হয়েছে যে সৃষ্টির আদিতে পৃথিবীর অস্তিত্ব ছিল না, চতুর্দিকে ছিল জল আর জল। সেই জল থেকে দু জন ভায়ের উদ্ভব হল। দুটিতে জলে ভেসে খেলা করে। তারপর তাদের মন থেকে পৃথিবী গড়ে উঠতে শুরু করে। সেই দুই ভাইই সৃষ্টি করেছিল চন্দ্র ও সূর্য, তারপর তারা সৃজন করে মানুষ-- পুরুষ ও নারী। একটি দেউরী উপকথায় বলা হয়েছে যে প্রথমে পৃথিবীর চতুর্দিকে থৈ থৈ করত জল। ভগবান তখন থাকতেন স্বর্গে। প্রাণী সৃষ্টি করবার ইচ্ছায় তিনি একটি ময়ূর ও একটি টিমটিম পাখিকে পাঠালেন দেখে আসতে যে জল থেকে পৃথিবী মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে কি না। সুন্দর সুন্দর রঙিন পাথর দেখে ময়ূর তার কাজের কথা সম্পূর্ণ ভুলে গেল। এদিকে টিম টিম পাখি ঠিক স্বর্গে ফিরে গিয়ে ভগবানকে জানাল যে পৃথিবী বেরিয়ে আসছে জলের ভিতর থেকে। ভগবান তখন মর্ত্যে নেমে এসে

প্রাণী জগতের সৃষ্টি করলেন। ময়ূর নিজের ভুল বুঝতে পেরে ভগবানের কাছে ক্ষমা চাইল। ময়ূর ভগবানের প্রিয় পাত্র ছিল বলে ভগবান তাকে ক্ষমা তো করলেনই, উপরন্তু বিধান দিলেন যে ময়ূরপুচ্ছ তার শিরের শোভা সাধন করবে। অরুণাচলের একটি উপকথা বলে যে, পৃথিবী সৃষ্টি হবার আগে চারিদিকে ছিল জল আর জল। তখন অন্তরীক্ষের অধিপতি ছিল দুই ভাই, আর আকাশে গজিয়েছিল একটি পদ্মলতা। দু-ভাই নীচের জলরাশি লক্ষ্য করে পদ্মলতা ছুঁড়ে দিল সেই জলে। এইভাবে ফুল গাছ গজাতে শুরু করল। তারপর দু-ভাই নিয়ে এল বাতাস এবং বাতাস দশ দিক থেকে বিচিত্র বর্ণের ধুলো উড়িয়ে নিয়ে এল। সেইসব ধুলো জলে থিতিয়ে যেতে পৃথিবীর সৃষ্টি হল।

সুতরাং দেখা যায় উন্নততর আর্যদের মতো এইসব আদিম জাতি মানুষের মনেও সেই একই বিশ্বাস ছিল যে আদিতে কেবল জল ছিল এবং জল ছাড়া আর কিছুই ছিল না। বোধকরি নির্দ্বিধায় বলা যায় যে জীবন রহস্য বিষয়ে বিভিন্ন জাতি উপজাতির ধারণা কিছুটা দূর পর্যন্ত একই রকম। ডক্টর এ. ডি. পুসলকর তাঁর Studies in Epics and Puranas in India গ্রন্থে বলেছেন : 'প্রাচীন সংস্কৃতির সকল ছাত্র, সকল নৃতাত্ত্বিক ভালো করেই অবগত আছেন যে বিশ্বের সকল আদিম মানুষ একই ধরনের চিন্তা করত, একই ধরনের কার্যও করত। সুতরাং বিশ্বসৃষ্টি সম্পর্কে তাদের ভাবনা চিন্তার মধ্যে একটি মৌলিক ঐক্যসূত্র লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু বিশ্বসৃষ্টি সম্পর্কিত বিভিন্ন দেশের কাহিনী বা উপকথার মধ্যে এই মিলটুকু প্রকাশ পেতে খানিকটা সময় নেয়। এটা লক্ষ্যনীয় যে এইসব কাহিনী বা উপকথায় পৃথিবী যে ন্যূনতম সাম্ভাব্য উপাদান থেকে সৃষ্ট হয়েছে—এমন একটা বিশ্বাস দেখা যায়।'

উপরোক্ত কাহিনীগুলি আমরা বাইবেল-এর সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে তুলনা করে দেখতে পারি। বাইবেল-এর আদিপুস্তক The Book of Genesis-এ মনুস্মৃতির মতো বলা হয়েছে যে আদিতে ঈশ্বর আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি করলেন। তখন পৃথিবী ঘোর অন্ধকার ছিল এবং কেবল ঈশ্বর বিচরণ করছিলেন বিরাট জলধির উপর। সৃষ্টির প্রথম দিবসে ঈশ্বর দীপ্তি (দিন) থেকে অন্ধকারকে (রাত্রি) পৃথক করলেন, ঠিক যেমনটি করেছিলেন শতপথ ব্রাহ্মণের প্রজাপতি। প্রলয়-পয়োধি ছিল টাংসা ও দেউরী উপকথার জলরাশির মতো। দেউরী উপকথার ময়ূর ও টিমটিম পাখিকে ভগবান পাঠিয়েছিলেন দেখে আসতে যে জলরাশি থেকে পৃথিবী জেগে উঠেছে কি না। তেমনি নোহ তাঁর জাহাজ থেকে ছেড়েছিলেন দাঁড়কাক ও কপোতকে ভূমির উপর থেকে জল হ্রাস পেয়েছে কি না দেখে আসতে। ময়ূর যেমন

ফেরেনি দাঁড়কাকও তেমনি ফিরে আসেনি। টিমটিম পাখির মতো কপোতও ফিরে গিয়েছিল বন্যার পরিস্থিতির বিষয়ে খবর দিতে।

দেউরী উপকথায় ভগবানের শিরোভূষণ শিখিপুচ্ছের কথাটা নিশ্চয় হিন্দু-প্রভাব প্রসূত। বৈষ্ণব সাহিত্যে কৃষ্ণের সঙ্গে ময়ূরপুচ্ছ যেন অঙ্গাঙ্গী যুক্ত। দেউরীদের মুখ্য দেব ও দেবী গিরা ও গিরাচী আসলে হর ও পার্বতী। সম্ভবত প্রাচীন কালের গিরা-গিরাচীকে পরবর্তী কালে হিন্দু হর-পার্বতীতে পরিণত করা হয়ে থাকবে। বর্তমানে মিশিংরা হিন্দু। অতীতে তারা কিন্তু মেঘ, বিদ্যুৎ, তারা, সূর্য, চন্দ্র প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তিকে দেব-দেবী জ্ঞানে পূজা করত। সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে রচিত একটি মিকির লোকসংগীতে প্রভূত হিন্দু প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তাতে বলা হয়েছে, প্রথমে ব্রহ্মা পৃথিবী সৃষ্টি করলেন, তারপর সৃষ্টি করলেন তরুলতা, জীবজন্তু, সর্বশেষে নিজ দেহের একটি অংশ থেকে সৃষ্টি করলেন কার্বি বা মানুষ। মিকিররা নিজেদের পরিচয় দেয় 'কার্বি' বলে। শ্রাদ্ধের মূলমন্ত্ররূপে মিকিররা যে লোকগীত গেয়ে থাকে তাতে বলা হয়েছে যে একটি পাখি একাধিক ডিম পেড়েছিল, তার প্রত্যেকটি থেকে ভিন্ন ভিন্ন জাতের মানুষ জন্মেছিল। কার্বি অর্থাৎ মিকিররা সেইরকম এক বিশিষ্ট জাতির মানুষ। মিকিরদের মতে গানে যে ডিমের কথা বলা তা ব্রহ্ম+অণ্ড অর্থাৎ ব্রহ্মের অণ্ড ছাড়া আর কিছু নয়। আর একটি দেউরী উপকথায় দেখা যায় রঘুবংশের কুলপুরোহিত অগস্ত্যমুণিকে জনজাতীয় কুণ্ডিল অথবা কুণ্ডিল রাজ্যে এনে তাঁকে ভীষ্মকরাজার কন্যার সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হয়েছে। উত্তরাঞ্চলের পার্বত্য অকা-রা হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত। যদিও তাদের মুখ্য জনজাতীয় দেবতা হলেন পূ-মু-সাগো যিনি আকাশ, পৃথিবী আর পরলোকের সৃষ্টি করেছেন, অধিকাংশ অকা-রা বর্তমানে বলে থাকে যে হরিদেও তাদের দেবতা। হরিদেওকে পূজা করার জন্য তারা এখন গ্রামে গ্রামে মন্দির প্রতিষ্ঠা করে। অকাদের বিশ্বাস তারা বাণরাজার পুত্র ভালুক রাজার বংশধর এবং তারা নাকি সমতল রাজ্য ছেড়ে পর্বতে তাদের বাসস্থান উঠিয়ে নিয়ে গেছে। কেউ কেউ বলেন, ভালুক হলেন পৌরাণিক কাহিনীর জাম্ববন্ত। কথিত আছে যে তেজপুর অঞ্চলের একজন বৈষ্ণব প্রচারক সমতল ছেড়ে পর্বতে তাঁর মঠ স্থাপন করেন, সেই মঠের নাম গোঁসাইখান। অকা-রা গোঁসাইথানে গিয়ে তাঁর কাছে বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করে।

সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য পৌরাণিক কাহিনী হল ব্রহ্মকুণ্ড-বিষয়ক। অরুণাচলের মিশমি-রা এই কাহিনীর সঙ্গে জড়িত। ব্রহ্মকুণ্ডকে সর্বসাধারণে পরশুরাম কুণ্ড বলে জানে। কালিকাপুরাণ অনুসারে পিতার আদেশে পরশুরাম তাঁর মাতা রেণুকাকে

হত্যা ক'রে, মাতৃহত্যার পাপ স্খলন করার জন্য ওই কুণ্ডে অবগাহন করেছিলেন। এই কুণ্ডের অবস্থান মিশমি-অধ্যুষিত অঞ্চলের একেবারে অন্তস্থলে। লোকেদের বিশ্বাস তীর্থরূপে পরশুরাম কুণ্ড মূলত ছিল মিশমি-দের প্রতিষ্ঠান এবং মিশমি-রা এক কালে তীর্থযাত্রীদের কাছ থেকে দর্শনী আদায় করত। মিশমি-রা বলে তারা কুণ্ডিল অথবা কুণ্ডিনের রাজা ভীষ্মকের জ্যেষ্ঠপুত্র রুক্মের ঔরসজাত সন্তানদের বংশধর। তারা এমনও বলে থাকে, ভীষ্মকের একমাত্র কন্যা রুক্মিনী—যাকে কৃষ্ণ বিবাহ করেছিলেন--ছিলেন মিশমি তরুণী। প্রথমে স্থির হয়েছিল রুক্মিনীর বিবাহ হবে স্থানীয় রাজা শিশুপালের সঙ্গে। রুক্মিণীর অনুরোধক্রমে কৃষ্ণ কুণ্ডিল যান এবং এক ভয়ংকর যুদ্ধে শিশুপালকে পরাস্ত করে তিনি রুক্মিণীকে নিয়ে ফিরে যান দ্বারকায়। কুণ্ডিল অথবা কুণ্ডিন নগর অবস্থিত ছিল বর্তমান শদিয়া থেকে প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরে। তারও কয়েক মাইল দূরে ছিল শিশুপালের দুর্গ। এ সমস্তই মিশমি পাহাড়ের অন্তস্থলে। হেম বরুয়া লিখেছেন : 'শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হবার প্রতীকচিহ্ন রূপে মিশমি-রা এখনো তাদের কপালে একটা রুপোর টিক্‌লি পরে—তার নাম কপালী।'

উত্তর-স্থিত পর্বতমালার দফলা-রা হয় আক্রমণ-অভিযানের সূত্রে কিংবা ব্যবসা-বাণিজ্যের খাতিরে, অতি পুরাতন কাল থেকে চারিদুয়ার, তেজপুর ও উত্তর লক্ষীমপুরের সমতলবাসীদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে এসেছে। দফলা-দের কিছু কিছু লোক বিশেষত তরবটীয়া ও পানীবটীয়া-রা বৈষ্ণব প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। উত্তর-লক্ষীমপুরের বৈষ্ণব সত্র ঘারমরা হল তাদের গুরুঘর। জনজাতিদের উপর বৈষ্ণব প্রভাবের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ অবশ্য তিরাপ-এর নকেট-রা। এই নাগা গোষ্ঠীর লোকেরা মারঘেরিটা (ডিগবয়-এর সন্নিহিত), নাহরকটীয়া, নামরূপ ও শিবসাগরের কাছাকছি পাহাড়ে পর্বতে বসবাস করে। আহোম রাজাদের আমল থেকে নকেট রাজারা এই সব সমতল এলাকার সঙ্গে খুবই সৌহার্দপূর্ণ সম্বন্ধ রক্ষা করে চলত। সতেরো শতকে শ্রীরামদেব নামে একজন বৈষ্ণব গুরু নাহরকটী-য়াতে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। নকেট-রাজ খুনবাও ছিলেন তাঁর ভক্ত শিষ্য, বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করার পর তার নাম হয় নরোত্তম। শ্রীরামদেবের পদচরিতে এই কাহিনী বর্ণনার সূত্রে বলা হয়েছে যে গুরু ও শিষ্য উভয়েরই জন্ম ও মৃত্যু একই দিনে ঘটেছিল। অনুগামী-সমভিব্যাহারে নরোত্তম দিহিং নদীর পারে পারে পদব্রজে চলে আসতেন গুরুর সত্রে। সেখানে তাঁর অনুচরেরা বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা লাভ করত। নরোত্তম ছিলেন নামচাং-এর প্রধান নৃপতি, তাঁর অধীনে বহু ছোট ছোট সামন্ত ছিল। তাদের

অধীনস্থ প্রত্যেকটি গ্রামে আসামের বৈষ্ণব ঐতিহ্য অনুসারে একটি করে নামঘর ছিল যেখানে গ্রামের লোক পূজা-পাঠ ও নামকীর্তনের জন্য একত্র সমবেত হত। একই দিনে গুরু শ্রীরামদেব ও রাজা নরোত্তম দেহরক্ষা করেন। বহু যোজন ব্যবধানে দুজনের মরদেহ চিতা শয্যায় স্থাপন করে অগ্নিসংকার করা হয়। স্থানীয় বৈষ্ণবেরা লক্ষ্য করল দুই চিতাশয্যা থেকে দুটি ধোঁয়ার কুণ্ডলী ঊর্ধ আকাশে উঠে একটি বিন্দুতে মিলিত হয়ে একসঙ্গে যাত্রা করল বৈকুণ্ঠের পানে।

আসামের হিন্দুদের মধ্যে সব চেয়ে জনপ্রিয় দেবতা হলেন বিষ্ণুর কৃষ্ণরূপী অবতার। ষোলো শতকে শ্রীশঙ্করদেব-প্রবর্তিত ও তাঁর দ্বারা প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম, সমতলস্থিত জেলাগুলিতে সব চেয়ে বহুল প্রচলিত ধর্মপন্থা। তিনি ও তাঁর অনুগামী ভক্ত-কবিবৃন্দ নাটক, গীত ও কাব্য রচনা তো করেনই, উপরন্তু কৃষ্ণের জীবনী ও লীলা প্রসঙ্গ নিয়ে রচিত মূল সংস্কৃত গ্রন্থাদি অনুবাদের সূত্রে দেখান যে কৃষ্ণ হলেন এক এবং অদ্বিতীয় পরম দেবতা ও অন্য সকল দেবতা তার অধীন। শঙ্করদেবের বৈষ্ণবধর্ম মধ্যযুগে ভারতের নব বৈষ্ণব আন্দোলনের অংশ বিশেষ। তাঁর কৃষ্ণ হলেন ভাগবতের কৃষ্ণ। বহু বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও শঙ্করদেব আসামের হিন্দুধর্মের ক্ষেত্রে একটি সুস্পষ্ট পন্থার নির্দেশ দিতে পেরেছিলেন। দেশের গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে একটি যে-নাম উচ্চারিত হয় তা-হল কৃষ্ণের নাম। গ্রামের সহজ সরল মানুষেরা নামঘরে একত্র হয়ে কৃষ্ণনাম কীর্তন করে। নবমবিধ ভক্তির মধ্যে শঙ্করদেব শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়েছিলেন শ্রবণ ও কীর্তনকে। তাঁর প্রচলিত বৈষ্ণবধর্মকে অনেকে নামধর্ম বলে থাকেন। তার কৃত ভাগবতের অনুবাদ ও অন্যান্য বৈষ্ণব কবিদের পুঁথি থেকে গ্রাম-আসামের জনসাধারণ কৃষ্ণের সমগ্র কাহিনী জানতে পারে। এই সব গ্রন্থে রামকেও বিষ্ণুর কৃষ্ণ-অবতারের সমার্থক বলে দেখানো হয়। ভগবাঞ্ছাকল্পতরু, উপাসক সাধারণের কল্যাণকর দেবতারূপে কৃষ্ণের নানারূপ কীর্তিকলাপের বর্ণনা ছাড়াও, বালগোপালের নানা মনোরঞ্জক লীলাখেলার বিষয় নিয়ে সরল গ্রামবাসীদের জন্য অসংখ্য কাহিনী রচিত হয়েছে, গীতও রচিত হয়েছে অগণিত। আজকের দিনেও কৃষ্ণকে নিয়ে গীতি রচনা নামগোত্রহীন লোকগীতিকার-দের কাছে খুবই জনপ্রিয়। নিঃসন্দেহে বলা চলে বৈষ্ণবকবিরা যে প্রভাব বিস্তার করে গেছেন এখনো তা জনসাধারণের মনে কার্যকর হয়ে আছে। রাত-সীতা ও কৃষ্ণ-রুক্মিণীর বিবাহের বিষয়টি এখনো 'বিয়ানামের' অপরিহার্য অঙ্গ। পাড়ার কোন মেয়ের বিয়েতে পড়শিনী এয়ো-স্ত্রীরা মুখে মুখে এই সব বিয়ানাম বা বিবাহ সংগীত করে থাকে। এমন কি কৃষ্ণ এখন অন্ধ বিশ্বাসেরও অঙ্গ—আকস্মিক ভয়ের

কারণ ঘটলে লোক তৎক্ষণাৎ থুতু ফেলে বলে ওঠে—'কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!' নারীসঙ্গ কামনায় যদি মাত্রাধিক্য দেখা যায় কৃষ্ণের দৃষ্টান্ত দিয়ে ভর্ৎসনা করা হয়—আলোচ্য ব্যক্তিকে বলা হয় কলির কৃষ্ণ!

আসামের ধর্মক্ষেত্রে শিব ও শক্তির স্থান কিছু কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বহু প্রাচীন কাল থেকে এই দুই দেব-দেবীর পূজা এ-দেশে প্রচলিত ছিল। ডক্টর বাণীকান্ত কাকতি তাঁর The Mother Goddess Kamakhya গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে আর্যীভূত জাতি ও আদিম জাতি—এই উভয় স্তরেরই লোকেদের মধ্যে শিবপূজাই সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ধর্মবিশ্বাস ছিল বলে মনে হয়। অন্যান্য সব দেবতাদের মন্দিরের তুলনায় শিবমন্দিরের সংখ্যা সর্বদাই বেশি ছিল। কালিকাপুরাণে শিবের মাহাত্ম্য বিরাজ করছে এইরকম পনেরটি তীর্থের উল্লেখ দেখা যায়। সে ক্ষেত্রে দেবী ও বিষ্ণুর মাহাত্ম্য সম্বলিত তীর্থের সংখ্যা পাঁচটি করে। প্রাচীন কালে আসামের বহু রাজাই শিবের প্রতি তাঁদের আনুগত্যের কথা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। আহোম রাজা শিবসিংহ যদিচ পরে শাক্ত মতে দীক্ষা নিয়েছিলেন, দেখা যায় যে 1720 অব্দে আসামের স্থাপত্য কলার একটি সুন্দর ও সুদৃশ্য নিদর্শনরূপে শিবসাগরে তিনি শিবদল নামে একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তেজপুরে বাণাসুর প্রতিষ্ঠিত মহাভৈরব মন্দির ও গৌহাটির নদী-দ্বীপ উমানন্দে অবস্থিত শিবমন্দির আজকের দিনেও শিবপূজার দুটি প্রধান কেন্দ্ররূপে বিরাজ করছে। শিবচতুর্দশী ও শিবরাত্রির উৎসবের দিন আজো হাজার হাজার ভক্ত এই দুটি মন্দিরে ভিড় করে। ষোলো শতকের বৈষ্ণব আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের পূজাপদ্ধতি ব্যতীত অন্য সকলরকম পূজাপদ্ধতি নিষেধ করা। তত্রাচ লক্ষ্য করা যায় যে বৈষ্ণব সংস্কারকদের সর্বশ্রেষ্ঠ-দের মধ্যেও শিব তাঁর আপন অস্তিত্বের সাক্ষ্য রেখেছিলেন। শঙ্করদেব নামটাই তাৎপর্যপূর্ণ, কথিত আছে শিবকে পরিতুষ্ট করে তাঁর পিতা শঙ্করদেবের মতো সন্তান লাভ করেছিলেন। শঙ্করদেবের প্রধান শিষ্য ও দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন মাধবদেব। তাঁর অগ্রজ তাঁকে আদেশ দিয়েছিলেন শিবরাত্রিতে মাধব যেন শিবপূজা করেন।

ইতিপূর্বে বলা হয়েছে, শিব মূলত আর্য দেবতা ছিলেন না—তিনি ছিলেন অনার্য মূলজ। মহেঞ্জোদারোর দ্রাবিড়েরা সম্ভবত শিবপূজা করত, হয়তো প্রাগ্‌জ্যোতিষের অনার্য কিরাতদের দেবতা ছিলেন শিব। কালিকাপুরাণে আছে যে শম্ভু বা শিব প্রাগ্‌জ্যোতিষ রক্ষা করতেন তাঁর স্বক্ষেত্ররূপে, এবং ম্লেচ্ছ বলে খ্যাত ক্ষত্রিয়ের এক গোষ্ঠী গোপনে তাঁর পূজা করত। বোড়োদের মধ্যে প্রচলিত একটি বিশ্বাস কালিকা পুরাণের এই কাহিনী সমর্থন করে। বোড়োদের জাতিগত ঐতিহ্য বলে যে পশ্চিম

আসামের বোড়োদের সর্বপ্রথম দেব ও দেবী দিবা ও দিবী শিব ও পার্বতী ছাড়া আর কেউ নন। পূর্ব প্রান্তের সোনোয়াল কাছাড়ি-রা বার্থৌ বলে যে দেবতাকে বিশেষ আড়ম্বরের সঙ্গে পূজা করে, তাঁকে সনাক্ত করা হয়েছে শিব বলে। দেউরী-দের প্রাচীন দেব-দেবী গিরা-গিরাচীও হর-পার্বতী ছাড়া আর কেউ নন। লালুং-রা বলে ফা মহাদেউ হলেন তাদের শ্রেষ্ঠ দেবতা এবং তারা উদ্ভূত হয়েছে ফা মহাদেউ থেকে। সুতরাং আসামের গ্রাম্য মানুষের কাছে একজন অতিশয় জাগ্রত দেবতারূপে শিব যে এখনো বিরাজ করছেন—এতে আর আশ্চর্য কী! গাঁজাভাঙের নেশায় মশগুল একজন গ্রাম্যবৃদ্ধ রূপে শিবের যে কল্পনা করা হয়, তার সেই ছবিটাই সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়। শিবকে নিয়ে অসমীয়া সাহিত্যে ঠাট্টা-মশকরা কিছু কম হয়নি।

মাতৃকাদেবীর বিভিন্নরূপের মধ্যে কামাখ্যা হল সব চেয়ে প্রখ্যাত। গৌহাটির নীলাচল পাহাড়ে কামাখ্যা মন্দিরে তার মুখ্য তীর্থ। এখানেই তন্ত্র-প্রধান শাক্ত ধর্মের উদ্ভব হয়েছিল। আদিতে কামাখ্যা সম্ভবত মাতৃশাসিত খাসিয়া কিংবা গারোদের মতো কোন কিরাত জনজাতির পূজ্যা দেবী ছিলেন। পুরান-প্রসিদ্ধ নরকাসুর, কৃষ্ণকে যার জন্মদাতা পিতা ও রক্ষাকর্তা বলা হয়, সেই নরক ছিল কামাখ্যার পৃষ্ঠপোষক। এই কাহিনীর প্রতীকী তাৎপর্য যদি বাদ দেওয়া যায়, তাহলে বলা চলে আসামের আর্যীকরণে কামাখ্যার আবির্ভাব হল অন্যতম পদক্ষেপ। পুরাণোক্ত কাহিনীতে বলে, কৃষ্ণ স্বয়ং নরকাসুরকে শিব-পূজা পরিহার করতে বলেছিলেন। এর অর্থ সম্ভবত এই যে, তখনো এ দেশে শৈব ও শাক্ত উভয় ধর্মই পরস্পরের পাশাপাশি প্রচলিত ছিল এবং আর্য অনুপ্রবেশকারীরা শৈব ধর্মের চেয়ে শাক্ত ধর্মকেই অধিকতর মর্যাদা দিয়ে থাকবে। শাক্ত ধর্মের প্রভাব যে কত গভীর ও ব্যাপক ছিল তার প্রমাণস্বরূপ দেখা যায় যে আজো ভারতের দূরদূরান্ত থেকে বহু তীর্থযাত্রী এসে কামাখ্যা মন্দিরে পূজা দেয়। কালিকাপুরাণে বলা হয়েছে যে পিতা দক্ষের যজ্ঞে স্বামীর অসম্মান সহ্য করতে না পেরে সতী দেহত্যাগ করলে পর শোকান্ধ ও ক্রোধান্ধ শিব-সতীর দেহ বহন করে ঘুরছিলেন। শিবের সেই ক্রোধ থেকে জগৎকে রক্ষা করার জন্য কৃষ্ণ তাঁর সুদর্শন চক্রের আঘাতে সতীদেহ খণ্ড খণ্ড করে কেটে ফেলেন। তখন তাঁর যোনিখণ্ড গিয়ে পড়ে নীলাচলে। এই প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখযোগ্য—কামাখ্যা মন্দিরে কোনো প্রতিমা নেই, মন্দির-অভ্যন্তরে একটি গুহা এবং গুহার অভ্যন্তরে যোনিচিহ্ন-সম্বলিত একখণ্ড প্রস্তর। প্রস্তরের তলদেশস্থিত একটি ঝরণার জল সর্বক্ষণ যোনিপট্টকে অভিষিক্ত করে রাখে। ভক্তেরা সেইখানেই তাদের পুষ্পার্ঘ উৎসর্গ করে। যোগিণীতন্ত্রে অপর একটি কাহিনী আছে ঃ ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করার পর

পর নিজের কৃতিত্ব দেখে ব্রহ্মা অতিশয় গর্বিত হলেন। কালী মনস্থ করলেন যে ব্রহ্মাকে একটা উচিত শিক্ষা দিতে হবে। নিজের দেহ থেকে কেশীনামে এক দৈত্য সৃষ্টি করে কালী ব্রহ্মার পিছনে তাকে লেলিয়ে দিলেন। পরম ত্রাসে ব্রহ্মা বিষ্ণুকে সঙ্গে নিয়ে পলায়ন করলেন। দূর পথ পলায়ন করতে গিয়ে ব্রহ্মার গর্বভাব দূর হল, বিষ্ণুকে সঙ্গে নিয়ে তিনি ফিরে এলেন কালীর কাছে, স্তব করতে লাগলেন যাতে তিনি প্রসন্ন হয়ে মার্জনা করেন, নইলে দৈত্যের অত্যাচারে ত্রিলোক যে রসাতলে যায়! ব্রহ্মার স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে কালী কেশীকে ভস্ম করে দিলেন। সেই ভস্ম থেকে যে ঘাস গজাল তাই দিয়ে ব্রহ্মাকে আদেশ করলেন একটি তৃণাচ্ছাদিত পর্বত সৃষ্টি করতে। ব্রহ্মা পর্বত সৃষ্টি করলেন, তখন কালী আপন সৃষ্টিশক্তির সাহাযে একটি যোনিচক্র রচনা করে সেটি স্থাপন করলেন পর্বতে। কালিকাপুরাণ ও যোগিণী-তন্ত্র—এই দুটি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রাচীন কামরূপ কিংবা তারই ধারে কাছে রচিত হয়েছিল। মুসলমান আক্রমণে ধ্বংস হয়ে যাবার পর খৃস্টিয় 1665 অব্দে কোচদের রাজা নরনারায়ণ বর্তমান মন্দিরটি নির্মাণ করিয়েছিলেন। ডক্টর বাণীকান্ত কাকতি বলেন: 'কামাখ্যা মন্দিরে পূজা দেবার জন্য কোচ রাজা বাইরে থেকে পুরোহিত এনে বসিয়েছিলেন। সেই বংশানুক্রমিক পুরোহিতদের বিশ্বাস যে অতীতে দেবীর উপাসকেরা ছিল গারো! এখন দেবীর তুষ্টি সাধনার্থ শূকর বলি দেওয়া হত।'

কালিকাপুরাণে আরো বলা হয়েছে যে পরবর্তী-কালে নরকাসুর কৃষ্ণের অসন্তুষ্টি করে। শিবের একান্ত সেবক বাণরাজা নরককে বিপথে নিয়ে যায়। অধঃপতনের চরম অবস্থায় নিদারুণ দম্ভ ভরে নরক পাণি প্রার্থনা করে বসল স্বয়ং কামাখ্যাদেবীর। এটা হয়ে গেল নরকের নিতান্তই বাড়াবাড়ি। দেবী তার বিরুদ্ধে একটা কৌশল খাটালেন: প্রতাপশালী নৃপতির প্রস্তাব তিনি যেন মেনে নিয়েছেন এইরকম ভাব দেখিয়ে, একটি কেবল শর্ত আরোপ করলেন এই যে—একটি রাতের মধ্যে নীলাচলের পাদদেশ থেকে একেবারে মন্দিরের দ্বার অবধি একটা পাথরের সিঁড়ি গড়িয়ে দিতে হবে। কালবিলম্ব না করে নরক সেই সিঁড়ি তৈরির কাজে তার লোকদের লাগিয়ে দিল। রাত শেষ হবার আগেই কাজ প্রায় শেষ হয়ে এল। ব্যাপার দেখে দেবী আতঙ্কিত। অনন্যোপায় হয়ে তাঁকে পুনরায় কৌশলের আশ্রয় নিতে হল। তিনি মোরগের অনুকরণে ডাক ছাড়লেন, কৌঁক্-কোঁ-কর-কোঁ! আশাহত নরক ক্রোধান্ধ হয়ে একটা মোরগের পেছনে তলোয়ার হাতে ছুটল। তার ধারণা হল ওই মোরগটাই দোষী। শেষ পর্যন্ত কামাখ্যা মন্দির থেকে কয়েক মাইল দূরে ব্রহ্মপুত্রের অপর পারে নরকের তলোয়ারের আঘাতে বেচারা মোরগ দ্বিখণ্ডিত হল। মোরগ যেখানে

কাটা পড়ল সেই জায়গাটাকে বলা হয়—'কুকুরা কটা চকী'—অর্থাৎ মোরগ-মারা ফাঁড়ী।

সুতরাং নরক আর দেবীপূজার সমর্থক রইল না, দেবীও তার প্রতি বিরূপ হলেন। কথিত আছে, সেই সময় বশিষ্ঠ মুনি কামরূপে এসেছিলেন ও কামাখ্যা-দর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। দাম্ভিক রাজা আদেশ দিলেন যেন বশিষ্ঠের মুখের ওপর মন্দিরের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। বশিষ্ঠ শাপ দিলেন—দেবী নরককে পরিত্যাগ করে তার রাজ্য ছেড়ে চলে যাবেন। নরক দেখল দেবী সত্যিই অন্তর্হিত, তাঁর সাজ-সজ্জার চিহ্নমাত্র নেই। এতকাল বিষ্ণুর আশ্রিত ছিল নরক, এখন বিষ্ণুও নরকের দুষ্কর্ম মুখ বুজে সইতে চাইলেন না। পাপের অবধি নেই নরকের : দেবরাজ স্বয়ং ইন্দ্রসমেত সকল দেবতাকে সে পরাভূত করেছে, দেবলোকের মাতা অদিতির মহামূল্য অলঙ্কার লুণ্ঠন করেছে, বরুণের ছত্রটাও বলপূর্বক কেড়ে এনেছে। সুতরাং বিষ্ণু এসে নরককে বধ করলেন, সেই যুদ্ধে কামাখ্যা বিষ্ণুর সহায় হলেন। এই জনপ্রিয় কাহিনীর প্রতীকধর্মী তাৎপর্য সম্ভবত এই যে, সেই সময়ে শৈব ও শাক্ত মতবাদের মধ্যে একটা নিদারুণ বিরোধ বেধে থাকবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, নরকের মিত্র ও চালক বাণরাজা ছিলেন অত্যুৎসাহী শৈব, এবং কামাখ্যার অনতিদূরের ক্ষুদ্র নদী-দ্বীপ উমানন্দের মন্দির ছিল শৈবদের প্রখ্যাত তীর্থস্থান।

পুরাণ-কাহিনীর উপসংহারে দেখা যায় দেবীর প্রভূত পরিবর্তন ঘটেছে। ডক্টর বাণীকান্ত কাকতি লিখেছেন : "তিনি আর আদ্যাশক্তি মাতৃস্বরূপিণী হয়ে রইলেন না। যে মাতৃদেবীকে পূজা করার জন্য নরকাসুরকে কৃষ্ণ নির্দেশ দিয়েছিলেন, তিনি সামান্যা রতিসুখ-অভিলাষিণী রমণীর মতো সঙ্গোপনে পতির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য মিলনে লিপ্ত হয়ে রইলেন। বিষ্ণুর সঙ্গে সম্পর্ক ইতিপূর্বেই তিনি ছিন্ন করেছেন, এখন পার্বতীর রূপ ধরে শিবের প্রণয়-লালসায় তিনি গোপনে নীলাচলে বাস করতে লাগলেন।" এই ভাবেই 'কাম' অর্থাৎ আসঙ্গ লিপ্সার ধারণাটা প্রবর্তিত হল। কালিকাপুরাণ ও যোগিনীতন্ত্রে যখন এইসব কাহিনীর অবতারণা হয়েছিল, হয়তো সেই সময়েই দেশের প্রাগ্‌জ্যোতিষ নাম ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হচ্ছিল কামরূপে। এই সব কাহিনী বলে যে সতীর দেহত্যাগের পর শিব গভীর ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন ; দেবতারা তখন তাঁর ধ্যানভঙ্গ করার উদ্দেশ্যে প্রেমের দেবতা কামদেব ও তার স্ত্রী রতিকে পাঠিয়ে দিলেন। তাদের দ্বারা ত্যক্ত বিরক্ত হয়ে কুপিত শিব তাঁর তৃতীয় নেত্রের অগ্নিবর্ষণে কামদেবকে ভস্মসাৎ করে ফেললেন। শেষে রতির প্রার্থনায় গলে গিয়ে শিব কামদেবকে তার পূর্ব রূপ ফিরিয়ে দিলেন। এই ঘটনা থেকেই দেশের

নাম কামরূপ হয়েছে বলে আমাদের বিশ্বাস। 'কাম'-সম্পর্কিত ধারণার আর একটি উদাহরণ কালিকাপুরাণে পাওয়া যায়: শিবের নিবাসক্ষেত্রের মধ্যস্থলে অবস্থিত নীলাচল পর্বতে, দেবী পার্বতীর রূপ ধারণ করে গোপনে শিব-সন্নিধানে গিয়ে, তাঁর কামলিপ্সা চরিতার্থ করতেন। সেইজন্য তাঁর নাম হয় কামাখ্যা। তিনি এখনো বিশেষ প্রভাবশালিনী দেবী, দূরদূরান্ত থেকে হাজার হাজার ভক্ত নরনারী আজো তাঁর আকর্ষণে কামাখ্যাতীর্থে এসে উপস্থিত হয়।

আরো যে কয়টি রূপে মাতৃদেবীকে পূজা করা হয় তার মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য হল ত্রিপুরা, উগ্রতারা ও তাম্রেশ্বরী। গৌহাটি শহরের অভ্যন্তরে উগ্রতারার প্রতি উৎসর্গিত একটি মন্দির আছে। বিষ্ণু যখন সুদর্শন চক্র দিয়ে সতীদেহ খণ্ড খণ্ড করেছিলেন, একটি খণ্ড এখানে পড়েছিল, বলা হয়। স্থানীয় লোকেদের উপর এই তীর্থের প্রভাব খুবই গভীর। ত্রিপুরা হলেন বহুরূপে পূজিত এক অক্ষত-যোনি কুমারী দেবী—ভৈরবীরূপে তিনি বিশেষ 'প্রভাবশালিনী' বলা হয়। এই ভৈরবীর নামে উৎসর্গিত একটি মন্দির আছে তেজপুরে। এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য, কিছু কিছু লোক এখনো নাবালিকা কন্যাকে নানা উপাচারে কামাখ্যায় 'কুমারী-পূজা' করে থাকে। তাম্রেশ্বরী হলেন ভীমা-ভয়ংকরা। যে তাম্রমন্দিরে তাম্রেশ্বরী অধিষ্ঠিত সেটি শদিয়া শহরে অবস্থিত। তারই ধারে কাছে বসবাস করে মিরি, মিশিমি, খামতি, চুটীয়া ইত্যাদি কিরাত গোষ্ঠীর জনজাতি। মন্দিরের ছাদটি তামার পাতে তৈরি। প্রতিবেশী পার্বত্য অঞ্চলের জনজাতিরা দেবীপূজা উপলক্ষে নরবলিও দিত বলে জানা যায়। সেইজন্য দেবী 'কেঁচাইখাতী' অর্থাৎ 'কাঁচাখাগী' নামে খ্যাত। মন্দিরের পুরোহিতেরা নিজেদের বলত দেউরী—তারা ছিল চুটীয়া গোষ্ঠির লোক। অষ্টাদশ শতকে আহোম রাজা গৌরীনাথ সিংহ নরবলি প্রথা রহিত করেন।

লোক-প্রচলিত বিশ্বাসে আরো দু-জন দেবী শিব ও কামাখ্যার নামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তাদের একজন হলেন সর্পদেবী মনসা। ভারতের অনেক স্থানে তার পূজা হয়—হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে। খৃস্টীয় একাদশ শতকের কাছাকাছি কোন একটা সময়ে আর্য ও আর্যেতর আচারের সংশ্লেষের ফলে মনসা পূজার উদ্ভব। ডক্টর মহেশ্বর নেওগ-এর মতে ওইরকম সময়েই বঙ্গদেশে ও আসামে মনসার মূর্তি-গড়া শুরু হয়। হস্তীপৃষ্ঠে মনসা মূর্তি (ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের নগেন্দ্র বাহিনী), গোয়ালপাড়া জেলার শ্রীসূর্য পাহাড়-স্থিত সপ্তকণাযুক্ত ভুজঙ্গ-শীর্ষে দ্বাদশভূজা দেবীর মূর্তি এবং গৌহাটিতে আবিষ্কৃত ক্ষুদ্রাকার মনসামূর্তি—এই সবগুলিরই সময়কাল

দশম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি। প্রাচীন সাহিত্যে মনসার উল্লেখ দেখা যায় পদ্মাবতী, ব্রহ্মাণী, শিবকন্যা ও ত্রিনেত্রা নামে। পশ্চিম আসামে যে মনসাপূজা হয় সেখানে ঐতিহ্যবাহী কীর্তনীয়ারা ষোড়শ শতকে রচিত মনসাপদ গেয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, খাসিয়ারা এক কালে উথ্‌লেন নামে তাদের সর্প-দেবতার পূজা করত নরবলি দিয়ে। মনসার সঙ্গে তুলনীয় হল শীতলা দেবী— বসন্ত রোগের এই দেবীকে সচরাচর 'আই' অর্থাৎ মা বলে উল্লেখ করা হয়। বসন্ত রোগ একটা মারাত্মক মহামারী। অধ্যাপক লীলা গগৈ বলেন, এই রোগ দুরারোগ্য বলে প্রাচীন কালের সরল মানুষেরা ভাবত এই রোগের অন্তরালে নিশ্চয় কোনো দৈবী শক্তির ক্রিয়া আছে। আসামের স্ত্রীলোকেরা 'আই'-কে তুষ্ট করার জন্য বিশেষ আচার অনুষ্ঠান করে এবং তার স্তুতি করে গান গেয়ে। এই সমস্ত অনুষ্ঠানের পরিকল্পনাটাই সুন্দরভাবে গীতিধর্মী। স্তুতিবাদের মুখ্য উদ্দেশ্যই হল, অমোঘ দৈবীশক্তির সামনে দাঁড়িয়ে দীন অসহায় মানুষের অত্যন্ত স্বাভাবিক বিনয়নম্রতা। শীতলা দেবীকে বলা হয় তিনিই মহামায়া বা দুর্গার অন্য এক রূপ। স্তুতি গানে বলা হয়ে থাকে যে 'আই' কামাখ্যা থেকে উড়িয়ে এসেছেন প্রথমে দেওঘর, তারপর পিচলা নদীর তীরবর্তী ফুলবাড়িতে (উত্তর লক্ষ্মীমপুর) এবং সর্বশেষে আবির্ভূত হয়েছেন শদিয়ায়। ভক্তের প্রতি 'আই' পরম দয়ালু। তাঁর সাত বোনকে সঙ্গে নিয়ে যখন 'আই' এসে দেখা দেন, তখন সকলেই তাঁর আশীর্বাদ ভিক্ষা করে মাথা নিচু করে। 'আই' যদি আশীর্বাদ করেন, বসন্ত রোগে আক্রান্ত সকলের দেহ মন তবে জুড়িয়ে যায়। আসামের মুসলমানেরাও বিশ্বাস করে এই রোগের পিছনে কোন দৈবী শক্তি কাজ করে।

নারী-রূপে আসামের ঘর-গৃহস্থালিতে আরো কতিপয় দেবী আছেন। তাঁদের মধ্যে সব চেয়ে সুপরিচিত হলেন লক্ষ্মী। প্রায় প্রত্যেক ঘরে স্ত্রীলোকেরা লক্ষ্মীপূজা করে থাকে। গ্রামগুলিতে তিনি শস্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লখিমী। গ্রামের অনেক মেয়ের নাম রাখা হয় লখিমী। অধ্যাপক লীলা গগৈ বলেন, লখিমী ধারণাটি এসেছে আর্য হিন্দু ও অনার্য আহোম ভাবধারার সংমিশ্রণের ফলে। কখনো বলা হয় তিনি সাগর থেকে উত্থিত হয়ে এসেছেন। আবার কখনো বলা হয় যে তিনি ছিলেন পর্বতে, মানুষের পূজা-প্রার্থনায় সাড়া দেবার জন্য নেমে এসেছেন সমতলে। সুতরাং লখিমী যুগপৎ সমুদ্রমন্থনের সৃষ্টিলক্ষ্মী এবং পাহাড়-পর্বতের এমন এক বনদেবী যিনি কীটপতঙ্গের আক্রমণ থেকে ধানক্ষেত রক্ষা করেন। শালিধান রোপণ করার আগে বৈশাখ মাসে 'লখিমী-সবাহ' (লক্ষ্মী সভা। সমবেত প্রার্থনা অর্থে সবাহ) পাতা হয়।

ঘরে তোলার জন্য প্রথম যখন আনুষ্ঠানিক ভাবে ধান কাটা হয় কিংবা যদি ধানের ক্ষেতে পোকামাকড়ের উপদ্রব হয়, লখিমী সবাহ্ ডাকা যেতে পারে। আরেক ধরনের পূজা-পদ্ধতি হল 'অপেসরা সবাহ্' (অপ্সরা সভা)। জ্বর জ্বালা ও নানাবিধ স্ত্রীরোগ থেকে নিরাময় কামনায় কিংবা কুমারী কন্যার যথাসময়ে পুষ্পিতা হবার আশায়, স্ত্রীলোকরা এই 'সবাহ্'-তে জমায়েত হয়। আসামের দক্ষিণ অঞ্চলে অপেসরা অথবা অপ্সরাকে দুর্গা থেকে অভিন্ন বলে মনে করা হয়। এই 'সবাহ্' বা সমবেত পূজার সঙ্গে একটি অন্ধ বিশ্বাস একত্র যুক্ত : অপ্সরারা নাকি আকাশে ঘুরে বেড়ান। নিচের পৃথিবীতে তাঁদের ছায়া পড়ে। অনবধানে অজান্তে জনমানুষ যদি সেই ছায়াতে পা দেয় অপ্সরারা রেগে যান। অপ্সরারা সাত বোন, রম্ভা তাঁদের অন্যতমা। ছেলেমেয়ে যদি ক্রমাগত অসুস্থ হতে থাকে, যথাসময়ে কোন কুমারীর যদি রজোদর্শন না হয়, বিশেষ কারণ না থাকা সত্ত্বেও কেউ যদি ক্ষীণ হয়ে শুকিয়ে যেতে থাকে—তখন বুঝতে হবে অপ্সরাদের রাগ হয়েছে। সুতরাং 'সবাহ্' ডেকে পূজা প্রার্থনা করে তাদের ক্রোধ ও বিরক্তির উপশম ঘটাতে হবে।

সারা আসামে শিব, দুর্গা ও বিষ্ণুর নামে কত যে মন্দির ও 'থান' (স্থান—মন্দির বিহীন পূজা-প্রার্থনার জায়গা) আছে যে তার হিসাব দেওয়া শক্ত। এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে এদেশে শিব-মন্দিরের সংখ্যা সব চেয়ে বেশি। বেশির ভাগই জরাজীর্ণ ও ভগ্নপ্রায়। এমন অনেক স্থান আছে যেখানে কোন কোন অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন পুরুষ বা নারীর উপর দেবত্ব আরোপ করে ভক্তেরা তাঁদের নামে মন্দির গড়ে দিয়েছে অথবা 'থান' নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। গোহাটির নিকটস্থ বশিষ্ঠাশ্রমের মন্দিরে একটি প্রস্তরখণ্ড ভক্তদের পূজা লাভ করে এই বিশ্বাসে যে এককালে তা ছিল বশিষ্ঠমুনির পাদপীঠ। মন্দিরের অনতিদূরে একটি বৃহৎ আকার প্রস্তর দেখিয়ে বলা হয় বশিষ্ঠমুনির স্ত্রী অরুন্ধতী সেখানে শিলীভূত হয়ে রয়েছেন। ডিব্রুগড় শহরের নিকটবর্তী 'আইথান' অথবা মাতৃস্থান প্রায় দু'শো বছর আগেকার একজন যুবতী স্ত্রীর স্মৃতির সঙ্গে জড়িত বলা হয়। দু'শো বছর আগে ওই জায়গা থেকেই কৃষ্ণা দেবী বা 'কলী আই' (কালো মা) রহস্যজনক ভাবে অন্তর্হিত হন। কাহিনী বলে, কৃষ্ণা ছিলেন একজন ধর্মগুরুর কন্যা। বিবাহ যখন আসন্ন কৃষ্ণা শুনতে পেলেন যে তাঁর ভাবী স্বামী তাঁর গায়ের কালো রঙ নিয়ে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছেন, ঠাট্টা করে নাকি বলেছেন 'কালী আই'। এই অপমান সহ্য করতে না পেরে এখন যেখানে আইথান অবস্থিত—সেখান থেকে কৃষ্ণা অন্তর্হিত হয়ে যান।

উপরোক্ত সকল দেবী, বিশেষত যাঁরা শাস্ত্রমতে পূজনীয় নন, কেবল লোকরীতি

অনুসারে পূজনীয়, তাদের উপর মাতৃদেবীর মাহাত্ম আরোপ করা যায় না। কিন্তু নূতন নূতন দেবী উদ্ভাবনের প্রেরণা জুগিয়ে থাকবেন সম্ভবত মাতৃদেবী। তা না হলে এঁদেরও 'আই' অর্থাৎ 'মা' বলা হত না। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা বোধ করি অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, দেবী ভাগবতে সকল গ্রাম্য দেবীকে অন্তত আংশিক ভাবে মাতৃদেবীর প্রকাশ বলে স্বীকার করার জন্য আহ্বান করা হয়েছে।

বাড়িতে তৈরি ধেনো মদ, হাঁড়িয়া বা পচুই আসামের প্রায় সকল জনজাতী মানুষের আহার্যের অপরিহার্য অঙ্গ। এই মদ তারা তাদের দেব-দেবীর কাছেও নিবেদন করে। তাদের বেশির ভাগ লোক গরুর দুধ খায় না, যদিও কেউ কেউ গোমাংস খায়। ভাত হচ্ছে সমগ্র পূর্বাঞ্চলের প্রধান খাদ্য, কৃষক সাধারণের কৃষিকাজ হল ধান চাষ—যদিচ অরুণাচলের কোন কোন জায়গায় ধান চাষ যথেষ্ট হয় না বলে অন্যান্য খাদ্যশস্য চাষ করতে হয়। প্রত্যেক জনজাতি নিজেদের ধেনো মদের আলাদা আলাদা নাম করেছে—যদিচ এই সব নামের উচ্চারণে একটা মিল দেখা যায়। গারোরা বলে 'মু', দেউরীরা বলে 'সুঝেঁ' বোড়োরা বলে 'জৌ' বা 'জুমাই', মিশমিরা বলে 'য়ু', নাগারা বলে 'জু'। মিরি ও আবররা মদকে বলে 'আপং'। বোড়োদের ধারণা মদ ওষুধের কাজ করে। কারো পেটের অসুখ হলে কিংবা কেউ দুর্বল বোধ করলে, তারা বলে, কয়েক বাটি 'জুমাই' খাইয়ে দিলে সব ঠিক হয়ে যাবে। দেউরীরা বলে শহুরে মানুষ যেমন ঘন ঘন চা খায় তারাও তেমনি ঘন ঘন সুঝেঁ পান করে থাকে। মিরিরা অতিথিকে সর্বপ্রথম নিবেদন করে এক বাটি আপং।

কোন কোন জনজাতির বিশ্বাস মদের উৎপত্তি দৈবাদিষ্ট। বোড়োরা বলে মানুষের প্রাণরক্ষার উপায় হিসাবে কী করে ধান থেকে মদ তৈরী করতে হয়—সেই কৌশল স্বয়ং মহাদেব সর্বপ্রথমে তাদের শিখিয়েছিলেন। সুতরাং জুমাই-এর প্রথম বাটিটা শিব যদি তাঁকেই নিবেদন করার নির্দেশ দিয়ে থাকেন তাতে আর কি! কেবল এক বাটি কেন, বোড়োরা তাদের বিভিন্ন পূজায় এক হাঁড়ি জুমাই শিবের নামে উৎসর্গ করে। আবর অথবা আদি-রা শীতকালে যখন তাদের আরণ পূজা করে, বাড়ির বারান্দায় আপং ও মাংস রেখে দেয় যাতে পরিবারে পরলোক গতেরা মদ-মাংসের ভাগ পায়। শ্বশুরবাড়ি যেতে হলে মদ-মাংস না নিয়ে গেলে চলে না। পরিবারের কারো মৃত্যু ঘটলে কবর দেবার পর প্রথম পক্ষ কাল তারা সেই কবরের পাশে মদ ও মাংস রেখে আসে। দেউরীরাও তাদের ঘর গেরস্থালির পূজাপাটে সুঝেঁ ব্যবহার করে থাকে। তাদের জল-দেবতা জলশা ডাঙরীয়া যদি-

বিরূপ হন, তাঁকে শান্ত করার জন্য নদী তীরে একটি সাড়ম্বর অনুষ্ঠান করতে হয়। পূজা যখন চলতে থাকে পূজারীরা সুঝৈ ছাড়া আর কিছু মুখে তুলতে পারে না। হিন্দু হওয়া সত্ত্বেও মিরি, কাছাড়ি আর আহোমরা তাদের নানা উৎসবে প্রচুর মদ ব্যবহার করে থাকে। রাভাদের খকসি পূজা এমন এক উৎসব যখন তরুণ-তরুণীরা দিনের পর দিন মদ খায়, নৃত্য করে ও জীবন সঙ্গী বেছে নেয়। রাভারাও মৃত আত্মীয়ের সমাধিতে মদ উৎসর্গ করে। রাভাদের মতোই গারো তরুণ-তরুণীরা তাদের চাষবাস-সম্পর্কিত উৎসবে সারা রাত ধরে মদ খায় ও নৃত্যগীত করে।

নেফা অঞ্চলের অকা ও মিশমিদের কাছে মদ খাদ্যবিশেষ। অকা-রা মদ তৈরী করে গম থেকে। তারা তামাকপাতার ধূমপান করে, বুনো গাঁজা খায় আর একটু একটু আফিমও খায়। মিশমিরা পোস্ত খেতো করে আফিম তৈরি করার জন্য, কিন্তু নিজেরা খায় না, অন্যদের কাছে বিক্রি করে। আফিম বা চণ্ডু খাওয়ার বদ অভ্যাসটা ইংরেজ শাসকদের আমদানী করা। আফিম মানুষের অপকার করে বলে সাধারণের চোখে আফিম অত্যন্ত হেয় বস্তু। একটি বিহু গানে যুবতী কন্যাকে সাবধান করে বলা হয়েছে—সে যেন 'কানিখোর' অর্থাৎ 'আফিমখোর-এর ঘর না করে, তা হলে 'কানিখোর' যেমন আফিমের বান্দা তাকেও তেমনি 'কানিখোর'-এর বাঁদী হয়ে জীবন কাটাতে হবে। পুরুষ-নারী-নির্বিশেষে মিশমিদের মুখে তামাকের পাইপ সব সময় লেগেই থাকে। তারা যেখানে যায় তাদের বাঁদরের চামড়ার ছোট থলিতে থাকে খানিকটা তামাক পাতা, চকমকি পাথর, একখণ্ড ইস্পাত ও খানিকটা তুলো। বলা হয় তারা পাইপ টেনে তামাক খাওয়ার অভ্যাসটা রপ্ত করেছে চীনাদের কাছ থেকে।

ধর্মীয় অনুষ্ঠানে মদের সংযোগ নিতান্তই আদিম প্রথা বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। উন্নত জাতির লোকেও যে ধর্মীয় ব্যাপারে মদের উপযোগ করত তার সপক্ষে যুক্তি দেওয়া আছে ধর্মগ্রন্থে। যোগিনীতন্ত্রের নির্দেশ :

ন লঙ্ঘয়েৎ পানধর্মং দেশধর্মং ন লঙ্ঘয়েৎ
যস্মিন্ পীঠে য আচারঃ স আচারো বিধিস্মৃতঃ ॥

[কোন পীঠস্থানে প্রচলিত যে-কোন আচার বিধিসম্মত বলে ধরে নেওয়া উচিত। পানধর্ম ও দেশধর্ম অর্থাৎ ধর্মীয় ব্যাপারে মদ্যপান যদি দেশের প্রথাসম্মত হয়, তা লঙ্ঘন করা অনুচিত।]

উপরন্তু বলা হয়েছে যে কামেশ্বরীর পূজায় রক্ত, মাংস ও মদ উৎসর্গ না করলেই নয়—

রুধিরমাংসমদ্যৈশ্চ পূজ্যাং পরমেশ্বরীম্ ॥

এতদুপরি বলা হয়েছে কামাখ্যাদেবীর পূজা করতে গিয়ে মদ্যপান সম্পর্কিত স্থানীয় রীতিনীতির অন্যথা করতে যাওয়া ঠিক নয়। মদের সঙ্গে সঙ্গে পশু বলি যে দিতেই হবে—তারও বিধান দেওয়া আছে। কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণ আহোমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অভিযানের প্রারম্ভে শিবের বিগ্রহের সামনে নানা উপাচার উৎসর্গ করতেন। তার মধ্যে মদ ছিল অন্যতম। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে মহাভারতে বলা হয়েছে মদ-মাংস ছিল দুর্গার বিশেষ প্রিয়।

তিন

ধর্ম ও যাদু

বর্তমান লেখক যখন স্কুলের ছাত্র, পরিবারের কারো অসুখবিসুখ হলে জলপড়া অর্থাৎ মন্ত্রপূত জল খাইয়ে দিতেন। একটা ঘটির ওপর এক বাটি জল রেখে নূতন-কাটা তিনটি খড়ের কাঠি তার মধ্যে ডুবিয়ে, ঘড়ির কাঁটার মতো ডান দিক ধরে সেই তিনটি কাঠি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে, তিনি একটি ছাপা পুঁথি থেকে বার বার তিনবার কয়েকটি অসমীয়া মন্ত্র পড়ে যেতেন। এই প্রক্রিয়ায় তিনি যে একাধিক ব্যক্তিকে নীরোগ করতে পেরেছিলেন—এ নিয়ে তাঁর নিজের মনে কোন সন্দেহ নেই। এই সব পুঁথিকে বলা হত 'করতি পুঁথি', কর বা হাতের যোগে মন্ত্রফল গিয়ে প্রবেশ করে জলে। মন্ত্রগুলি সচরাচর শিব ও পার্বতীর মতো দেব-দেবী সম্পর্কিত লোক-কাহিনী।

লেখকের প্রতিবেশী একটি ছেলেকে ভূতে পাওয়ার চাঞ্চল্যকর একটা ঘটনা এখনো তাঁর স্পষ্ট মনে পড়ে। ভূতটা ছিল জলে থাকা এক যখ। সেই ছেলেটি বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ বার বার মূর্ছা যায়, মুখ থেকে তার অর্থহীন প্রলাপ বাক্য বেরোতে থাকে। দিনে একাধিক বার এইরকম ঘটে এবং ঘটনাটা চলে আসছিল বেশ কয়েকদিন ধরে। অভিজ্ঞ ডাক্তার একজন এসে ইনজেক্শন দিলেন, রোগীর শয্যা পার্শ্বে বসে অনেকক্ষণ লক্ষ্য করলেন, কিন্তু অসুখটা ঠিক যে কী ঠাহর করতে পারলেন না। ডাক্তার তাঁর নিজের পদ্ধতিতে চিকিৎসা করে চললেন। ইতিমধ্যে পরিবারের লোকেরা আগুন জ্বালিয়ে তার মধ্যে মুঠো মুঠো সরষের দানা ছিটিয়ে দিতে লাগল, বাড়ির সব কয়টি দরজা জানলায় মাছ ধরবার ছেঁড়া জাল টাঙিয়ে দিল। খুব সম্ভব যখটা ওদের রকমসকম দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। সে পোড়া সরষের গন্ধ সহ্য করতে পারে না, এদিকে আবার দরজা জানলা সব বন্ধ। একদিন ছেলের গা থেকে ভর তুলে নিয়ে পড়ি-কি-মরি করে যখটা চম্পট দিল।

এইরকম ঘটনা আসামের গ্রামাঞ্চলে নিত্য ঘটে থাকে। সহজ সরল গাঁয়ের চাষাভুষো নানারকম প্রাকৃতিক ঘটনার সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িত থাকে বলে,

অসাধারণ কিছু ঘটলেই অপ্রাকৃত ব্যাখ্যা ও অন্ধসংস্কার দিয়ে নিজেদের না-চেনা না-জানার ফাঁকটুকু ভরে দিতে চায়।

আসাম সম্বন্ধে অনসমীয়াদের যে ধারণা, হেম বরুয়া-র মতে তা মোটামুটি এই রকম : "আসামের সীমার বাইরে অধিকাংশ লোকের ধারণা এদেশ যাদুবিদ্যা, তন্ত্রমন্ত্র ও বন্যজাতিদের দেশ।" অসমীয়ারা প্রায়ই শুনতে পায় এদেশে যে আসে তাকেই নাকি ভেড়া বানিয়ে দেওয়া হয়—অনসমীয়াদের মধ্যে এইরকম একটা বিশ্বাস প্রচলিত আছে। তেমন কিছু না হলেও, এদেশ যাদু ও মন্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত নানা ঘটনার সঙ্গে জড়িত বলে একটা খ্যাতি আছে। নওগাঁ জেলার গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত মায়ঙ সম্বন্ধে লোকে সভয়ে উল্লেখ করত, বলত, সেখানকার বেজ-রা ইন্দ্রজাল বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী। আজকের দিনেও মায়ঙ-এর ছেলেমেয়েরা সেকালের সব আশ্চর্য ঘটনার কাহিনী শুনতে পায়। তখনকার দিনে বেজ-রা নাকি এমন সব মন্ত্র জানত যার ফলে পিঁড়িতে বসা মানুষ পিঁড়ির সঙ্গে আটকে থাকত, মাছের ঝোলের বাটিতে ভাজা মাছ সাঁতার কাটত, ইত্যাদি। কিন্তু অসমীয়া ভাষায় বেজ অর্থে বৈদ্য-ও বোঝায়। সুতরাং মায়ঙ-এর বেজকে কোন উপায়ে প্রাচীন কালের প্রকৃত যাদুকরদের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে দেখানোর চেষ্টা হত। যে দেশে তান্ত্রিক ক্রিয়া-কলাপ চলত, যেখানে বিভিন্ন জনজাতি আপন আপন আদিম সংস্কার অনুসারে জীবন যাপন করত, সেদেশ সম্বন্ধে বাইরের লোকের এইরকম অদ্ভুত ধারণা থাকাটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। ভারতে সুসভ্য ও মার্জিত জীবনের যে সব কেন্দ্র ছিল, সেইসব স্থান থেকে আসামের দূরত্ব ও দুর্গমতা এ দেশকে রহস্যময় করে তুলেছিল। এই রহস্যময় দেশে যারা আসত, অনেক সময় তাদের কেউ কেউ বিরুদ্ধভাবাপন্ন হয়ে বিরূপ সমালোচনা করত ও নানারূপ কাল্পনিক বর্ণনা দিয়ে আসাম সম্পর্কে তাদের নিজ নিজ দেশের লোকদের মন বিভ্রান্ত করত। কথিত আছে, গুরু নানক যখন আসাম পরিভ্রমণে এসেছিলেন, তখন যেসব শিষ্য তাঁর সঙ্গে এসেছিল তাদের অন্যতম ছিল মর্দানা। কিংবদন্তী বলে, স্থানীয় কোনো স্ত্রীলোক মন্ত্র পড়ে মর্দানাকে ভেড়া বানিয়েছিল। অপর একটি কাহিনীতে বলা হয়েছে যে, শঙ্করাচার্য যখন কামরূপ আসেন, তখন তিনি শাক্ত মতাবলম্বী অভিনব গুপ্তের সঙ্গে এক দার্শনিক তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হন। এই তর্কযুদ্ধে পরাস্ত হয়ে প্রতিশোধ-পরায়ণ শাক্ত পণ্ডিত না কি মন্ত্রপ্রয়োগে শঙ্করাচার্যের শরীরে রোগ উৎপন্ন করেন এবং সেই রোগেই শঙ্করাচার্যের অকাল মৃত্যু হয়। আহোমদের সংকলিত 'পাৎশাহ বুরঞ্জী-তে বলা হয়েছে অসমীয়া স্ত্রীলোকেরা কুমন্ত্র প্রয়োগে পটিয়সী বলে একটি বিশ্বাস বহুপ্রচলিত।

আলমগিরনামাতে বলা হয়েছে খৃস্টীয় 1337 অব্দে মহম্মদ শাহ এক লাখ অশ্বারোহী সৈন্য পাঠিয়েছিলেন আসাম আক্রমণের উদ্দেশ্যে, 'কিন্তু সমগ্র বাহিনী সেই যাদুমন্ত্রের দেশে ধ্বংসপ্রাপ্ত হল, তাদের কোন চিহ্নমাত্র পাওয়া গেল না।' পুনরায় আর একটি সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করা হল, কিন্তু বঙ্গদেশে পৌঁছুবার পর তারা আর অগ্রসর হতে চাইল না। অতঃপর সম্রাট ঔরঙ্গজেব-এর রাজত্বকালে তার অন্যতম সেনাপতি মীরজুমলা আসাম আক্রমণ করেন। দিল্লী বাহিনীর সঙ্গে সাহবুদ্দীন নামে একজন লেখক এসেছিলেন, 1662 অব্দে তিনি আসাম-অভিযানের বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছিলেন : 'আসাম এক বন্য ও ভয়ংকর দেশ…এর চতুর্দিকে বিপদ… এবং যেহেতু এদেশে একবার প্রবেশ করলে কেউ এখান থেকে ফিরে যেতে পারে না, যেহেতু কোনো বহিরাগত ব্যক্তিকে এদেশের স্থানীয় মানুষদের আচারবিচারের কথা জানতে দেওয়া হয় না…সেই কারণে হিন্দুস্থানের লোকেরা ভাবে যে আসাম দেশের লোকেরা যাদুকর ও ইন্দ্রজাল-বিশারদ এবং তাদের মানুষের মধ্যে গণ্য করে না।' পুরাতন নথীপত্র ঘেঁটে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে আসামের সর্বপ্রথম ইতিহাস রচনা করেছেন এডওয়ার্ড গেইট। তিনি লিখেছেন, 'আহোমদের বুরঞ্জী এবং মুসলমানদের প্রত্যক্ষদর্শী বিবরণ এই কথাটাই প্রমাণ করে যে যাদুমন্ত্র প্রয়োগে শত্রু সৈন্যকে বিমোহিত করা হত এবং উৎপীড়নকারী রাজকর্মচারীদের মন্ত্রপ্রয়োগে কিংবা যাদুবিদ্যার সাহায্যে হত্যা করা হত। ষড়যন্ত্র ও গোপন বিধ্বংসী কার্য নিয়ে কোন একটি মামলার বিবরণ দিতে গিয়ে একটি অহোম বুরঞ্জী নিম্নলিখিত সাক্ষ্য উদ্ধৃত করেছে : আমায় বলেছে বগা নামে একজনের কাছে একটি পুরনো পুঁথি আছে। সেখানে এমন সব মন্ত্র আছে যার সাহায্যে রাজা-প্রজা সকলকেই বাগ মানানো যায়।'

বেশ কিছু সংখ্যক মন্ত্র-পুঁথি আমাদের হাতে এসেছে। এইসব পুঁথিতে বেশ স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ আছে কী উপায়ে অতীতে আসামের লোক বিভিন্ন শারীরিক বা মানসিক অসুখ-বিসুখ নিরাময় করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন ওষুধ ব্যবহার করত। মন্ত্র-প্রয়োগের বিদ্যার সূত্রপাত আনুমানিক দশম/একাদশ অব্দে হয়ে থাকবে বলা হয়। ডক্টর বিরিঞ্চিকুমার বরুয়ার মতে মহাযানী বৌদ্ধদের মন্ত্রযান সম্প্রদায় হয়তো এই সম্পর্কে প্রভাব বিস্তার করে থাকবে। এর সঙ্গে যুক্ত ছিল অথর্ববেদ, তন্ত্রবেদসমূহ এবং জনজাতীয় লোকেদের জনবিশ্বাস। একটি মন্ত্রে আসামের বিভিন্ন জাতির উল্লেখ করা হয়েছে : গারো, মিরি, নাগা এবং ব্রাহ্মণ ; কলিতা, কোচ ও বৈশ্য। মনে

রাখা ভালো এই যাদুমন্ত্র প্রয়োগ করার জন্য কোন ব্রাহ্মণ পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না, যে কোন লোক মন্ত্র উচ্চারণ করে তার ফল লাভ করতে পারে।

এখন দেখা যাক এই সব পুঁথিতে কী কী বিষয় আলোচিত হয়েছে। 'কামরত্নতন্ত্র' ও 'বৃহৎ বৈদ্যসার' গ্রন্থদ্বয়ে কী উপায়ে নারী ও পুরুষ পরস্পর পরস্পরকে বশীকরণ করতে পারে—সেই বিষয়ে বিভিন্ন মন্ত্রাদি রয়েছে। যৌন ক্ষমতা টিকিয়ে রাখা বা বৃদ্ধি করা যায় কী উপায়ে, নারীদের কীভাবে লম্বা, কুচকুচে কালো ও সুন্দর চুল হয়, এমন কি গলার স্বর মধুর করা যায় কেমন করে—এই সব বিষয়ে মন্ত্রে অনেক সব শিক্ষণীয় তথ্য দেওয়া হয়েছে। বৈশাখী বিহু উৎসবের প্রথম দিনে বনজ ভেষজের ডালপালা দিয়ে গৃহপালিত গরু মোষের গায়ে বুলিয়ে দেওয়া হয়, যাতে বনের পশুর হাত থেকে তারা রক্ষা পায়। আবার কার্তিক বিহুর সময় পাকা ধানের খেতের মাথার উপর দিয়ে চাষী বাঁশের একটা লগা ঘোরায় এবং সন্ধ্যা হলে একটি মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে মন্ত্র পড়ে। এগুলি হয়তো অথর্ব বেদে বর্ণিত আচার অনুষ্ঠানের প্রত্যক্ষ প্রভাব থেকে উদ্ভূত। সেখানে বলা হয়েছে মেঠো ইঁদুর ও পোকামাকড়ের হাত থেকে শস্য রক্ষা করতে হলে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে পূজা দিতে হয় এবং এক ধরনের গাছের ডালপালা দিয়ে গরু বলদের গা ঝেড়ে দিতে হয়। প্রাচীন ভারতের শস্য ক্ষেত্র সমূহের দেবদেবী ক্ষেত্রপালক ও ক্ষেত্রপালিকা নিশ্চয় অসমীয়া চাষীর খেতর ও খেতরী। নবজাত গোবৎসের রক্ষার্থ খেতর-খেতরীকে পূজা দেওয়া হয়। মন্ত্রের মধ্যে সবচেয়ে সংখ্যায় বেশি হল সাপের মন্ত্র—মনসা বা মারৈ আসামে বহুজন-পূজিত। বহু সরীসৃপ অধ্যুষিত অঞ্চলে সেটা বোধহয় স্বাভাবিক। তা ছাড়া মনসা আবার শিবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। অধীকৃত দেবতা শিব ছাড়াও বহু সংখ্যক হিন্দু দেবদেবী অসমীয়া মন্ত্রপুঁথির পাতায় স্থান পেয়েছেন। তাঁদের মধ্যে আছেন কামাখ্যা, হয়গ্রীব, নরসিংহ, গণেশ, বিষ্ণু ও সূর্য।

শিব যে অনার্যমূলজ-সেকথা ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে। বোড়ো ও লালুং-দের মতো বেশ কিছু মোঙ্গল জনজাতি মহাদেবকে তাদের নিজস্ব পন্থায় পূজা করে। শিবকে অবশ্য পরে হিন্দু দেবদেবীদের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়—তাঁর জনপ্রিয়তাকে হিন্দুধর্ম প্রচারের কাজে লাগাবার জন্য। অসমীয়া মন্ত্রপুঁথিতে শিব আবার যেন লৌকিক দেবতাদের পর্যায়ভুক্ত হয়েছেন—অবশ্য কিছু কিছু আর্য গুণাগুণসহ। মন্ত্রে অন্তর্ভুক্ত দুটি কাহিনীতে তার প্রমাণ মেলে। প্রথম কাহিনীতে বলা হয়েছে যে, একদিন কৈলাসে পার্বতীর রূপ দেখে দিনে দুপুরে শিবের সম্ভোগ লিপ্সা জেগে উঠল। তিনি কামনা চরিতার্থ করতে চাইলেন। কিন্তু পার্বতী তাঁকে প্রত্যাখ্যান

করলেন এই বলে যে দিনে দুপুরে এরকম কর্মে লিপ্ত হওয়া অনুচিত। শিব পশ্চাদপদ হবার পাত্র নন, তিনি তাঁর গোঁ ধরে রইলেন। কুপিতা পার্বতী তখন নানা জাতের সাপ সৃষ্টি করে ছেড়ে দিলেন শিবের চতুর্দিকে। তারা চারদিক থেকে স্তুতি-মিনতি করতে লাগল যাতে শিব শান্ত হন। শিব তখন প্রত্যেক জাতির সাপকে তাদের শক্তি অনুযায়ী বিভিন্ন পরিমাণের বিষ দিয়ে আশীর্বাদ করতে বাধ্য হলেন। দ্বিতীয় কাহিনীতে বলা হয়েছে যে, একদিন ধন্বন্তরি এসে শিবকে জানালেন যে তাঁর পক্ষে মনুষ্যজাতি রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ছে কারণ বেদে উল্লেখ নেই এইরকম হাজার হাজার বিঘ্ন বিপদে মানুষ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে। কে সৃষ্টি করল এই সব আপদ বিপদ ? শিব বলতে পারলেন না। তখন দুজনে চলে গেলেন ব্রহ্মার কাছে, কিন্তু ব্রহ্মাও বললেন, ব্যাপারটা তাঁর জানা নেই। এবার তিনজনে মিলে গেলেন বিষ্ণুর কাছে, কিন্তু দেখা গেল বিষ্ণুও অজ্ঞ। তখন সবাই মিলে রওনা হলেন উত্তর দিকে—সেই যেখানে জলের মধ্যে অনন্ত শয্যায় শায়িত আছেন পূর্ণ ব্রহ্ম। তাঁদের সংকটের কথা শুনে পূর্ণ ব্রহ্ম স্বীকার করলেন, সেই যখন তিনি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরকে সৃষ্টি করেছিলেন, সেই সময়ে চারজন সন্ন্যাসী এসে তাঁর কাছ থেকে হাজার হাজার বিপদ-আপদ ভিক্ষা করে নিয়ে গেছেন। মানুষ এখন সেই সব আপদ-বিপদ থেকে কষ্ট পাচ্ছে। এইসব কাহিনী থেকে সহজেই বুঝতে পারা যায় যে মন্ত্রপুঁথিতে শিব ও অন্যান্য দেবদেবীকে চিত্রিত করা হয়েছে সাধারণ গ্রাম্য মানুষের ধারণা ও রুচি অনুযায়ী।

কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে শিব ও অন্য মুখ্য দেবদেবীকে কেবল এইরকম লৌকিক স্তরেই পূজা করা হয়। বরঞ্চ এর বিপরীতটাই সত্য ; শিবের লিঙ্গ প্রতীককে অসংখ্য ভক্ত আসামের বহু স্থানে ছড়িয়ে থাকা শিবমন্দিরগুলিতে পূজা করে থাকে। আসামের মুখ্য শিবমন্দিরের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল : গৌহাটির বশিষ্ঠাশ্রম ও উমানন্দের দুটি মন্দির, তেজপুর মহকুমার অন্তর্গত মহাভৈরব ও নাগশঙ্কর মন্দির, বিশ্বনাথের শিবলিঙ্গ, শিবসাগরের শিব দেউল ও অন্যান্য দেউল এবং গোলাঘাট মহকুমার অন্তর্গত নেঘেরিটিং ও নুমলীগড়ের মন্দির। এইসব মন্দিরে ও অন্য অনেক শিবমন্দিরে শাস্ত্রসম্মত ভাবে শিব সম্প্রদায়ের ভক্তেরা নিত্য পূজা করে থাকে। শক্তি দেবী বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন মন্দিরে কামাখ্যা, উগ্রতারা, দিক্করবাসিনী, তাম্রেশ্বরী, দুর্গা, কালী আর উমা-পার্বতী রূপে অধিষ্ঠিত আছেন। গৌহাটি, ক্ষেত্রী ও শিলা-ঘাটের মন্দিরে অধিষ্ঠিতা কামাখ্যাই হচ্ছেন সবচেয়ে খ্যাত। শিবসাগরের দেবী দেউল, যোরহাটের বুঢ়ী গোসাঁনী দেবালয়, নগাঁও-হাতীমারার মহিষমর্দিনী

দুর্গামন্দির, বিশ্বনাথের উমাবন, উত্তর গৌহাটির দীর্ঘেশ্বরী দুর্গামন্দির, গোয়ালপাড়া জেলার কৃষ্ণাই-এর নিকটবর্তী টুক্রেশ্বরী দেবালয় এবং বঙ্গাইগাঁও-এর বাগেশ্বরী দেবালয়—এই সব স্থানে দেবীর পূজা হয়। বিষ্ণুও যে অতি পুরাতন কাল থেকে আসামে পূজা পেয়ে আসছেন সেটা তাঁর নামে উৎসর্গীকৃত কয়েকটি মন্দির থেকে বুঝতে পারা যায়। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা ভালো যে, মহাকাব্যখ্যাত নরকাসুরের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন স্বয়ং বিষ্ণু। তিনিই প্রাগ্‌জ্যোতিষের এই রাজাকে দিয়ে কামাখ্যা-দেবীর পূজা প্রবর্ত্তন করিয়েছিলেন। বিষ্ণুর মন্দির আছে উত্তর লক্ষীমপুর, শিবসাগর, নগাঁওঁ, উত্তর গৌহাটি ও হাজো-তে। অবশ্য ষোড়শ শতকে শ্রীশঙ্করদেব প্রচারিত নব-বৈষ্ণববাদই আসামে সব চেয়ে বিস্তৃতভাবে অনুসৃত বিষ্ণুবিষয়ক ধর্মমত। আসামের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে বৈষ্ণব সত্র—যেখানে বাস করেন গুরু বা সত্রাধিকারী। প্রত্যেকটি গ্রামে ও নগরে আছে 'নামঘর' যেখানে বৈষ্ণবেরা সমবেত হয়ে বিষ্ণুর অবতার কৃষ্ণের নাম কীর্তন করে। ভাগবত পুরাণের কৃষ্ণই এই সব ভক্তদের মুখ্য প্রেরণা। এই দেবতার কোনো বিগ্রহ নেই, সাধারণত একখানি ধর্মগ্রন্থকে কৃষ্ণের প্রতীকরূপে গ্রহণ করা হয়।

আসামে হিন্দুদের পূজ্য প্রধান প্রধান দেব-দেবীর রূপ ও রূপান্তর সম্পর্কে সংক্ষেপে এই হল মোটামুটি বিবরণ। লৌকিক ধারণার পরিবর্তন হচ্ছে যেমনটা দেখা গেছে দেবী-সম্পর্কিত ধারণার ক্ষেত্রে, এবং হিন্দুধর্মের দ্বারা প্রভাবিত জনজাতীরা নিজ বিশ্বাস বা সংস্কারের মিশেল দিতে গিয়ে সংমিশ্রণকে জটিলতর করে তুলছে। জন-জাতীয় জীবনের যেসব অন্ধ বিশ্বাস বা কুসংস্কারের আর অস্তিত্ব নেই, সেইসব বাতিল বহু ধারণা হিন্দু দেবদেবী সম্পর্কিত সুস্পষ্ট ভাব বা পরিকল্পনার সঙ্গে বেমালুম মিলে এক হয়ে গেছে। অপর পক্ষে যে-সব দেবদেবীর কেবল স্থানীয় গুরুত্ব ছিল, এখন নব নব আবিষ্কারের ফলে তাঁদের মাহাত্ম্য অঞ্চলের বাইরেও ছড়িয়ে যাচ্ছে। উপরে যে-সব মন্ত্রপুঁথির উল্লেখ করা হয়েছে তাতে শিবের যেসব আখ্যান আছে তা থেকে প্রকৃত শিবকে চিনে নেওয়া শক্ত। তিনি কি জনজাতীয় বিশ্বাসের শিব না কি হিন্দুদের দ্বারা জনজাতীয় শিবের আর্যীকৃত সংস্করণ? বিষ্ণুমন্ত্রগুলিতে সচরাচর সুদর্শন চক্রের বিনাশ শক্তিরই গুণগান করা হয়েছে বেশি ; এই অস্ত্র নিক্ষেপ করে বিষ্ণু ভূতপিশাচ ধ্বংস করেন, এমন কি গৌরী ও শঙ্করও সুদর্শন চক্রকে সমীহ করেন, শ্রদ্ধা করেন। অপর একটি মন্ত্রে সপ্তকাণ্ড রামায়ণের সমগ্র আখ্যানটুকু মাত্র ষোলোটি ছত্রে সংহত করা হয়েছে মন্ত্রের মহিমা বৃদ্ধি করার জন্য। গোয়ালপাড়া জেলার অনেক জায়গায়

রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের পূজা হয়। এই সব দৃষ্টান্ত থেকে প্রতীয়মান হয় হিন্দু দেবদেবীরা সর্বসাধারণের মনের গভীরে নিজেদের স্থান করে নিয়েছেন।

পূর্ব পরিচ্ছেদে বসন্তের দেবী 'আই' ও অন্তরীক্ষের দেবী 'অপেসরা'-র কথা বলা হয়েছে। কেবল স্থানীয় মাহাত্ম্যের সুবাদে অন্য অনেক দেব দেবী পূজিত হন। গোয়ালপাড়া জেলার অনেক জায়গায় শিব ও পার্বতীকে পাগলা বাবা, বুড়ো-বুড়ী, শিব-ঠাকুরাণী রূপে পূজা করা হয়। শিলচর শহরের কাছে কাঁচাখান্তী দেবীর একটি তান্ত্রিক পীঠ আছে, বলা হয়, এই পীঠ স্থাপন করেছিলেন কাছাড়ী রাজারা। কাঁচাখান্তীকে সহজেই শদিয়ার তাম্রেশ্বরী মন্দিরে পূজিত 'কেঁচাইখাতী'-র সঙ্গে তুলনা করা যায়। কেঁচাইখাতী আরো দুটি জায়গায় পূজা পান—শদিয়া অঞ্চলের আর একটি গ্রামে এবং উত্তর লক্ষ্মীমপুরের একটি গ্রামে যেখানে দেবীর একটি মূর্তি মাটি খুঁড়ে পাওয়া গিয়েছিল। গোয়ালপাড়ায় যেমন, তেমনি শদিয়ার একটি গ্রাম্য মন্দিরে 'বুঢ়াবুঢ়ী'-কে দেউরীরা পূজা করে। তাদেরও এক দেবতা আছেন যার নাম 'বলিয়া' বাবা অর্থাৎ 'পাগলা' বাবা। মালিনীথান-এ একটি বৃহদাকার শিবলিঙ্গ আছে আর আছে মস্তকবিহীন এক নারীমূর্তি—সম্ভবত পার্বতীর। কিন্তু স্থানীয় লোকেদের বিশ্বাস নারীমূর্তিটি মালিনীর, শিবের প্রতি তার গভীর আসক্তি থাকায় ঈর্ষাবশত পার্বতী নাকি তার শিরচ্ছেদ করেন। বোড়ো কাছাড়ীদের বাথৌ বা শিব এবং বুঢ়াবুঢ়ীর কথা তো ইতিপূর্বে বলা হয়ে গেছে। এক শ্রেণীর কাছাড়ীরা গজাই ডাঙরীয়ার পূজা করে—তিনি হলেন জ্ঞানের দেবতা।

অধ্যাপক লীলা গগৈ (তিনি স্বয়ং আহোম) বলেছেন: আহোমরা ছিল তাও-ধর্মী। আসামে তারা প্রথম আসে মাত্র সাতশো বছর আগে—ত্রয়োদশ শতকের গোড়ার দিকে। তারা এদেশে এসে স্থানীয় স্ত্রীলোক বিবাহ করে ও সেই সূত্রে স্থানীয় সংস্কৃতি ও আচার আচরণ গ্রহণ করে—কিন্তু তাই দেশ ও তাও ধর্মের ঐতিহ্যটুকু কিছু পরিমাণে নিজেদের মধ্যে টিকিয়ে রেখেছিল। আহোমরা শিবকে যদি বুঢ়া গোসাঁই বা বুঢ়া ডাঙরীয়া রূপে পূজা করতে শুরু করে থাকে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই; শিবকে যে তারা পূর্বাগত কোনো বোড়ো গোষ্ঠীর উত্তরাধিকার রূপে গ্রহণ করে থাকবে—এটা তারই ইঙ্গিত। আহোমরা মনে করে দেবতা হিসাবে তাদের মুখ্য দেবতা লেংদেন ও হিন্দুদের ইন্দ্রের কোন পার্থক্য নেই। পরবর্তীকালে আহোমরা ধীরে ধীরে ধর্মান্তরিত হিন্দু হবার ফলে হয়তো এইরকমটা ঘটে থাকবে। আদি আহোম অভিযাত্রীদের সবচেয়ে প্রিয় দেবতা ছিলেন সোমদেও—তাঁর কোন বিগ্রহ ছিল না, প্রতীক ছিল একটি মহামূল্য মণি। হিন্দুরা যেমন শালগ্রাম শিলা পূজা

করে, আহোমরা তেমনি পূজা করত সেই রত্নমণির। আহোমদের সুবচনী আসলে দুর্গা, এবং দুর্গার সঙ্গে তারা শিবকে সম্পর্কিত করে। সুবচনীর পূজার সর্বপ্রথমে তারা শিবের নামে একটি মোরগ উৎসর্গ করে, তার পরে দেবীর নামে হাঁস মোরগ ও পাঁঠা বলি দেয়। জাতি হিসাবে আহোমরা বিদ্যায় অনুরাগী বলে তাদের পক্ষে সরস্বতীর পূজা করা নিতান্ত স্বাভাবিক। কিন্তু সরস্বতী কিংবা অন্যান্য দেবদেবীদের পূজা তারা করে নিজস্ব পদ্ধতিতে। সচরাচর বিভিন্ন পূজায় তারা উৎসর্গ করে মদ, জীবজন্তু, কলা, পান প্রভৃতি খাদ্যবস্তু এবং ফুল। দেবী সরস্বতী পান অন্য সব উপাচারের সঙ্গে তিনটি অথবা তিনজোড়া মোরগ। অনুরূপ পূজা পেয়ে থাকেন শিব, কেঁচাইখাতী, যখ ও যখিনী, খেতর-খেতরী, লখিমী, পূর্বপুরুষ সকল এবং অন্যান্য বহু দেব দেবী। এখানে তাদের বিস্তারিত তালিকা না দিলেও ক্ষতি নেই।

অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার সহজে ঘোচে না। এমন কি অতি উন্নত সমাজের লোকও এমন কিছু বিশ্বাসের বশবর্তী হয় যেগুলি বহুকাল আগেই মৃত বলে বিবেচিত। আসামে কেবল যে নানা জাতি-উপজাতির ধারা এসে মিলেছে এমন নয়, আদিম বিশ্বাসের ধারার সঙ্গে মিলেছে সুদূর অতীত থেকে বিবর্তিত মার্জিত ধর্মধারণার ধারা। এইরকম একটা দেশে কোথাও কেমন করে যেন যাদু ও ধর্ম মিলে মিশে এক হয়ে গিয়ে থাকবে—সে কথা সহজেই অনুমান করা যায়। মানসিক বিকাশের বিভিন্ন স্তরে আছে বলে সকল সময়ে সকল লোকের পক্ষে সম্ভবপর হয় না মন থেকে সবরকম অন্ধকার ঝেড়ে ফেলা। ফ্রেজর বলেছেন : 'সভ্যতার আদি যুগে একই ব্যক্তি একাধারে পুরোহিত ও যাদুকরের কাজ করতেন ; বরঞ্চ বলা উচিত যে তখনো উভয়ের কাজ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়নি। নিজের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য মানুষ দেবলোক ও প্রেতলোকের আনুকূল্য চেয়েছে তাঁদের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে, তাঁদের উদ্দেশে বলি উৎসর্গ করে। আবার একই সঙ্গে এমন সব পূজা, অর্চনা ও মন্ত্রাদির সাহায্য নিয়েছে, যার ফলে দেব দানবের সহায়তা ব্যতিরেকেই আকাঙ্ক্ষিত ফল লাভ হবে বলে আশা করেছে। দরকার মতো বৃষ্টি আনা যাবে কি? সর্ষের বীজ পুড়িয়ে ভূতপ্রেত তাড়ানো যাবে কি? বন্য গাছগাছড়ার ডালপালা গরু-মোষের গায়ে বুলিয়ে দিলে তাদের বিঘ্ন-বিপদ থেকে রক্ষা করা যাবে কি? সরল গ্রামের মানুষ মনে করে যেন এ সমস্তই সম্ভব।

আসামে গ্রামের মেয়েরা ঠাট্টাতামাশার ছলে ব্যাঙ-এর বিয়ে বলে এক ধরনের অনুকরণ প্রক্রিয়া করে থাকে। চাষবাসের সময়টাতে যদি বহুদিন ধরে একেবারে বৃষ্টি না হয়, দুটি ব্যাঙ ধরে মেয়েরা দস্তুর মতো একটা বিয়ের যাবতীয় আচার

অনুষ্ঠান পালন করে বিয়ে দেয়। কখনো 'দরা' (বর) হিসাবে একটি ব্যাঙ-ই থাকে এবং সেই বরের জন্য একটি কাপড়ের পুতুল সাজিয়ে গুছিয়ে 'কইনা' (কন্যা) রূপে উপস্থিত করা হয়। তাদের নাওয়ানো হয়, যথারীতি 'বিয়ানাম' (বিয়ের গান) গাওয়া হয়, শঙ্খ বাজানো হয় এবং 'নিমন্ত্রিত সকলকে' আপ্যায়িত করা হয়। অনুষ্ঠানের অন্তে একটি ছোট কলাগাছের ভেলাতে তুলে বরকনেকে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। ব্যাঙ-এর সঙ্গে বর্ষণের সম্বন্ধ সে তো আজকের নয়, একেবারে আদি কালের। ফ্রেজর বলেন, ওরিনোকো-র রেড ইণ্ডিয়ানরা কখনো ব্যাঙ মারে না, কারণ তারা মনে করে ব্যাঙ হল বর্ষার দেবতা। ওদিকে য়ুরোপ-এর কিছু কিছু লোক ভাবে যে ব্যাঙ মারলেই বর্ষণ হয়। তামিলনাড়ুর কোন কোন অঞ্চলের স্ত্রীলোকেরা বৃষ্টি পড়লেই একটি ব্যাঙ ধরে এনে তার মাথার উপর জল ঢেলে দেয়—যাতে বর্ষণের মাত্রা বেশি হয়। বর্ষণের সঙ্গে ব্যাঙের এই সম্বন্ধ স্থাপন একটা অন্ধবিশ্বাস। কিন্তু অনুষ্ঠান পালন করার সময়ে জল ঢালা একটা কোন যাদু প্রক্রিয়ার আভাস দেয়। ব্যাঙকে স্নান করানো নিশ্চয় বর্ষণ ঘটাবার একটা প্রতীকী প্রক্রিয়া। রাশিয়ার কোন কোন অঞ্চলে জল আনার উপায় হিসাবে একটা প্রথা পালন করা হত—গির্জাঘরে যথানিয়মিত প্রার্থনা পরিচালনা করার পর যাজক যখন বেদী থেকে নাবতেন, তাঁকে জাপটে ধরে যজমানেরা মেঝের উপর শুইয়ে দিয়ে তাঁর গায়ের উপর জল ছিটিয়ে দিত। ওদের ধারণা ছিল, যাজকের জামাকাপড় ভিজে সপসপে করে দিতে পারলে বৃষ্টি নামতে বাধ্য। অন্যথায়, রুশ স্ত্রীলোকেরা পথচলতি যেকোন পথিককে ধরে এনে হয় নদীর জলে চুবিয়ে দিত নতুবা তার গায়ের উপর জল ঢেলে দিত।

আসামে বৃষ্টি আনার জন্য আরো কিছু রীতি প্রচলিত আছে। যখন খরা চলতে থাকে বহুদিন ধরে, গাঁয়ের মানুষেরা উঠোনের চার দিকে ছোট ছোট বাঁধ বেঁধে দেয় যাতে বৃষ্টির দেবতা লজ্জা পেয়ে কিঞ্চিৎ সদয় হন ও বৃষ্টি দেন। শোনা যায় সিয়াম দেশে এর বিপরীতটা ঘটে থাকে কখনো কখনো। যখন অঝোর ধারে বৃষ্টি পড়তে থাকে, বর্ষণ ক্ষান্ত করার জন্য সিয়াম-এর পুরোহিতরা মন্দিরের চাল খুলে রাখে যাতে বৃষ্টিতে ভিজে জবুথবু হয়ে দেবতারা বুঝতে পারেন মানুষ কী দুরবস্থায় পড়েছে। অসমীয়া চাষী প্রকাণ্ড 'বাঘ ধনুকের' ছিলে টেনে টেনে গুম্ গুম্ শব্দ ছাড়ে খোলা আকাশের তলায় তার ধানক্ষেতে দাঁড়িয়ে, ভাবখানা এই যে গুণ টানার গুম্ গুম্ শব্দে মেঘ গুর্ গুর্ করে উঠবে এবং সেই সঙ্গে বৃষ্টি পড়বে। কথিত আছে যে, রাশিয়ার কোন কোন জায়গায় একটা রীতি প্রচলিত ছিল : তিনজন লোক

উঠত একটা গাছে, একজন কেনেস্তারা পিটিয়ে বোঝাত 'বজ্রধ্বনি' হচ্ছে, দ্বিতীয়জন একটি জ্বলন্ত মশালের গায়ে অপর একটি জ্বলন্ত মশাল ঘষে সৃষ্টি করত 'বিদ্যুৎ' স্ফুলিঙ্গ আর তৃতীয় ব্যাক্তিটি এক পাত্র জলের মধ্যে কয়েক গাছা কাঠি ডুবিয়ে গাছের নীচে দাঁড়িয়ে থাকা লোকেদের গায়ে ছিটিয়ে দিত 'বৃষ্টির' জল। বৃষ্টিবাহী মেঘের রঙ ঘন কৃষ্ণ বলে মনে করা হত কালো রঙ মেঘকে টানে। বৃষ্টি আনবার জন্য আফ্রিকার কোন কোন জনজাতি যেমন কালো রঙের জন্তু বলি দেয়, তেমনি একটানা খরার মরশুমে বৃষ্টিকে ডেকে আনার জন্য গারোরা পাহাড়ের মাথায় একটি কালো ছাগল এনে বলি দিত।

ডক্টর বিরিঞ্চি কুমার বরুয়া তাঁর 'অসমর লোকসংস্কৃতি' গ্রন্থে ধর্ম বিশ্বাস, সামাজিক রীতিনীতি, জীবজন্তু, মঙ্গল-অমঙ্গল, গাছ-পাথর, ক্ষেত প্রভৃতি বিষয়ে আসামের লোকেদের অন্ধবিশ্বাস সমূহ বর্ণনা করেছেন। কালী, দুর্গা, কামাখ্যা— আদি দেবীদের তুষ্ট করার জন্য পাঁঠা বলি দেবার রেওয়াজটা সর্ববিদিত। কামাখ্যার কাছে পায়রা ও মোষও বলি দেবার প্রথা আছে। শিবরাত্রির দিন উমানন্দের শিবমন্দিরে একটি পাঁঠাকে ঘাড় মুচড়ে মারবার একটা অদ্ভুত প্রথা চলে আসছে। ভক্তেরা সেই পাঁঠার মাংস পরস্পরের মধ্যে ভাগ করে খায়। অনার্য-সম্ভূত লোকেরা বলি দেয় মোরগ, হাঁস, শুয়োর ও বুনো মোষ। আহোমরা খেতর, যখ, সুবচনী, কেঁচাইখাতী ও যোগিনীদের তুষ্ট করার জন্য হাঁস-মোরগ তো বলি দেয়ই, উপরন্তু মাছ, ডিম, মদ ও অন্য নানা খাদ্যবস্তু উৎসর্গ করে। বোড়োরাও অসুখ বিসুখ থেকে রক্ষা পাবার জন্য খেতর ও কুবিরদের কাছে আগে মোরগ বলি দেয় এবং পরে বেজদের কাছে যায় ওষুধবিষুধ নেবার জন্য।

গরুকে পবিত্র বলে মনে করা হয়—সম্ভবত কৃষির সঙ্গে গরুর সম্বন্ধ আছে বলে। পঞ্জিকার হিসাবে বছরের শুরুতে প্রতীক রূপে গোজাতির পূজা করা হয়। গো-হত্যা মহাপাপ, সেজন্য শাস্তি দেবার বিধান আছে। বছরের শুরুতে বোড়োরাও তাদের পরিবারবর্গের সর্বপ্রকার উন্নতি কামনায় গরুকে পূজা দেয়। আদিম মানষ সদ্য যখন বনের জীবজন্তু পোষ মানিয়ে গৃহপালিত পশুতে রূপান্তর ঘটিয়ে ছিল, এসব পূজা হয়তো সেইসব অতীত যুগের স্মৃতিবাহী। বলা হয় সেই সুদূর অতীত থেকেই মিশরে ও ভারতে গরু মানুষের পূজা পেয়ে আসছে। গরু যে পবিত্র সেই বিশ্বাসের একটা ইঙ্গিত দেখা যায় শিবের 'পশুপতি' নাম থেকে। গোময় ও গোমূত্র কেবল যে ওষুধ হিসাবে ব্যবহৃত হয় এমন নয়, ভূতপ্রেত তাড়াতেও বেশ কার্যকর বলা হত।

টিকটিকিকে খুব রহস্যজনক মনে করা হয়। দেয়ালে বসে টিক্‌টিক্ করে টিকটিকি



চিত্র 1—আসামের একটি গ্রামের বাড়ি

চিত্র 2—ভরাল ঘর। ধানের গোলা



চিত্র 3—খাসিয়া মেয়ে। জল বয়ে আনছে



চিত্র 4—বোড়ো মেয়েদের আনুষ্ঠানিক নৃত্য



মঙ্গল-অমঙ্গলের ইঙ্গিত করে। টিকটিকির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মন্ত্রসিদ্ধ ওষুধে প্রয়োগ করা হয়। সে ওষুধ না কি বুড়ো মানুষের দেহে নূতন শক্তি ও নবযৌবনের সূচনা করতে পারে। অসুখ নিরাময়ের জন্য, সৌভাগ্য সঞ্চারের জন্য, কিংবা বশীকরণের জন্য যেসব মন্ত্রপূত ওষুধ ব্যবহার করা হয়, টিকটিকির পা, লেজ প্রভৃতি তার অন্যতম উপাদান। সেমা নাগাদের বিশ্বাস শিশু জন্ম নিলে টিকটিকি তৎক্ষণাৎ সেই খবরটা পৌঁছে দেয় উপদেবতাদের কাছে। তারা এসে শিশুর মৃত্যু ঘটায়। শিশু যদি কন্যাসন্তান হয় তাহলে টিকটিকি তার লুকিয়ে থাকার জায়গা থেকে আর বেরোয় না। সেমা নাগারা, বিশেষত সেমা পুরুষেরা, টিকটিকি দেখলেই মেরে ফেলে, মেয়েরা অবশ্য মারতে ভয় পায়। তর্কাতর্কি করার সময় হঠাৎ যদি টিকটিকি টিক্‌টিক্ করে ওঠে আসামের মানুষ আসবাবপত্রের উপর আঙুল দিয়ে ঠক্ ঠক্ করে প্রতিপক্ষের কিংবা শ্রোতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলে উঠবে, টিকটিকিও 'ঠিক ঠিক' বলছে।

সুতরাং দেখা যায় এইসব কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের ভালো ও মন্দ দুটো দিকই আছে। বেড়াল তার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। অসমীয়াদের মধ্যে কেউই বেড়ালকে প্রাণে মারে না। বেশির ভাগ বাড়িতেই বেড়াল রাখা হয় ইঁদুর মারার জন্য, কিন্তু পোষা জন্তু হলেও বেড়ালকে সব অসমীয়ারা খুব বেশি পছন্দ করে না। বরঞ্চ অনেকে বেড়ালকে ভয় পায়। গভীর রাতে নিঃসঙ্গ বেড়াল যখন ম্যাঁও ম্যাঁও শব্দে বিকট চীৎকার করে কাঁদে, অসমীয়া গৃহস্থ মনে করে এই কান্নাটা এক অশুভ লক্ষণ, এর ফলে বাড়িতে অসুখ বিসুখ হতে পারে। গৃহকর্তা সেই ক্রন্দনরত বেড়ালটাকে 'ছুঃ ছুঃ' শব্দ করে বাড়ির চৌহদ্দি থেকে তাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে। ভূতপ্রেতের সঙ্গে যোগসাজস আছে মনে করে কালো বেড়ালকে একটু যেন বেশি ভয় করা হয়। কোন কোন নাগা গোষ্ঠীর লোক শত্রুর শরীরে ব্যাধি উৎপন্ন করার জন্য কালো বেড়াল বলি দেয়। অসমীয়াদের ধারণা বেড়াল ভারি হিংসুটে জন্তু। একটি অসমীয়া উপকথায় আছে যে কোন গৃহস্থ বাড়িতে একই সময়ে গৃহকর্ত্রীর ও বাড়ির বেড়ালের গর্ভাবস্থা হয়েছিল। বেড়াল প্রতিদিন প্রতিবেশীদের রান্নাঘর থেকে মাছ চুরি করে আনত। কিন্তু গৃহকর্ত্রী মাছটুকু খেয়ে কেবল কাঁটাটুকু দিতেন বেড়ালকে। বেড়াল তখন শাপ দিল যেন তার গর্ভের সন্তান গৃহকর্ত্রীর পেটে যায় এবং গৃহকর্ত্রীর গর্ভের সন্তান তার নিজের পেটে আসে। যথাসময়ে বেড়ালের দুটি মানুষের মেয়ে হল আর গৃহকর্ত্রীর হল দুটি বেড়ালছানা।

পাখির মধ্যে কাককে কেউ ভালো চোখে দেখে না। কাক 'কা কা' করলেই

বুঝতে হবে—হয় অবাঞ্ছিত অতিথি আসবে কিংবা কোন অমঙ্গল ঘটবে। মঙ্গল-অমঙ্গল দেখবার জন্য ডাক-ছাড়া কাকের জন্য উঠোনে তিন মুঠো চাল ছিটিয়ে দেওয়া হয়, কোন্ মুঠোতে কাক প্রথম মুখ দেয় তাই নজর করে শুভাশুভ বুঝে নিতে হয়। কাক ঠিক কী ধরনে 'কা কা' করছে তা শুনেও ভাল-মন্দ নির্ণয় করা হয়। ঘরের চালের উপর ডাকলে বুঝতে হবে লক্ষণ শুভ নয়। যাত্রার আরম্ভে কাক যদি 'কা কা' করে তাহলে বুঝতে হবে যাত্রা নষ্ট। যদিও লক্ষ্মী দেবীর বাহন, পেঁচাকে মনে করা হয় অমঙ্গলে পাখি। পেঁচার ডাক শুনলে মানুষ মরে বলে বিশ্বাস। পেঁচা যদি অন্ধের মতো উড়ে এসে কারো ঘরে ঢুকে পড়ে, তাহলে বুঝতে হবে সে বাড়িতে কোন একটা অঘটন ঘটতে বাধ্য। পেঁচার মাংস ও পালক ক্ষমতা বৃদ্ধির একটি পরীক্ষিত ওষুধ বলে বিবেচিত। ভারতের রাষ্ট্রীয় পাখি ময়ূরকে বেশ একটা উচ্চাসন দেওয়া হয়। ময়ূর কার্তিকের বাহন, ময়ূরপুচ্ছ কৃষ্ণের শিরোভূষণ—এইসব কারণে ময়ূরকে পবিত্র বলে জ্ঞান করা হয়। ময়ূরের পালকে এমন কিছু দ্রব্যগুণ আছে যে তা ধারণ করলে কোন কোন রোগের উপশম ঘটে। ময়ূরের উন্মত্ত নৃত্য আসন্ন ঝড়বৃষ্টির লক্ষণ। এই ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা থেকে রক্ষা পাবার জন্য বাড়ির মাথায় ময়ূরের একটি প্রতিকৃতি স্থাপন করা হয়।

হিন্দুদের বিশ্বাস বাসুকী সাপ পাতাল থেকে তার বিস্তারিত ফণার উপর পৃথিবীটাকে ধারণ করে আছে। বাসুকী একটু নড়চড় করলেই ভূমিকম্প হয় বলে মনে করা হয়। বহু জনজাতি কোনো এক কাল্পনিক সর্পদেবতার অলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বাস রাখে। মিশিমিদের মতে পৃথিবী দাঁড়িয়ে আছে একটি স্তম্ভের উপর, প্রকাণ্ড এক সাপ জড়িয়ে আছে সেইস্তম্ভ। সেই সাপ মাঝে মাঝে রেগে গিয়ে স্তম্ভটা নাড়িয়ে দিলে ভূমিকম্প হয় এবং বহু মানুষ মারা পড়ে। কুকিদের কেউ কেউ মনে করে পৃথিবীটাকে চারিদিক থেকে জড়িয়ে আছে প্রকাণ্ড এক সাপ। সেই সাপ মাঝে মাঝে যখন নিজের লেজে কামড় লাগায়, ব্যথা পেয়ে নড়চড় করলেই ভূমিকম্প হয়। খাসিয়ারা তাদের সর্পদেবতা উথ্লেনকে পূজা করে মানুষের রক্ত দিয়ে, এক কালে তার তুষ্টির জন্য নরবলিও দেওয়া হত। অসমীয়াদের মধ্যে অনেকেই সর্পদেবী মনসা বা মারৈ-কে পূজা করে। সুতরাং তারা যদি সাপকে পবিত্র প্রাণী জ্ঞান করে এবং বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে সাপ মারা থেকে বিরত থাকে, তাহলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

গোখরো সাপ যদি কোনো গৃহস্থালীতে জোড় বেঁধে থাকে, অধিকাংশ গৃহস্থ মনে করে তারা তার ধানের গোলা রক্ষা করছে ; তারা থাকলে ভাঁড়ার ভরে থাকবে,

সুতরাং তাদের হত্যা করে না। কোন কোন ভগ্নপ্রায় পুরাতন মন্দিরে—এমন কি নব-গঠিত 'নামঘরে'-ও দেখা যায়, অজগর কিংবা আর কোন বড়ো সাপ আসা যাওয়া করে। তাদের কেউ কেউ আবার মন্দির কিংবা নামঘরের কোন অন্ধকার ঘুপচিতে বাসা বেঁধে বসবাস করে। এরা অবধ্য ; ভক্তদের দৃঢ় বিশ্বাস যারা পূজা করতে কিংবা নাচগান গাইতে আসে, তাদের এই সব সাপ কখনো ক্ষতি করে না। অসমীয়া বৈষ্ণবেরা গোখরো সাপের গায়ে কখনো হাত তোলে না, কারণ তাদের প্রথম ও প্রধান গুরু শ্রীশঙ্করদেবকে একবার নাকি একটি গোখরো তার ফণা বিস্তার করে ছায়া দিয়েছিল। শিশু কৃষ্ণকে তার পিতা যখন বুকে করে সংগোপনে নন্দের বাড়িতে রেখে আসতে চেয়েছিলেন, তখন ঝড়বৃষ্টি থেকে তাকে রক্ষা করেছিল বিরাট এক সাপ, প্রকাণ্ড তার ফণা তুলে। যে বাড়িতে গর্ভবতী নারী আছে সে বাড়ির কোন লোক সাপ মারতে চায় না, পাছে কোনো খুঁত নিয়ে শিশু জন্মায়। নাগা গোষ্ঠীর অনেকেও এ কথা বিশ্বাস করে। সর্পাঘাতে কারো মৃত্যু হলে মনে করা হয় সে মানুষ দুর্ভাগ্য। তেমন লোকের মৃতদেহ অসমীয়া হিন্দুরা অগ্নিসাৎ করে না, মাটিতে পুঁতে রাখে। কেউ কেউ আবার কলাগাছের ভেলা বেঁধে তার উপর শব রেখে নদীর জলে ভাসিয়ে দেয়। বেহুলা সতীর কাহিনীতে বলা হয়েছে যে কালনাগের দংশন-জনিত বিষে স্বামী লক্ষ্মীন্দরের যখন মৃত্যু হল, পুনরায় মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চারের আশায় কলাগাছের ভেলায় লক্ষ্মীন্দরের দেহ নিয়ে বেহুলাও সাগরের জলে পাড়ি দিয়েছিল দেবতাদের কৃপালাভের সন্ধানে। লোককথায় বলা হয়েছে যে বেহুলা ও তার শ্বশুর চন্দ্রধর বনিয়া গৌহাটি থেকে প্রায় ছত্রিশ মাইল পশ্চিমে ছয়গাঁয়ের বাসিন্দা ছিল।

সাপের সঙ্গে জড়িত আরো অনেক সংস্কার আছে। সঙ্গমরত অবস্থায় একজোড়া সাপ দেখলে প্রেমে ও যুদ্ধে জয় হয়। সাপজোড়ার উপরে কিংবা কাছাকাছি একখানা চাদর ফেলে দিতে হয়, পরে সেই চাদর যদি গায়ে দেওয়া হয় তা হলে প্রেমে বা যুদ্ধে জয়লাভ অবশ্যম্ভাবী। প্রাচীন অসমীয়া ভাস্কর্যে সঙ্গমরত সাপের মূর্তি রচিত হত উর্বরতার প্রতীক রূপে। সাপের বিষ ও খোলস কখনো কখনো ওষুধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়—বিশেষ করে স্ত্রীলোকদের বশীভূত করার জন্য। স্বপ্নে সাপ দেখলে প্রাণপ্রিয় বন্ধুর সঙ্গে বিবাদের সম্ভাবনা। মিজোরা মনে করে সঙ্গমরত সাপ দেখলে হয় মৃত্যু নয়তো গুরুতর ব্যারাম হয়। তাদের মতে জোড়া সাপ মারা অমঙ্গলের সূচনা করে। চাষ করার জন্য জঙ্গল সাফ করতে গিয়ে যদি সাপ দেখা যায় তাহলে নাগাগোষ্ঠীর কেউ কেউ সেই জমিতে চাষ করে না, চাষ দিলে নাকি

অনিবার্য মৃত্যু। পর্বতে প্রান্তরে আসামের নানা মানুষ নানারকম অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে, সেইসব তথ্যাদি এখন তাদের সংস্কৃতির অন্তর্গত। শিল্পে সাহিত্যে তার বিচিত্র প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। জনজাতির অনেকে তাদের দা ও বর্শা-বল্লমের হাতলে সাপের মূর্তি খোদাই করে থাকে। খৃস্টীয় 1532 অব্দে আহোম ও মিশমিদের মধ্যে সন্ধির চিহ্নস্বরূপ শদিয়ার বিখ্যাত সর্পস্তম্ভ এইরকম ভাস্কর্যের অন্যতম সুন্দর নিদর্শন। সম্প্রতি এই স্তম্ভটি গৌহাটিস্থিত আসাম সংগ্রহশালায় স্থানান্তরিত হয়েছে। মনসাকে যদি সর্পদেবীরূপে কল্পনা করা হয়ে থাকে তা হলে সাপকে কেন্দ্র করে নানা লৌকিক কাহিনী রচিত হবে—এতে আর বিচিত্র কী? সাপের বিষয়ে একাধিক লৌকিক কাহিনীর মধ্যে সবচেয়ে প্রতিনিধিত্বমূলক হল চম্পাবতীর কাহিনী। একটি প্রকাণ্ড সাপ চেয়েছিল চম্পাবতীকে বিবাহ করতে। সেই চেষ্টায় সাপ যখন সফলকাম হল, দেখা গেল সে ছিল আসলে ছদ্মবেশী কোনো দেবতা। তিনি চম্পাবতীকে অজস্র ধনৈশ্বর্য দিলেন। চম্পাবতীর ছিল একজন বৈমাত্রেয় বোন, ঈর্ষাপরায়ণা বিমাতা চাইল মেয়েকে সাপের সঙ্গে বিয়ে দিতে। প্রকাণ্ড এক সাপ ধরে এনে তার সঙ্গে বেচারা মেয়েটির বিয়ে দেওয়া হল, কিন্তু সাপ তাকে খেয়ে ফেলল।

মাছ উর্বরতা, বিবাহ ও ধর্মকর্মের সঙ্গে জড়িত। আসামে ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব সহ অধিকাংশ সম্প্রাদায়ের মাছমাংস খেতে কোনো বাধা নেই। কিন্তু কোন কোন সম্প্রদায় কোনো কোনো মাছ বা মাংস খায় না। বর্ণ হিন্দু বলে জ্ঞাত আর্যসম্ভূত হিন্দুরা সচরাচর মোরগ কিংবা শূকরের মাংস খায় না। উত্তর কাছাড়ের বোড়ো গোষ্ঠীর দিমাসা-রা সন্তানলাভের জন্য দেবতাদের কাছে কোনো কোনো মাছ মানত করে থাকে। তারা সেই মানতের মাছ খায় না। অসমীয়া বিবাহের প্রথম স্তরে 'জোরণ'। সেই উপলক্ষে বরের বাড়ি থেকে কন্যার জন্য বস্ত্রালঙ্কার প্রভৃতি তত্ত্ব পাঠানো হয়, মাছ সেই সামগ্রীর এক অপরিহার্য অঙ্গ। আবার অষ্টমঙ্গলার দিন মেয়ে-জামাই যখন প্রথমবার একসঙ্গে কন্যার বাড়ি আসে, তখন বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়কুটুম্বদের নিমন্ত্রণ করে যে ভোজ দেওয়া হয় তাতে মাছ না থাকলে চলে না। একটি বিয়ের গানে উর্বরতাশক্তি বৃদ্ধিতে মাছের কার্যকরতা বিষয়ে লোকবিশ্বাস এইভাবে ব্যক্ত হয়েছে : একটা বাটিতে একজোড়া মাগুর মাছ নিয়ে কন্যার সামনে রাখো, তারপর মাছজোড়া ছেড়ে দাও নদীর জলে, দেখবে দীর্ঘজীবী পুত্রসন্তান হবে। শিশু বাড়িতে জন্ম নিলে এবং সে শিশু যদি পুত্রসন্তান হয় তাহলে অসমীয়া গৃহকর্তা বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে মাছ বিলি করেন। শিশু ছ-মাসের হলে যখন নামকরণ

অন্নপ্রাশন হয়, ভোজ্য দ্রব্যের মধ্যে মাছ না থাকলে নয়। কারো মৃত্যুর পর অশৌচ ব্রত পালনের দিনগুলিতে পরিবারের কেউ মাছ-মাংস খায় না। শ্রাদ্ধ হয়ে গেলে জ্ঞাতিকুটুম্বদের ডেকে যে ভোজ দেওয়া হয় সেইখানে মৎস্যস্পর্শ করা হয়।

কোন কোন পূজাতেও মাছ উৎসর্গ করা হয়। কাছাড়িরা মাছ দিয়ে তরকারি রেঁধে ভূতপ্রেতদের খুশি করার জন্য রেখে দিয়ে আসে। মিরিরা মনে করে মাছ ও লক্ষ্মীর মধ্যে কোন তফাত নেই। মিরিদের একটি পূজায় পুরোহিত স্বয়ং একটি মাছ ধরে একটা লম্বা সুতো দিয়ে তাকে বেঁধে টেনে নিয়ে যায় একেবারে ঘাট থেকে ধানের গোলা অবধি। তাতে করে নাকি ধনৈশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী কুপিতা লক্ষ্মী দেবীকে তুষ্ট করা যায়। বোড়োরা বলে, মাছের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন ভাণ্ডারী। দেবীর ভাঁড়ারে প্রচুর বড় বড় মাছ আছে যা থেকে তিনি মানুষকে ভাগ দেন—অবশ্য যদি আগে ভাগে মানুষ তাঁর নামে একটি মোরগ উৎসর্গ করে। আহোমরা ও উত্তর ভাগের সোনোয়ালরা তাদের ধানের গোলা ভরাবার জন্য এবং চাষবাস ভালো হবে বলে একধরনের নাটুকে অনুষ্ঠান পালন করে। বেশ ধুমধাম করে তারা লক্ষ্মীর বিগ্রহ বহন করে নিয়ে যায় কোন নদী বা পুকুরের ধারে। দেবীকে বেদীতে স্থাপন করে তারা দলে দলে পলো নিয়ে জলে নেমে পড়ে, পলোতে যা ওঠে—মাছ হোক, জঞ্জাল হোক—সবকিছু নিয়ে ফেলে সেই বেদীর সামনে। যদি পলোতে মাছই ওঠে তাহলে বলা হয় ভাগ্য সুপ্রসন্ন। পূজা হয়ে গেলে পর সেইসব মাছ ও জঞ্জাল সকলের মধ্যে বিলি করে দেওয়া হয়, দেবীর প্রসাদ রূপে সেইসব জিনিস লোকেরা গোলার চারদিকে কিংবা ধানক্ষেতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেয়। বীজ থেকে প্রথম যখন সবুজ হয়ে ধানের গাছ ওঠে গারোরা সেসময় তাদের এক উৎসবে মাছের ল্যাজা উৎসর্গ করে। মিরিরা মনে করে মাছ হল মানুষের সমস্ত ধনসম্পত্তির জননী, তাই তারা বসবাসের জন্য এমন সব জায়গা বেছে নেয় যেখানে প্রচুর মাছ আছে। কোন কোন নাগাদের মধ্যে একটা প্রথা আছে যে সর্বপ্রথম যে মেয়ে ক্ষেতে বীজ পুঁতবে তাকে মাছ খেতেই হবে। তেমনি যে মেয়ে ধান কাটার সময় প্রথম আঁটিটা কাটে তাকে কেবল ভাত, আদা ও মাছ খেতে হয়। নাগাদের মধ্যে কোন কোন দল আবার মনে করে যে জলে বিষ মিশিয়ে প্রচুর মাছ যদি ধরা যায় তাহলে শস্যের ফলন হবে ভালো।

কোন কোন মাছের রোগ নিরাময় করার ক্ষমতা আছে বলে মনে করা হয়। ঘুমোবার সময় কেউ যদি বিছানা ও কাপড়চোপড় ভেজায় তাকে 'পাটিমুতুরা' মাছ খাওয়ালেই অসুখ সেরে যাবে। কোন কোন স্ত্রীরোগে 'ডরিকনা' মাছ প্রয়োগ করা হয়। কেউ কেউ ভূতপ্রেতের উপদ্রব থেকে রক্ষা পাবার জন্য ঘরের চালে মাছের

কাঁটা গুঁজে রাখে। স্বপ্নে মাছ দেখলে নাকি বিবাহের সম্ভাবনা। একটা বড় কাজে হাত দেবার শুরুতে আঁশবিহীন মাছ খাওয়াটা অমঙ্গলে। গারো ও দিমাসা কাছাড়িরা মনে করে চাঁদা জাতীয় মাছ যদি স্বপ্নে দেখা যায় তাহলে হাতে টাকা আসে। সম্ভবত এই জাতীয় মাছের সঙ্গে রুপোর টাকার সাদৃশ্য থেকে এই ধারণা।

পান-চিবানোর শখ আসামে বহু প্রচলিত। এশিয়া আফ্রিকা জুড়ে দুই মহাদেশে বহু লোক পান-সুপুরি চিবোয়। এই বিরাট ভূখণ্ডের একেবারে মাঝখানে থাকার ফলে অসমীয়ারা পান-সুপুরির ভক্ত হবে এতে আর বিচিত্র কী! রাজারাজড়া থেকে শুরু করে গরিব চাষাভুষোরাও পান চিবোতে ভালোবাসে। পানের পাতা হল পান, আর সুপুরি হয় তামূল থেকে—সংস্কৃত তাম্বূল থেকে তামূলের উৎপত্তি। পান-চিবানোর অভ্যাসটা এসেছে অনার্যদের কাছ থেকে। বলা হয় মন্‌খ্‌মের ভাষী খাসিয়ারা জনজাতিদের মধ্যে সর্বপ্রথমে আসামে প্রবেশ করে এবং তারাই এই অভ্যাসটা আমদানি করে থাকবে কামপুচিয়া থেকে। খাসিয়ারা তামূলকে বলে 'কুয়েই'; তামূলের প্রতিশব্দ অধুনা অপ্রচলিত অসমীয়া 'গুয়া' কথাটার সঙ্গে 'কুয়েই' তুলনীয়। 'গৌহাটি' নামটির শুদ্ধ রূপ 'গুয়াহাটি' কথাটাও তাম্বূলবাচক গুয়া→বাগুক→কুবাক থেকে উদ্ভূত বলা হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে Betel ও Areca—এই দুটি ইংরাজী কথা এসেছে যথাক্রমে মলয়ালম ও কন্নড় ভাষা থেকে—দুটিই অনার্য ভাষা। সুতরাং মনে হয় সংস্কৃত 'তাম্বূল' কথাটা নিশ্চয় পরবর্তী কোনকালের প্রক্ষিপ্ত শব্দ—ঋগ্বেদের কোথাও এর উল্লেখ নেই। কেবল পরবর্তী যুগের পালি সাহিত্যে, কামসূত্রে, বৃহৎ সংহিতায়, ও চরক-সুশ্রুতের রচনায় ব্যবহারোপযোগী বস্তু রূপে তাম্বূলের উল্লেখ দেখা যায়।

যোগিনীতন্ত্র বলে, অসমীয়া স্ত্রীলোকেরা অনবরত তাম্বূল চর্বন করে থাকে। আজকের দিনেও পর্বতে-সমতলে পুরুষ নারী নির্বিশেষে সকলেই সবসময় পান চিবোয়। যে কোন অসমীয়া গ্রামে গেলেই দেখা যাবে সারি সারি সরু লম্বা সুপুরি গাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে। আগেকার দিনে রাজারাজড়া যেখানে যেত সঙ্গে নিয়ে যেত ক্ষুদে একদল কর্মচারী যাদের প্রধান কাজই ছিল সাজা পান অনবরত যোগান দেওয়া। এমন কি নিদন্ত যারা, তারাও কাঠ বা ধাতুর তৈরি হামামদিস্তায় ছেঁচে পানের স্বাদ নিত। সুতরাং ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে পান-তামূলের একটা বিশেষ স্থান থাকবে—এতে আর আশ্চর্য কী! অসমীয়া বাড়িতে অতিথি এলে তাকে প্রথমেই সাধা হয় পান দিয়ে। প্রতি বার আহার গ্রহণের পর পান হয় মুখশুদ্ধি। কোন কোন অনুষ্ঠানে বয়োকনিষ্ঠেরা বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি সম্মান দেখায়

পানের বাটাতে কিংবা মাটির রেকাবিতে পান-তাম্বূল নিবেদন করে। কখনো কখনো গ্রাম পঞ্চায়েতের আসরে অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি অপরাধ স্বীকার করে বাটা ভরে পান-তাম্বূল দিয়ে দণ্ডবৎ প্রণাম করে, তাহলে অপরাধীকে শাস্তি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেম নিবেদনের প্রথম পর্বের সূচনা হয় পরস্পরের মধ্যে পান আদান-প্রদান করে। বাৎস্যায়নের কামসূত্র থেকে ইঙ্গিত নিয়ে এই অভ্যাসের সূত্রপাত হয়েছিল কিনা কে জানে! তিনি অবশ্য বলেছেন, •প্রশ্বাসের সুগন্ধ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রণয়ীযুগল দাঁত মেজে একটি করে পান মুখে পুরবে এবং প্রেমালাপ চলতে থাকা কালে একজন অপর জনের মুখে পান একটা পুরে দেবে। অসমীয়া বিবাহ সভায় পানের ভূমিকা খুবই বড়। অনার্যসম্ভূত গ্রামবাসীদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলিতে পান এক পবিত্র উপচার। খাসিয়ারা মৃতদেহের উপরে একটি পান রেখে বলে, 'বিদায়। যাও ঈশ্বরের কাছে আর তাঁর সঙ্গে একটি পান খেয়ো।' দেবী সুবচনীর নামে উৎসর্গীকৃত উপচারের মধ্যে আহোমরা পান তাম্বূল রাখে, নবান্ন উৎসবের সময়। পানের পাতা ও কাঁচা সুপুরি তারা প্রথম যখন ঘরে তোলে, তাদের একটি করে নিবেদন করে ঈশ্বরকে। বোড়োরা এইরকম করে তাদের খেবাই পূজার সময়।

মোরগ বলি দেবার কথা ইতিপূর্বেই বলেছি। শোনা যায় বন্য কুক্কুটকে সর্বপ্রথম পোষ মানায় অস্ট্রিক ভাষাভাষী জাতিরা। তারা এবং তাদের নিকট সম্পর্কিত তিব্বত-বর্মী ভাষীরা মোরগ মুরগীকে তাদের সামাজিক ক্রিয়াকলাপে বেশ একটা গুরুত্ব দিয়েছে; সম্ভবত সেই কারণে মুরগীর ডিম জনবিশ্বাসে কিছু মহিমা অর্জন করেছে—যদিচ সাধারণত আর্য হিন্দুরা মুরগীর ডিম খায় না, মাংস তো দূরের কথা। বাঁশ ও কলাগাছের বাকল দিয়ে 'বেই' নামে একটি যে ত্রিকোণাকৃতি মণ্ডপ তৈরি করা হয় অসমীয়া বিবাহে, বরকন্যার স্নানের জন্য, সেখানকার মাটিতে এক জোড়া মুরগীর ডিম পুঁতে রাখা নিয়ম। কোন কোন ক্ষেত্রে শ্বশুরবাড়ি যাবার সময় কন্যাকে এক জোড়া ডিম নিয়ে যেতে হয়। এ-সব অনুষ্ঠানে ডিমের ব্যবহার সম্ভবত উর্বরতার প্রতীকরূপে। ভালো চাষের জন্য আবহাওয়া যাতে ভালো থাকে সেইজন্য দেবতাদের উদ্দেশে মোরগ ও ডিম নিবেদন করা হয়। কাছাড়িরা ধনসম্পত্তি বৃদ্ধির কামনায় তাদের ময়নাও দেবীকে ডিম দিয়ে পূজো করে। আসামের বহাগ বিহু উৎসবে ছেলেমেয়েরা ডিম নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে খুব মজা পায়, পরস্পরের গায়ে ডিম ছোঁড়ে কিংবা কে কার ডিম ফাটাতে পারে তাই নিয়ে প্রতিযোগিতা হয়। এই উৎসব হয় ধান চাষ শুরু হবার ঠিক আগে, তাই মনে হয় ক্ষেতের উর্বরতা

বৃদ্ধির সঙ্গে এই ডিমভাঙা খেলার একটা কোন সম্বন্ধ আছে। মোরগ বা মুরগীর ঠ্যাং কেটে মঙ্গল-অমঙ্গল নির্ধারণের একটা প্রথা আছে আহোমদের মধ্যে। খাসিয়ারা এরকম ক্ষেত্রে একটা ডিম ভেঙে পরীক্ষা করে। মোরগ ডাক দিয়ে জানান দেয় যে রাত পোহাল ; কিন্তু অসময়ে রাতের প্রথম প্রহরে যদি ডাক ছাড়ে, সেটা অশুভ লক্ষণ।

আসাম অঞ্চলের জনবিশ্বাস ও কুসংস্কার কী কী আছে তার পুরোপুরি হিসাব দেওয়া সম্ভবপর নয়। সেসব সংগ্রহ করে তার পূর্ণাঙ্গ অধ্যয়ন করার পরিকল্পনাও আমরা হাতে নিইনি। অতএব আরো কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে আমরা এই অধ্যায়ের ছেদ টানব।

মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার আবিষ্কারসমূহ একটি কোন বৃক্ষ দেবতার অস্তিত্বের প্রতি ইঙ্গিত করে। আসামেও গাছের সূক্ষ্ম কাজ সম্বলিত প্রাচীন কিছু ভাস্কর্যের সন্ধান পাওয়া গেছে। বোড়োরা মনসা গাছকে অতি পবিত্র জ্ঞান করে। অন্যান্য অসমীয়া হিন্দুরাও আগুন, অতিবৃষ্টি কিংবা ঝড়ের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য মনসা রোপণ করে। তাছাড়া তারা সর্পদেবতার যদৃচ্ছা বিচরণ রোধ করার জন্যও ধান ক্ষেতের ধারে কাছে মনসা লাগায়। অসমীয়া বৈষ্ণবদের কাছে হরিতকী পবিত্র গাছ, কারণ তাদের গুরু শ্রীশঙ্করদেব একটি হরিতকী গাছের ছায়ায় বসে বিশ্রাম নিতেন ও পুঁথি রচনা করতেন। এই প্রসঙ্গে বৌদ্ধদের বোধিদ্রুমের কথা আমাদের মনে পড়ে। কালী-উপাসকের কাছে পবিত্র নিমগাছের পাতা ভূতপ্রেত বিতারণের কাজে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এর প্রধান উপযোগিতা হল বসন্ত রোগে—রোগীর খাটের তলায় নিমগাছের ডাল রাখলে নাকি রোগের উপশম হয়। গ্রামের ওঝারা ভূতপ্রেত নামাবার জন্য বিষলজ্ঘনীর ডাল ব্যবহার করে থাকে, ভূতগ্রস্তের গায়ে ডালটা মারতে মারতে মন্ত্র পড়লে ভূত নাকি পালাবার পথ পায় না। বিষলজ্ঘনী ওষুধ বানাতেও কাজে লাগে।

অসমীয়ারা কতকগুলি বিধি নিষেধ মেনে চলে। অমাবস্যা, একাদশী, মঙ্গলবার ও শনিবার তারা বাঁশ কাটেনা, কাটলে নাকি বাঁশগাছের ভূত সেইসব মানুষের ক্ষতি করে। মঙ্গলবার ও শনিবার যে কোন কাজের পক্ষে অশুভ। এ দুটো দিন তারা নূতন কাজে হাত লাগায় না। বিবাহিত স্ত্রীলোকেরা অমাবস্যা, প্রতিপদ ও পূর্ণিমার দিন তাদের মায়ের বাড়ি যায় না। আরো কোন কোন বিশেষ দিনক্ষণকে অপয়া মনে করা হয়। কোন কোন মাসে এবং কোন কোন দিনে ধানের গোলা থেকে ধান বের করা নিষেধ। যে স্ত্রীলোক উপবাসব্রত পালন

করছে তাকে ভাঁড়ার ঘরে যেতে দেওয়া হয় না। বিয়ের পর প্রথম সন্তানটি সাধারণত পোয়াতীর মায়ের ঘরে জন্মানো নিয়ম। সন্তান হবার পর একমাস কাল সে অশুচি হয়ে থাকে বলে তাকে ঘরের কোন জিনিস ধরতে-ছুঁতে দেওয়া হয় না। রজস্বলা কন্যাও কিছুদিনের জন্য অশুচি হয়ে থাকে, সেই ক'টা দিন তাকে একটি ঘরের মধ্যে বন্ধ করে রাখা হয় যাতে তার মুখ কোন পুরুষ না দেখতে পায়। পৃথিবীর বিভিন্ন আদিম জাতির মধ্যে অনুরূপ প্রথা চলিত আছে দেখে মনে হয় এ প্রথা বহুল প্রচলিত।

ধাতু হিসাবে লোহা মানুষের খুবই উপকারী বলে অসমীয়ারা লোহাতে অনেক দ্রব্যগুণ আছে বলে মনে করে। শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত শ্রাদ্ধ অধিকারী তার শরীর থেকে লোহার একটি ছুরি কিছুতেই পরিহার করে না পাছে মৃত ব্যক্তির প্রেতাত্মা তার ক্ষতি করে। শিশু জন্মগ্রহণ করলে তার মায়ের বিছানার নিচে একটি ছুরি রেখে দেওয়া হয়; তাহলে ভূতপ্রেত কাছে আসতে পারে না। এই একই কারণে গ্রামের মানুষ রাতবিরেতে যখন বাড়ির বাইরে যায়, সঙ্গে একটা ছোট দাও নিয়ে যায়। যে দাও দিয়ে বলির পশু কাটা হয় তাকে মন্ত্র পড়ে পূজা করা হয়। প্রেমিক তার প্রেমিকাকে প্রেমের চিহ্নস্বরূপ একটি কাটারী উপহার দেয়। ভূতপ্রেত থেকে রক্ষা পাবার জন্য নববিবাহিত বরবধূ নিজেদের কাছে কাটারী রাখে। বাসর-ঘরে নবদম্পতিকে রক্ষা করার অন্য একটি উপায় আছে। মিতবর ও কনের সখিকে বরকনের সাজ পরিয়ে বাসরে রেখে দিলে ভূতপ্রেত আসল-নকল ঠাহর করতে না পেরে ঠকে যায়। এই একই কারণে, বরকে বলা হয় দেবতা ও কনেকে দেবী। তারা যদি সাধারণ মানুষ না হয়ে দেব-দেবী হয়, ভূতপ্রেত তাদের কী করবে! বিবাহের জন্য বর যখন পাত্রীর বাড়ির দরজায় পা দেয়, ভূতপ্রেত দূরে সরিয়ে রাখার জন্য বরের গায়ে চাল ছিটিয়ে দেওয়া হয়। কোন কোন জনজাতীয় লোকেরা ভবিষ্যৎ গণনার জন্য চাল ব্যবহার করে থাকে।

মানুষের নামে একটা যাদুকরী শক্তি থাকে বলে মনে করা হয়; তাই যেখানে সেখানে নাম ব্যক্ত করা অনুচিত। সচরাচর প্রত্যেক অসমীয়ার দুটো করে নাম থাকে: একটি নামে সে সর্বসাধারণের কাছে পরিচিত, অন্য নামটি রাখা হয় জ্যোতিষ মতে, কোষ্ঠি বিচার ক'রে। শেষোক্তটিই তার আসল নাম। কিন্তু পাছে জাতকের ক্ষতি হয় কিংবা বিঘ্ন হয় সেইজন্য নামটি গোপন রাখা হয়, যার-তার কাছে ব্যক্ত করা হয় না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নাম রাখা হয় দেব-দেবীর নামে এই আশায় যে সন্তান তাহলে দৈব গুণাগুণের অধিকারী হবে, নতুবা দেব-দেবী বিপদে আপদে তাকে রক্ষা করবেন। কোন পরিবারে পর পর শিশু সন্তানের মৃত্যু হলে কিংবা শিশু সন্তানেরা

প্রায় অসুখে বিসুখে ভুগতে থাকলে, ভালো-ভালো নাম না দিয়ে তাদের পচা-পচা নাম দেওয়া হয়। হতকুচ্ছিত নামের ছেলেমেয়েকে ভূতপ্রেত পর্যন্ত পছন্দ করে না। কখনো কখনো নবজাত শিশুকে তার মা-বাবা নামমাত্র মূল্যে বেচে দেন, তাহলে দেবতারা হয়তো মনে করবেন শিশুটি তাদের সন্তান নয়, সুতরাং কেড়ে নিতে চাইবেন না। রাত্রে সাপকে সাপ বলা হয় না, বলা হয় 'দীঘল'। অনবধানে কেউ যদি ওই ভয়ের নামটা উচ্চারণ করে, তাহলে বার বার তিনবার আস্তিক ও গরুড়ের নাম নিতে হয়।

জীবনের অন্তিম মুহূর্তে অথবা মৃত্যুর অব্যবহিত পরে দেহটিকে ঘরের বার করতে হয়, তারপর সরষের তেল ও বাটা হলুদ দিয়ে সারা দেহ মাখিয়ে দিতে হয় এবং শেষ পর্যন্ত স্নান করিয়ে নূতন বস্ত্র পরিয়ে দিতে হয়। এইভাবে মৃত ব্যক্তিকে প্রস্তুত করতে হয় অন্তিম যাত্রার জন্য। শ্মশানঘাট থেকে ফিরে এলে পর শ্মশানযাত্রীদের স্নান করতে হয়, একখণ্ড পাথরের উপর পা রেখে আগুন পোহাতে হয়। এইসব প্রক্রিয়া শেষ করে সে বাড়ির ভিতরে পা দিতে পারে। ফিরে আসতে যদি রাত গভীর হয়, তাহলে ভোর না হওয়া পর্যন্ত তাদের বাড়ির বাইরে থাকতে হয়। মৃত ব্যক্তির প্রেতাত্মা যে তাদের পিছু পিছু আসেনি তার নিশ্চয়তা কী ?

চার

প্রথা ও ঐতিহ্য

অসমীয়া উপকথার নায়িকা পানেসৈ তার ইকরা-সরের ভেলাখানা বেয়ে চলে তো বেয়েই চলে, প্রকাণ্ড বিলটার পারে আর কিছুতেই লাগায় না। বিধবা বুড়ীর পালিতা কন্যা পানেসৈ, বুড়ীকে ডাকে মা বলে। বিধবার একটিই ছেলে। সে ছেলে বড় হয়ে পানেসৈকে বিয়ে করতে চাইল। পানেসৈ কী করে এ বিয়েতে মত দেয়? বুড়ীর ছেলেকে এতকাল কি সে দাদা বলে ডাকেনি? কিন্তু অনেক বুঝানো সুঝানো হল, অনেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা—শেষ পর্যন্ত পানেসৈকে মেনে নিতেই হল।

পানেসৈ-এর মনে যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল তার মধ্যে দিয়ে অসমীয়াদের মনে পারিবারিক সম্পর্কের একটা বড় দিকের পরিচয় পাওয়া যায়। সমাজের মধ্যে থেকে জীবনযাত্রা যদি নির্বাহ করতে হয়, তাহলে সর্বপ্রধান সংযোগ সূত্র হয় আত্মীয় বন্ধন। ভাই-দাদা, বোন-দিদি, মামা-ভাগনে, মাসি-খুড়ি, ভাগনে-ভাইপো—এইসব সম্বন্ধ পরিবারের সকল ব্যক্তিকে একসূত্রে বেঁধে রাখে। বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করার সময় এইসব পারিবারিক সম্পর্কই প্রধানত পথ দেখিয়ে দেয়।

অসমীয়া গ্রাম-সমাজে জনজাতীয় এবং অ-জনজাতীয় দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যেই, যৌথ পরিবারের প্রথা যেন একটা ঐতিহ্যরূপে চলে আসছে। যৌথ পরিবার রক্ত সম্বন্ধের উপর প্রতিষ্ঠিত। ডক্টর প্রতাপচন্দ্র চৌধুরীর অনুমান যে, অতীতেও এখনকার মত উত্তরাধিকার বিষয়ে দায়-ভাগ পদ্ধতি অনুসৃত হত। পিতা যতদিন বেঁচে আছেন ততদিন পর্যন্ত ছেলেরা সম্পত্তির ভাগ চাইতে পারে না। কিন্তু পিতা যদি তাঁর জীবিতকালেই সম্পত্তি ভাগ করে দিতে চান—দিতে পারেন। সুতরাং পিতাই হলেন পরিবারের কেন্দ্রবিন্দু, পরিবারে তাঁর শাসন একচ্ছত্র। কিন্তু এর মানে এমন নয় যে একটা বৃহৎ বা যৌথ পরিবার একেবারেই ভেঙে যায় না। বাস্তব পক্ষে দেখা যায় পুরাতন কালে বিবাহের পর ছেলেরা ভিন্ন হয়ে নিজেদের নিজেদের ঘর বাঁধত। বর্তমানেও আসামের গ্রামাঞ্চলে যৌথ পরিবার অনেক দেখা যায়—যদিও প্রায়ই দেখা যায় যে কোন কোন ছেলে বিয়ে করার পর পৃথক হয়ে যায়।

মান-গোষ্ঠীর কোন কোন জনজাতি মাতৃশাসিত সমাজের প্রথা অনুসরণ করে। উদাহরণ স্বরূপ, খাসিয়াদের কথা উল্লেখ করা যায়, তাদের সমাজ মাতৃশাসিত না হলেও মাতৃপক্ষীয় উত্তরাধিকার ব্যবস্থা মেনে চলে। মাতাকে তারা একটা গোষ্ঠীর কেন্দ্ররূপে গণ্য করে। মা, তাঁর কন্যারা এবং তাদের ছেলেমেয়ে নিয়ে এক একটি পরিবার গঠিত হয় এবং মাতামহী হন সেই পরিবারের উৎস। বিবাহের পর স্বামী আসে স্ত্রীর পরিবারে বসবাস করতে। তার শাশুড়ী সকল উপার্জনের দায়িত্ব গ্রহণ করে আর পারিবারিক কাজকর্মের তদারকিও নিয়ন্ত্রণ করে। ছেলেমেয়ে জন্মানোর পরে স্বামী পৃথক একটি ঘর বানিয়ে নিতে পারে। মায়ের সম্পত্তি পায় মেয়েরা। মেয়ে না থাকলে মায়ের বোনের সবচেয়ে ছোট মেয়ে—সেই সম্পত্তি লাভ করে। পরিবারের সর্বকনিষ্ঠা কন্যাটিকে সমস্ত পূজাপার্বনের ভার নিতে হয় বলে সম্পত্তির মোটা অংশটা তার ভাগে যায়। খাসিয়া পাহাড়টা অনেকগুলি 'সিয়েম' বা খণ্ড খণ্ড সামন্ত রাজ্যের সমষ্টি। সিয়েম অর্থাৎ সামন্ত রাজ্যের প্রধান তার দরবারে বসে গ্রামের সকল কাজ পরিচালনা করেন। সিয়েম নির্বাচিত হয় পত্নীপক্ষের দিক থেকে।

গারো পাহাড়ের গারোরাও অনুরূপ একটি প্রথা অনুসরণ করে। সম্পত্তির অধিকারী হয় গারো মেয়েরা। মাতৃপক্ষের পরিচয়েই গারোদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর পরিচয়। জামাই এসে বসবাস করে শাশুড়ীর পরিবারে। শাশুড়ীর মৃত্যুর পর তার কোন একজন মেয়ে মায়ের বাড়ীটা পায়। কখনো কখনো শাশুড়ী তার অন্য মেয়ে-জামাইদের জন্য এক একটি পৃথক বাড়ী তৈরি করে দেন। সাধারণত মা-বাপের সবচেয়ে আদরের মেয়েটি পায় মূল বাড়ীটা। গারো মেয়েরাই পায় মায়ের সম্পত্তি।

দিমাসা-কাছাড়িদের মধ্যে প্রচলিত প্রথা অনুসারে পুত্র পায় পিতার সম্পত্তি—যথা অস্ত্র-শস্ত্র, টাকা-পয়সা, জমি-জমা, গরু-মোষ প্রভৃতি, আর মেয়ে পায় মায়ের সম্পত্তি—যথা তাঁতশাল, বস্ত্রালঙ্কার প্রভৃতি। বাসনকোষন থাকে সকলের জন্য। মেয়ে না থাকলে মায়ের কোন নিকট আত্মীয় তাঁর সম্পত্তি পায় এবং ছেলে না থাকলে বাবার সম্পত্তি পায় নিকটতম কোন পুরুষ আত্মীয়। প্রাচীন মাতৃশাসিত সমাজের উত্তরাধিকার প্রথার এগুলি চিহ্নবিশেষ হতে পারে। দিমাসা-কাছাড়িরা কিন্তু নারীদের পুরুষের সমকক্ষ বলে গণ্য করে না। সমাজের বিচারে কেউ যদি দোষী প্রতিপন্ন হয় তাহলে পুরুষদের যত জরিমানা দিতে হয় মেয়েদের দিতে হয় তার অর্ধেক।

স্ত্রীলোকেরা অসমীয়া সমাজে যতই সম্মানিত হোক না কেন, উপরোক্ত উপাজাতীয় সম্প্রদায় ব্যতিরেকে আর কোন সম্প্রদায় কিন্তু মাতৃপক্ষীয় উত্তরাধিকার ব্যবস্থা মেনে চলে না। অসমীয়া সমাজ পরিচালনার আধার হল সচরাচর প্রচলিত পিতৃপ্রধান ব্যবস্থা।

মনু যে আট রকম বিবাহের বিধান দিয়েছিলেন, সেগুলি সম্ভবত প্রচলিত আর্য ও অনার্য বিবাহ প্রথার শাস্ত্রীয় স্বীকৃতি মাত্র। প্রজাপতি প্রথা অনুসারে পাত্রপক্ষ থেকে পাত্রীপক্ষের কাছে প্রস্তাব আসে, তারপর আনুষঙ্গিক নিয়ম পালন করার পর বিবাহ পাকা হয়। আসামে এই প্রজাপতি প্রথাই হল সচরাচর প্রচলিত প্রথা। রাক্ষস বিবাহে কন্যাকে বলপূর্বক হরণ করে বিবাহ করা হয়, গান্ধর্ব প্রথায় বরকন্যার মিলন হয় গোপনে। আসামে এ দুটি প্রথা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। ব্রাহ্ম প্রথায় কন্যার পিতা আনুষ্ঠানিক ভাবে উপযুক্ত পাত্রের হাতে কন্যা সম্প্রদান করেন। আর্য বিবাহে একজোড়া হাল-বলদের বিনিময়ে পিতা কন্যাকে তুলে দিতেন পাত্রের হাতে। অসমীয়া সমাজে এই দুটি বিবাহের প্রসঙ্গও অবান্তর। তবে পিশাচ প্রথা অনুসারে পালিয়ে গিয়ে বিবাহ করাটা কিন্তু আসামের গ্রামাঞ্চলে তেমন কিছু অসাধারণ নয়। বিহু উৎসবের সময় যুবক-যুবতীরা স্বচ্ছন্দ মেলামেশার একটা সুযোগ পায়, কেউ কেউ তখন যুগলে পালিয়ে গিয়ে মিলনের পথ সহজ ও ত্বরান্বিত করে। কিন্তু পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করাটাকে নিরুৎসাহিত করা হয়। একটি বিহু গানে কন্যা বলছে, প্রেমিকের সঙ্গে নাচতে তার খুব ভালো লাগে, কিন্তু প্রেমিক যেন তাকে না পালিয়ে নিয়ে যায়, তাহলে তাদের জরিমানা দিতে হবে। এই 'পালিয়ে নিয়ে যাওয়া' সোজাসুজি পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করা হতে পারে অথবা প্রাচীন কালের রাক্ষস-বিবাহের রেশ হতে পারে। গাঁয়ের মুরুব্বিদের মারফত সমাজের কাছে যথারীতি ক্ষমা ভিক্ষা করলে এবং মুরুব্বিরা একটা দণ্ড বিধান করে ক্ষমা করলে, পলাতক প্রণয়ীযুগলকে ছেলের বাড়ি সাধারণত গ্রহণ করে। এই দণ্ডবিধান সমাজের সমালোচনা সূচিত করে। অতঃপর অবশিষ্ট থাকে কন্যার জন্য মূল্য দিয়ে অসুর বিবাহ এবং পুরোহিতের হাতে কন্যা সম্প্রদান করে দৈব বিবাহ—এই দু'রকম বিবাহের কথা আসামে শোনা যায় না।

পৃথিবীর সর্বত্র বিবাহের ফলে আত্মীয়-কুটুম্বের পরিধি বিস্তার লাভ করে। ভারতের অন্যত্র যেমন হয় তেমনি বিবাহের পর আসামেও পরিবারের চৌহদ্দি ছাড়িয়ে নানা সম্পর্কের পথ খুলে যায়। পিতৃপক্ষ ও মাতৃপক্ষে উভয় দিকে কাকা-জ্যেঠা-মামা-কাকী-জ্যেঠি-মামী বেরোবে ; ঠাকুর্দা-ঠাকুমা, দাদামশাই-দিদিমাও বেরোবে।

'নবৌ' বা বৌদিদি এবং 'ভিনিদেও' বা জামাইবাবুর সূত্রে নূতন নূতন সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। অসমীয়াতে 'বৌ' কথাটার অর্থ 'মা'। দাদার স্ত্রীকে মাতৃজ্ঞান করা হয়, নবৌ মানে আসলে নূতন মা। শ্বশুর-শাশুড়ীও জামাতাবাবাজীর কাছে, বধূমাতার কাছে—যথাক্রমে দেউতা (দেবতা-বাবা) ও আই (মা)। মোমাই (মামা) ও ভাগিন (ভাগ্নে) এবং ভিনিহি (ভগ্নীপতি) ও খুলশালীর (শ্যালিকা) মধ্যে সম্বন্ধ খুবই অন্তরঙ্গ। কাকা-কাকিমা, জ্যেঠা-জ্যেঠিমা, মামা-মামীর ছেলেরা ও মেয়েরা, মায়ের পেটের ভাই-বোনের মতোই ভাই ও বোন। বিভিন্ন সম্বন্ধ বাচক কয়েকটি অসমীয়া শব্দ এই ভাষার বৈশিষ্ট-সূচক। ভাইদের মধ্যে যে কনিষ্ঠ তাকে বলে 'ভাই', বয়োজ্যেষ্ঠকে 'ককাই'। কনিষ্ঠ বোনকে বলা হয় 'ভন্জী', বয়োজ্যেষ্ঠাকে বলে 'বাইদেউ'। 'মোমাই'-এর বদলে 'মামা'ও বলা হয়। তেমনি 'ককাই' বা 'ককাই-দেউ'-এর বদলে 'দাদা'। 'মোমাই'-এর পত্নী 'মাই' কিন্তু 'মামা' বললে তিনি 'মামী' যে-কোন অচেনা অজানা লোক যে কোন গাঁয়ের লোকের সঙ্গে আলাপ জমাতে পারে, তাকে 'ককাই' বলে সম্বোধন করলে। গ্রামের মেয়েরা প্রতিবেশিনী বয়ো-জ্যেষ্ঠাদের ডাকে 'বাই' বলে। বাড়ীর ঝিকেও গৃহকর্তার ছেলেমেয়ে বলে 'বাই'। অসমীয়া গৃহস্থালীর ঝি চাকরেরা বাড়ীর ছেলেমেয়েদের মতোই কর্তাকে বলে 'দেওতা' এবং কর্ত্রীকে 'আই'। এর কারণ আগেকার দিনে আসামে যখন দাসপ্রথা প্রচলিত ছিল, দাসদাসীরা ছিল একপ্রকার পরিবারভুক্ত মানুষজন।

অতঃপর সাধারণ একটি অসমীয়া বিবাহের বর্ণনা দেওয়া যাক। পাত্রপক্ষ থেকে প্রস্তাব এলে পর পাত্র-পাত্রীর কোষ্ঠিবিচার বা যোটকবিচার করা হয়। মিল যদি দেখা যায় তবে বিবাহের আয়োজন করা হয়, নতুবা প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়। আনুষ্ঠানিক বিবাহে যদি বিলম্ব থাকে, প্রস্তাবটা পাকাপাকি করার জন্য পাত্রীর আঙুলে একটি নূতন আংটি পরিয়ে দেওয়া হয়। বিবাহ অনুষ্ঠানের ব্যাপারটা কন্যা সম্প্রদানের দু-তিন দিন আগের থেকেই আরম্ভ হয়। প্রথম দিন কন্যার বাড়ীতে তত্ত্ব পাঠানো হয় বা 'জোরোণ' দেওয়া হয়। পাত্রের বাড়ী থেকে একদল সধবা ও কুমারীরা যায় কন্যার বাড়ী এবং আনুষ্ঠানিক ভাবে তাকে বিয়ের সাজ-পাট গয়না-গাঁটি পরিয়ে দেয়। তত্ত্বের মধ্যে থাকে তিন থেকে পাঁচ জোড়া জামা-কাপড়, তার মধ্যে এক জোড়া কন্যার মায়ের জন্য। এইদিন থেকে বিয়ের দিন পর্যন্ত বর-কনেকে প্রতিদিন আনুষ্ঠানিকভাবে স্নান করতে হয়—এই স্নানকে বলে 'নোওয়া' বা নোওনি'। এই 'নোওনি' বা স্নানপর্বের জন্য পাড়ার এয়োতীরা শোভাযাত্রা সহকারে 'বিয়ানাম' অর্থাৎ বিয়ের গান গাইতে গাইতে নদী কিংবা পুকুর থেকে একটা বিশেষ ধরনে জল

তুলে আনে, একে বলে 'পানী তোলা'। দ্বিতীয় দিনের রাতটা অর্থাৎ বিবাহের আগের রাত হল অধিবাস। এই দুটো দিন বর-কন্যা ও তাদের মায়েরা উপবাসে থাকে। অধিবাসের যাবতীয় অনুষ্ঠান পালনের জন্য একজন পুরোহিত নিয়োগ করা হয়। তিনি দেবতাদের কাছে চাল, ডাল নিবেদন করে পূজা করেন, ও দেবতাদের প্রসাদী চাল-ডাল সকলকে বিতরণ করে দেন। এই প্রসাদ ভক্ষণের পর যারা উপোস করে আছে, তারা রাতে নিরামিষ আহার গ্রহণ করতে পারে। পূজা শেষ হয়ে গেলে পর এয়ো-স্ত্রীরা 'গাঠিয়ন খুন্দা' অনুষ্ঠান পালন করে। গাঠি হল আম-আদা জাতীয় কোনো গাছের সুগন্ধি মূল। চারি দিকে চাদরের আড়াল দিয়ে মেয়েরা শিলনোড়া দিয়ে হলুদ বাটার মতো 'গাঠি' বেটে, বিয়ের গান গাইতে গাইতে সেই বাটনা বরের মাথায় কিংবা কনের মাথায় চাপিয়ে তেল মাখিয়ে দেয়। এটা হল পবিত্রীকরণ প্রক্রিয়া। এই অধিবাসের রাতে নিরামিষ ভোজনের পর বর-কনে কিংবা তাদের মা-বাবা তাদের যথা নিয়মিত আহার গ্রহণ করতে পারে না। বিবাহের অর্থাৎ তৃতীয় দিনের ভোরবেলায় 'দৈয়ন দিয়া' অনুষ্ঠান পালিত হয়। বর বা কন্যাকে শোবার ঘরের দোরগোড়ায় বসিয়ে দেওয়া হয় ; প্রবীণা কোন আত্মীয়া সামনে বসে দু'হাতে দুখানা পানের পাতা নিয়ে এক বাটি দইয়ের মধ্যে (দই থেকে দৈয়ন-ডুবিয়ে পানের পাতা দুটি বর-কনের গালে, হাতে ও পায়ে উপর থেকে নিচের দিকে বুলিয়ে দেন। তারপর একবার 'নোওয়া'-র পর উর্ধতন নবম পুরুষের শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। কন্যার বাড়ী যাত্রার প্রস্তুতির আনুষঙ্গিকরূপে বরকে আর একবার স্নান সেরে নিতে হয়। বিবাহ-লগ্নের একটু আগে বর সদলবলে পাত্রীর বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হয়। সুসজ্জিত তোরণদ্বারের সামনে ভাবী শাশুড়ী আনুষ্ঠানিক ভাবে বরকে সম্বর্ধনা করেন। বরের মাথার উপর মুঠো মুঠো চাল ছিটানো হয় যাতে ভূতপ্রেত পালিয়ে যায়। প্রায়ই দু'পক্ষের ছেলেরা মুঠো মুঠো চাল ছুঁড়ে দেয় অপর পক্ষের সুন্দরী মেয়েদের লক্ষ্য করে। তারপর বরকে নিয়ে যাওয়া হয় চাঁদোয়ার তলায় বিবাহ মণ্ডপে হোম অনুষ্ঠানের জন্য। স্ত্রীলোকেরা সর্বক্ষণ ধরে 'বিয়ানাম' অর্থাৎ বিয়ের গান গাইতে থাকে, এক পক্ষ অপর পক্ষকে ঠাট্টাতামাশা করে--বর কিংবা কন্যা কিংবা তাদের ছোট ভাইবোনকে নিয়ে। যথাসময়ে কন্যাকে মণ্ডপে আনা হলে পর পুরোহিত বৈদিক মতে বিবাহ-অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। কন্যার পিতা কন্যাকে সম্প্রদান করেন। বরের বাড়ি ও কনের বাড়ি উভয় জায়গাতেই নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের জলযোগ দ্বারা আপ্যায়ন করা হয়। বিবাহকার্য সম্পন্ন হয়ে গেলে পর বরপক্ষ কন্যাকে বরের বাড়ি নিয়ে যায়। সেইদিন থেকেই কন্যাকে শ্বশুরঘর

করতে হয়—এমন নয়, স্বামীর বাড়ীতে পা দিয়ে আবার বাপের বাড়ী ফিরে আসতে পারে। তবে দুই বাড়ীর মধ্যে ব্যবধান যদি সুদীর্ঘ হয় তাহলে বিয়ের পর থেকেই কন্যা শ্বশুরবাড়ীতে থেকে যায়। বিয়ের তৃতীয় দিনে সন্ধ্যাবেলা একজন পুরো-হিতের সাহায্য নিয়ে খোবা ও খুবুজী নামে দুই কাল্পনিক দৈত্যকে পূজা করা হয়, যাতে বিবাহিত জীবনের পথ নিষ্কণ্টক হতে পারে।

বিবাহে যৌতুকস্বরূপ টাকা পয়সা দাবী করা হয় না। কিন্তু মেয়ের বাবা বিবাহিত জীবনে আবশ্যক হতে পারে এইরকম যাবতীয় জিনিস যৌতুকস্বরূপ দান করেন, যথা বিছানাপত্র, কাপড়-চোপড়, বাসন-কোষন, বাক্সপেটরা, এবং সকল সাজ-সরঞ্জাম সহ একটা তাঁত। বিবাহ সফল হয়েছে কি বিফল হয়েছে, গ্রাম্য মেয়েরা তার হিসাব করে যৌতুকস্বরূপ কিংবা উপহারস্বরূপ বাসনকোষনের সংখ্যা দেখে।

ব্রাহ্মণ কায়স্থদের মধ্যে, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে, এখনো কিছু পরিমাণে বাল্যবিবাহ প্রচলিত আছে। ব্রাহ্মণেরা কন্যার বিবাহে তিনটি পর্যায়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আচার অনুষ্ঠান পালন করে: কন্যা ঋতুমতী হবার পূর্বে, কন্যা ঋতুমতী হবার পরে এবং কন্যা সন্তানবতী হবার সময়ে। ব্রাহ্মণেরা বিধবাদের পুনর্বিবাহ হতে দেন না যদিচ আর কয়েকটি সম্প্রদায়ে বিধবাবিবাহ অপ্রচলিত নয়। কিন্তু অব্রাহ্মণ বিধবার পুনর্বিবাহে সাধারণ বিবাহের সকল রকম অনুষ্ঠান পালন করা হয় না। বিবাহ অনুষ্ঠানকে প্রায় ধর্মানুষ্ঠানের মতো পবিত্র জ্ঞান করা হয়, সেইজন্য বিবাহ বিচ্ছেদের কথা মনেও আনা হয় না, সমর্থন করা তো দূরের কথা। এক পত্নী গ্রহণই বিবাহের সাধারণ নিয়ম, যদিচ কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় পুরুষ একাধিক পত্নী গ্রহণ করেছে।

কোন কোন অসমীয়া গ্রামে 'ঢোকা' বা চপনীয়া' বলে এক ধরনের পুরুষ দেখা যায়, যারা বিধবার বাড়ীতে স্বামী হয়ে ঢোকে। এই প্রথাকে লোকে যে কত হীন চোখে দেখে, তা ঢোকা' (ঢুকে পড়া) ও চপনীয়া (গা ঘেঁষে থাকা) এই দুটি তাচ্ছিল্যসূচক কথা থেকেই প্রমাণিত। অপর পক্ষে বিপত্নীক কোন ব্যক্তি কোন বিধবা স্ত্রীলোককে স্ত্রীরূপে ঘরে আনতে পারে। এইরকম স্ত্রীলোককে বলা হয় 'বাটলু' অর্থাৎ পথে কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ে।

এই ধরনের বিয়েতে কয়েকটি মাত্র আচার পালন করা হয়, সাধারণ বিয়ের আড়ম্বরা তাতে থাকে না। কেউ কেউ অনুমান করেন এইসব বিরল প্রথা হয়তো অতীতের কোন কোন জনজাতীয় প্রথার সাক্ষ্য হতে পারে। বোড়ো সমাজে 'ঢোকা'-র গ্লানিকর অবস্থাটা খুবই কৌতূহল উদ্দীপক। যে রাতে বিপত্নীক ব্যক্তিটি

বিধবা স্ত্রীলোকের বাড়ী আসে, স্ত্রীলোকটি এক বাটি মোরগের ভাজা মাংস ও এক বাটি ধেনো মদ রেখে দেয় তার শোবার ঘরে চৌকাঠের সামনে এবং নিজে একটি ছোট বাতি জ্বালিয়ে লাঠি হাতে বাইরে বসে থাকে। লোকটি এসে বাড়ীর চারপাশে সাতপাক ঘোরে হুলো বেড়ালের মতো মেঁও-মেঁও ক'রে। প্রত্যেক পাকের শেষে যখন চৌকাঠের সামনে দাঁড়ায় স্ত্রীলোকটি লাঠির শব্দ করে তাকে তাড়িয়ে দেয়। সপ্তম বারের পর মেয়েটি প্রশ্ন করে লোকটি কি তার ছেলেমেয়ের বাপ অর্থাৎ তার ভূতপূর্ব স্বামী ? লোকটি জবাব দেয়, হ্যাঁ। তখন সে ঘরে ভিতর ঢুকতে পায়। ঘরে ঢুকে সে সেই মদমাংস খায় এবং আরো কয়েকটি আচার অনুষ্ঠান পালন করার পর সেই ঘরের গৃহস্থ বলে গণ্য হয়। স্ত্রীলোকটি 'ঢোকা' ব্যক্তিটিকে তার ভূতপূর্ব স্বামীর সঙ্গে অভিন্ন বলে মেনে নেয়—এই হল প্রচলিত ধারণা। ঢোকা তার নিজের গৃহসম্পত্তি চিরতরে ত্যাগ করে আসে, তাতে তার আর কোন অধিকার থাকে না। বোড়ো লেখক ভবেন্দ্র ব্যানার্জি বলেন, সম্ভবত এই প্রথাটি বোড়োদের প্রাচীনকালের মাতৃপক্ষীয় উত্তরাধিকারের অন্যতম প্রমাণ। ঢোকা-প্রথার প্রসঙ্গ বাদ দিলে দেখা যায় যে সাধারণত বোড়োরা তাদের বিধবা স্ত্রীলোকদের রক্ষণাবেক্ষণে বেশ তৎপর। বোড়ো বিধবাকে পুণর্বিবাহে রাজী করানো সহজ নয়, বার বার অনুনয় বিনয় করা সত্ত্বেও কুপিত প্রত্যাখ্যান ছাড়া আর কোনো সাড়া পাওয়া যায় না। সেইজন্যই একটি প্রবচনের সৃষ্টি হয়েছে : পুরনো বাড়ীতে হাত দিও না, ঘেঁষো না বিধবার কাছে।

সামাজিক ভাবে স্বীকৃত বোড়োদের বিবাহ-পদ্ধতি সকল গ্রামেই প্রায় একই ধরনের যদিচ গোষ্ঠীভেদে কয়েকটি আচার-অনুষ্ঠানে সামান্য ইতরবিশেষ হয়ে থাকে। বোড়ো মুরুব্বীরা ছেলেমেয়েকে নিজেদের জীবনসঙ্গী বেছে নেবার অধিকার দেয় না। বয়োজ্যেষ্ঠরা বাছাবাছি-পর্ব সমাধা করার সঙ্গে সঙ্গে বিবাহ অনুষ্ঠানের কাজ শুরু হয়ে যায়। জ্যোতিষীদের সঙ্গে পরামর্শ করা হয় না। কোন একটা শুভদিন দেখে বরের বাড়ীর লোকেরা মেয়ে দেখতে যায়, কতকগুলি মামুলী পরীক্ষা ও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে তারা মেয়ের রূপগুণ ও স্বভাবচরিত্র বিষয়ে একটা ধারণায় পৌঁছায়। মেয়ে যদি পছন্দ হয়, তাহলে তারা একজোড়া রূপোর খাড়ু মেয়ের বাড়ির চালে গুঁজে আসে, নয়তো দু-বোতল মদ ঝুলিয়ে রেখে আসে বাড়ির খুঁটোতে। রূপোর খাড়ু জোড়া কিংবা মদের দুটি বোতল যদি পরের সপ্তাহে ফেরৎ না আসে, তাহলে বুঝতে হবে মেয়ের বাড়ির সম্মতি আছে। মেয়ে যদি অন্য কোন খেল' বা গোষ্ঠীর হয়, তাহলে ছেলের বাড়িকে সেই গোষ্ঠীর রীতি রেওয়াজ গ্রহণ করতে হয়—যাতে

নববধূকে কোন অসুবিধায় না পড়তে হয়। বিয়ের আগে ছেলেকে যেতে হয় মেয়ের বাড়িতে, যাতে সে বাড়ির লোকে দেখে নিতে পারে ছেলে দেখতে শুনতে কেমন। আসলে এই দেখাশোনার সূত্রে ছেলে ও মেয়ে পরস্পরকে বুঝেসুঝে নেবার একটা সুযোগ পায়। ছেলেকে মেয়ে নিজের বোনা গামছা, নিজের হাতে সেলাই করা রুমাল প্রভৃতি দিয়ে নমস্কার করে। মেয়ে যদি এসব কিছু না করে তাহলে বুঝতে হবে ছেলে তার পছন্দ হয়নি। তাহলে বিয়ে ভেঙে দেওয়া হয়। মেয়ের বাড়িতে তত্ত্ব পাঠানো হয় সাধারণ অসমীয়া বিয়ের মতই—কেবল বরপক্ষের তরফ থেকে কনের গ্রামের সকল লোককে 'জুমাই' বা চা পরিবেশন করে আপ্যায়ন করতে হয়। বোড়োদের মধ্যে যারা হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করেছে তারা আর্য মতে বিবাহের উৎসব উদ্‌যাপনের জন্য পুরোহিত নিয়োগ করে। অন্যেরা নিজেদের আড়ম্বরপূর্ণ জনজাতীয় রীতি পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে। মহাসমারোহে ভোজ খাওয়া হয় ও নাচগান হয়। বরযাত্রীদের সঙ্গে দু'জন পুরুষ নাচিয়ে কন্যার বাড়ি যায়। বিয়ের পর কনেকে যখন বরের বাড়ি নিয়ে আসা হয়, সারা রাস্তা সেই দুই নাচিয়ে নাচতে নাচতে বরকনেকে এগিয়ে আনে। সঙ্গে যারা থাকে তারাও সেই নাচে যোগ দেয়। মেয়ের গ্রাম থেকে যেসব স্ত্রীপুরুষ মেয়ের সঙ্গে বরের বাড়ি যায়, তারা নিজেদের বাড়িতে ফিরে যাবার আগে বরের বাড়িতে খুব এক পেট ভোজ খেয়ে নেয়।

বোড়োরা চায় না যে তাদের ছেলেমেয়ের বিয়ে অন্য কোন জাতির সঙ্গে হয়। তাদের মতে শনি ও মঙ্গলবার এবং মাঘ ও চৈত্র মাস বিয়ের পক্ষে অনুপযোগী। রবিবারই বার হিসাবে প্রশস্ত। তারা মেয়ের বিয়েতে টাকা নেয়। যৌতুক দেওয়া নেওয়ার ব্যাপারটা পাকাপাকি হয়ে যাবার পর বিবাহ সম্পন্ন হয়। কখনো কোন পিতৃমাতৃহীন কিংবা অভিভাবকহীন অনাথ ছেলেকে ঘর-জেঁায়াই (ঘরজামাই) করে রাখা হয়। কিঞ্চিৎ বিরলরূপে এই প্রথাটি অন্যান্য অসমীয়া সম্প্রদায়ের মধ্যেও দেখা যায়। কখনো কখনো কোন বোড়ো যুবতী যে-ছেলেকে ভালোবাসে স্বেচ্ছায় সেই ছেলের বাড়ি চলে আসে—যাতে তাদের বিয়ে হতে পারে। ছেলের বাবা-মা তখন মেয়ের অভিভাবককে খবরটা দেয়। কন্যাপক্ষ যদি সাড়া না দেয় তা হলে তাদের জরিমানা করা হয়। কন্যাপক্ষের লোক এসে মেয়েটিকে তার বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। সে যখন আবার ছেলের বাড়িতে চলে আসে তাদের বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়। পালিয়ে গিয়ে কিংবা বল প্রয়োগ করে বিয়ে করার ঘটনা যে একেবারে না হয় এমন নয়, তবে এই ধরনের অঘটনকে সমাজ ভালো চোখে দেখে না, নিরুৎসাহিত করে।

যদিচ আহোমরা প্রথম যখন আসামে আসে স্ত্রী-রূপে গ্রহণ করে স্থানীয় মেয়েদের, তাদের ভিন্ন ভিন্ন 'ফৈদ' বা বংশ সম্পর্কিত রীতি-নিয়ম পালনে তারা খুবই কড়া। নিজ বংশে বা সগোত্রে বিবাহ তারা নিষিদ্ধ করত। কোন প্রকারে এইরকম বিয়ে ঘটলেও সেই বিয়ে থেকে উপজাত সন্তানেরা সমাজে তেমন মর্যাদা পেত না। আহোমরা এখনো এইসব রীতিনীতি মেনে চলে। তবে অতীত যুগের সাক্ষ্যরূপে এখনো দুয়েকটা পালিয়ে গিয়ে কিংবা বলপ্রয়োগে বিয়ে করার ঘটনা ঘটে থাকে। 'সক্‌লং' প্রথা এখনো আহোম সমাজে প্রচলিত বিবাহ-প্রথা। 'সক্‌লং' মানেই বিয়ে। আহোম বিবাহে যেসব আচার-অনুষ্ঠান মেনে চলা হয় তার অধিকাংশই অন্যান্য অসমীয়া সম্প্রদায়ের রীতিনীতির অনুরূপ। অসমীয়া হিন্দুরা যেমন বিয়ের দু'দিন আগে নানাবিধ বস্ত্রালঙ্কারের তত্ত্ব পাঠিয়ে, মেয়েকে বিয়ের জোড় আনুষ্ঠানিকভাবে পরিয়ে আসে—আহোম বিয়ের বরপক্ষ ঠিক তেমনি করে থাকে। তদুপরি ইতিপূর্বে উল্লিখিত অসমীয়া বিবাহের 'দৈয়নদিয়া' ও 'গঠিয়ন খুন্দা' অনুষ্ঠান, আহোম বিবাহেরও অঙ্গবিশেষ। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে আহোম 'সক্‌লং'-এ তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলি সংরক্ষিত। ভালো পাত্রীর সন্ধান পেলে বরের বাড়ির লোকেরা 'সোধনী-ভার' (সুধোবার বস্তুসম্ভার) নিয়ে মেয়ে খুঁজতে বেরোয়। 'সোধনী-ভার'-এ থাকে পান, সুপুরি, চাল, হাঁস ইত্যাদি। যদি পাত্রপক্ষের সম্পর্কে আপত্তিকর কিছু না থাকে, তা হলে ছেলের ঘরদোর দেখবার জন্য একটা দিন স্থির করে কন্যাপক্ষের লোকেরা ছেলের বাড়ি যায়। তারা এলে পর বরপক্ষ যথেষ্ট সমাদরে তাদের আপ্যায়ন করে। তখন বিয়ের জন্য একটা শুভ দিন বেছে নেওয়া হয়। সক্‌লং বিয়েতে বিবাহ-অনুষ্ঠানের তিন, পাঁচ, সাত বা নয় দিন আগে, বিশেষভাবে তোলা জলে ছেলেকে ও মেয়েকে আনুষ্ঠানিক ভাবে স্নান করাতে হয়। এ অনুষ্ঠান অসমীয় বিয়ের 'নোওয়া' বা 'নোওনি'-র অনুরূপ।

সক্‌লং বিয়েতে আহোম-পুরোহিত তাঁদের নিজেদের শাস্ত্র থেকে মন্ত্র পাঠ করেন। পি. আর. গর্ডন তাঁর লিখিত বিবরণে সক্‌লঙের একটি সুস্পষ্ট ছবি তুলে ধরেছেন : 'বর এসে বসে কনের বাড়ির উঠানে। কনেকে ঘর থেকে বাইরে এনে বরের চার পাশে সাতপাক ঘোরানো হয়। তারপর তাকে বসানো হয় বরের পাশে। এরপর দুজনেই উঠে গিয়ে অভ্যাগতদের দৃষ্টির বাইরে একটি কোঠায় ঢোকে। সেখানে চাদরের একটা প্রান্ত বেঁধে দেওয়া হয় মেয়ের গলায় এবং অপর প্রান্ত ছেলের কোমরে। অতঃপর তারা কোঠার একটি কোণে বসে, কাছাকাছি থাকে কলাপাতার উপরে রাখা নয়টি জলভরা ঘট। এবার উৎসবের পুরোহিত সিরিং ফুকন সক্‌লং পুঁথি

পাঠ করেন। তিনটি বাটিতে দুধ, মধু ও ভাপে সেদ্ধ চালের পিঠে রেখে যথাক্রমে বর ও কনেকে শুঁকতে দেওয়া হয়। বাঁশ বা বেতের ঝুড়ি ভর্তি করে চাল এনে রাখা হয় বর কনের সামনে। পরস্পরের মধ্যে কাটারী-বিনিময় পর্ব শেষ হলে পর, প্রথমে বর ও তারপর কনে পরস্পরের অগোচরে আংটি লুকিয়ে রাখে। সেই চালের মধ্যে বর রাখে কনের আংটি, কনে রাখে বরের। এই খেলার উদ্দেশ্য হল চালের মধ্যে আঙুল চালিয়ে একজন আরেকজনের রাখা আংটি খুঁজে বের করে নিজ আঙুলে পরবে। কাটারী ও আংটি বিনিময় বিবাহবন্ধনের প্রধান অঙ্গ। এই খেলা শেষ হলে পর বর কনেকে কোঠা থেকে বের করে বিবাহ সভায় নিয়ে যাওয়া হয়। তারা তখন কন্যার মা-বাবাকে ও উপস্থিত বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রণাম করে। অতঃপর বিবাহকার্য সম্পূর্ণ হয়।'

বিয়ের দু'দিন আগে পুরোহিত সিরিং ফুকন নদী কিংবা পুকুরের পারে গিয়ে, আহোম-দেবতা খোয়াখাম-কে চাল, তাম্বুল-পান প্রভৃতি উৎসর্গ করে পুজো দেয়। তারপর 'জোকাই' বা পলো তিনবার জলে চুবিয়ে মাছ ধরে। যদি মাছ পাওয়া যায় —সেই মাছ রেঁধে বর ও কন্যার মুখে ছুঁইয়ে দেওয়া হয়। এটা করা হয় অঘটন বা অমঙ্গল রোধ করার জন্য। আনুষ্ঠানিক স্নানের জন্য 'নোওয়া' জল ও মন্ত্রসিদ্ধ করে ও ওষধি-গুণ-সম্বলিত লতাপাতা দিয়ে পবিত্র করে নেওয়া হয়। বিয়ের আগের দিনটাতে 'দেওবান' উৎসব ক'রে বিভিন্ন আহোম দেবতাদের পুজো দেওয়া হয়। পুরোহিতকেও চাল ও তাম্বুল-পানের সিধে দিয়ে পুজো করা হয়। পুরোহিতও বরকনেকে বিবাহিত জীবনের কর্তব্য ও দায়িত্ব বিষয়ে আহোম শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে পাঠ করে উপদেশ দেন। দুই পরিবারের ঊর্দ্ধতন সাত পুরুষের 'বুরঞ্জী' বা ইতিহাস তাদের শোনানো হয়। অতঃপর বরকনেকে কনের বাড়ীর ভিতরে নিয়ে গিয়ে অঙ্গুরীয়-বিনিময়, পঞ্চামৃত পান, পাশা বা কড়ি খেলা প্রভৃতি অনুষ্ঠান পালন করা হয়।

বিয়ের কয়েকটি আচার আসামের জনজাতীয় সমাজের বৈশিষ্ট্য বলে ধারণা হয়—যথা কন্যাকে 'গা-ধন' অর্থাৎ যৌতুকস্বরূপ টাকা পয়সা দেওয়া, ঘরজামাই রাখা এবং একই 'কৈদ' অর্থাৎ সগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ করা। মিরিরা মনে করে আকাশে যত দিন চন্দ্রসূর্য থাকবে একই 'খেল' বা গোষ্ঠীতে কিছুতেই বিবাহ হতে পারে না, কারণ একই 'খেল'-এর লোকেরা পরস্পরের ভাইবোন। মিরিদের বিবাহ পদ্ধতি আসামের অন্যান্য হিন্দুদের মতোই। তাদের মধ্যেও কন্যাকে বস্ত্রালঙ্কার পাঠিয়ে 'জোরোন' বা তত্ত্ব দেওয়া হয়, তাদের মধ্যেও পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করার প্রথা

আছে। এই নিয়ে কিছু বাদবিসম্বাদ হলে মীমাংসা করে সমাজবৃদ্ধেরা একত্র হয়ে, তাদের 'কেবাং' সভাতে।

দেউরীদের বিয়ে হয় কেবল নির্দিষ্ট 'ফৈদ' বা গোষ্ঠী গোত্রীয়দের সঙ্গে। কোন হৈ হৈ আড়ম্বর না করে দেউরী বিধবারা পুনর্বার বিবাহ করতে পারে। বিবাহ-বিচ্ছেদ নিষিদ্ধ। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কন্যার জন্য 'গা-ধন' বা যৌতুকস্বরূপ টাকা-পয়সা নেওয়া হয়। কন্যা ঋতুমতী হলে অন্যান্য কোন কোন অসমীয়া সম্প্রদায় তাকে নারীত্বে তোলার জন্য যে 'তোলনী' বিয়ার ব্যবস্থা করে, দেউরীদের মধ্যে তার প্রচলন নেই। দেউরী সমাজে ভাশুর ও ভাদ্রবৌয়ের মাঝখানে দুস্তর ব্যবধান রক্ষিত হয়, ভাদ্রবৌয়ের বাপের বাড়ি থেকে আনা বাসনকোষণ পর্যন্ত ভাশুর ছোঁয় না।

মিকিরদের মধ্যেও একই 'ফৈদ'-এর মধ্যে বিয়ে নিষিদ্ধ। কোন পুরুষ যদি অবিবাহিত কুমারীর সঙ্গে অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত থাকে তাহলে, গ্রামের মোড়ল 'গাঁওবুঢ়া' দণ্ড দেন, পুরুষটি যদি নিজে বিবাহিত হয় তা হলে দণ্ড বেশি হয়। উপযুক্ত কারণ বিনা পুরুষ স্ত্রীকে ত্যাগ করতে পারে না। কুমারী মেয়ের জীবন নষ্ট করাটা মিকির সমাজে ক্ষমার্হ নয়। বিবাদ-বিসম্বাদের কোন ঘটনা ঘটলেই অন্যান্য অঞ্চলের গ্রাম পঞ্চায়েতের ধরনে মিকির সমাজের গ্রামবৃদ্ধেরা একত্র হয়ে প্রচলিত প্রথা অনুসারী একটি কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। কিছু কিছু কড়াকড়ি থাকলেও মিকির সমাজ-জীবন অনেক পরিমাণে খোলামেলা। আব্রু প্রায় নেই বলা চলে। পুরুষ-নারীকে গণ্য করা হয় জীবনের পথে সহযাত্রীরূপে। গ্রামের ছেলেমেয়েরা পরস্পরের সঙ্গে বেশ খোলাখুলি মেলামেশা করতে পারে। ছেলে তার মামার মেয়েকে বিয়ে করতে পারে। বিয়ের কথা প্রথম পাড়ে মেয়ের বৌদিদি ও মেয়ে। তারপর আসে নিয়মিত প্রস্তাব এবং সেই সঙ্গে আহোমদের মতো 'শোধনী-ভার', ছেলের বাড়ি থেকে বস্তুসম্ভার বহন করে বরপক্ষের লোক আসে কন্যাপক্ষের মতামত শুধোতে। অতঃপর স্থির হয়ে ছেলে 'ঘরজোয়াই'-রূপে শ্বশুর বাড়িতে থাকবে কিনা। সেই প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে গেলে পর বিয়ের দিন নির্দিষ্ট করা হয়। এই ধরনের আলাপ আলোচনার প্রত্যেকটি স্তরে দুটি লাউয়ের কমণ্ডলুতে দু'রকম মদ নিয়ে যাওয়া হয় মেয়ের বাড়ি। মিকির বিয়ের সমস্তটাই অনুষ্ঠিত হয় গীতিময় ভাবে। প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানের সঙ্গে তার উপযোগী গান গাওয়া হয়—যেমনটা হয় তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানেও।

আসামের জনজাতীদের মধ্যে রাভাদের কতকগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, তাদের সমাজে বিধবা-বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদ ব্যাপারে

বেশ উদারভাবে অনুমতি দেওয়া হয়। স্বামী-স্ত্রী দুজনার মধ্যে যে বিচ্ছেদ ঘটাতে চায়, তাকে গ্রামের 'মুখিয়াল' অর্থাৎ মুরুব্বিদের কাছে হাজির হয়ে, কারণ দর্শিয়ে অনুমতি চাইতে হয়। অনুমতি পেলে বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য নির্ধারিত 'পাণফলা' (পান ফালা) অনুষ্ঠান পালিত হয়। মাথার উপর একখানা পানের পাতা ধরে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের পিঠাপিঠি দাঁড়ায়, তারপর গ্রামের সর্বপূজ্য 'বুঢ়ামেথা'র নির্দেশ মতো একই সঙ্গে দু'দিক থেকে টেনে দু-ভাগ করে ফেলে, সেই সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। যে ব্যক্তি পানপাতার বড়ো ফালিটুকু হাতে পায় তার নাকি কপাল ভালো—সে পুনর্বিবাহ করতে পারে। বিবাহ বিচ্ছেদে অনিচ্ছুক পক্ষকে অপরপক্ষ জরিমানা স্বরূপ টাকা পয়সা দেয়। রাভা সমাজে মেয়ের বিয়েতে 'গা-ধন অর্থাৎ যৌতুকস্বরূপ টাকা নেবার প্রথা আছে। কন্যার বাড়ির বিবাহ সভায় রাভা বর আসে লম্বা ও ঢিলে একটি জোব্বার মতো জামা পরে, মাথায় শাদা টুপি এবং কোমরে ঢাল-তরোয়াল গুঁজে। ডক্টর ভুবনমোহন দাসের ধারণা, আদিতে রাভারা মাতৃপক্ষীয় উত্তরাধিকার মেনে চলত, পরে তারা পিতৃপ্রধান প্রথা গ্রহণ করে। এখনো ছেলেমেয়েরা মাতৃকুলের নাম নেয়, আবার পিতার সম্পত্তি পায় পুত্রেরা এবং সকল ধর্মানুষ্ঠানে পিতাই হন পরিবারের মুখ্য ব্যক্তি। কালে ভদ্রে দেখা যায় বর এসে বসবাস করছে স্ত্রীর পরিবারে, কিন্তু সচরাচর মেয়েকেই যেতে হয় স্বামীর ঘরে। একই গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। এক শ্রেণীর রাভারা তাদের 'খক্‌সি' পুজোতে তরুণ-তরুণীদের অবাধ মেলামেশার স্বাধীনতা দেয়, তখন তারা পুজোর রাতটায় মনের সাধ মিটিয়ে নৃত্যগীত করে, ঘুমোতে যায় না। এই রকম মেলামেশার সূত্রে তারা নিজেদের জীবনসঙ্গী বেছে নিতে পারে।

লালুংদের কয়েকটি আচার থেকে দেখা যায়, নারীর সম্মানের উপর তারা বেশ গুরুত্ব দেয়। সুদূর অতীতে তাদের সমাজ মাতৃশাসিত ছিল কি না বলা শক্ত। তারা সীন্টেংদের নিকটবর্তী অঞ্চলে বসবাস করে ও তাদের সঙ্গে বহুকাল নিকট সম্পর্ক রক্ষা করে এসেছ। সিন্টেংরা মাতৃপক্ষীয় উত্তরাধিকার মেনে চলে। লালুংদের স্ত্রীলোক-সম্পর্কিত ধর্মীয় কাজ পরিচালনা করেন তাদের মহিলা পুরোহিতেরা। আগেকার দিনে লালুং রাজারা যখন রাজ্য শাসন করতেন, রাজকুমারীর ছেলেই সিংহাসনে বসত। লালুংদের যে বারোটা 'ফৈদ' অর্থাৎ গোষ্ঠী বা গোত্র আছে বারোজন মেয়ে থেকে তাদের উদ্ভব হয়েছে বলা হয়। লালুং মেয়েদের মধ্যে যারা অবিবাহিত অথবা যাদের স্বামী তাদের বাপের বাড়িতে ঘরজামাই, তারাই পৈতৃক সম্পত্তির অংশ পায়। সেক্ষেত্রে অবশ্য ঘরজামাইকে তার নিজের পৈতৃক সম্পত্তির

অধিকার ছেড়ে দিতে হয়। লালুংরা হিন্দুধ অবলম্বন করেছে এবং তাদের সমাজে বিবাহের নিয়মকানুন অন্যান্য অসমীয়া হিন্দুদেরই মত—কেবল হোম অনুষ্ঠানটা তারা বাদ দেয়। একই 'ফৈদ'-এর মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ, এ নিয়ম যারা লঙ্ঘন করে সচরাচর তাদের গ্রাম থেকে বহিষ্কার করা হয়। আজকাল তারা যদি বিধিমত প্রায়শ্চিত্ত করে, তবে পুনরায় তারা সমাজে গৃহীত হতে পারে।

পূর্ব ভারতের পার্বত্য জনজাতিদের মধ্যে নেফা-অরুণাচলের মিশিমিরাই বোধহয় সামাজিক শাস্তিবিধানে সবচেয়ে কঠোর। মিশিমি সমাজে কোন মানুষকে কেউ যদি হত্যা করে, তাহলে মৃত ব্যক্তির 'খেল' বা গোষ্ঠী থেকে যে কোন একজন আততায়ীকে হত্যা করতে পারে। নিহত ব্যক্তি যদি দাস হয় তাহলে জরিমানা হিসাবে পাঁচটি বুনো মোষ দিতে হয়। তবে গৃহকর্তা যদি তার দাসকে হত্যা করে তাকে কোন দণ্ড দিতে হয় না। স্ত্রী যদি স্বামীর প্রতি অবিশ্বাসিনী প্রমাণিত হয়, তবে তার হাতের আঙুল কেটে ফেলা যেতে পারে। একজন পুরুষ যদি আর কারো স্ত্রীরসঙ্গে অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত হয়, তাকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ স্বামীকে জরিমানা দিতে হয়। মিশিমিরা বহুপত্নী গ্রহণ করার পক্ষপাতী—কোন কোন পুরুষের বারোটি পর্যন্ত স্ত্রী থাকে। গ্রামের মুরুব্বিরা পঞ্চায়েতে জড় হয়ে সকল রকম শাস্তির বিধান দিয়ে থাকে। কেউ যদি তাদের বিধান অনুযায়ী জরিমানা দিতে গররাজী হয়, তাহলে বিরুদ্ধপক্ষ তাকে আক্রমণ করতে পারে, এমন কি হত্যা পর্যন্ত করতে পারে। আগেকার দিনে টাংসুল নাগারাও শাস্তিবিধানে খুবই কঠোর ছিল, যৌনাপরাধের শাস্তি হিসাবে মৃত্যুদণ্ডেরও বিধান দিতে তারা ইতস্তত করত না। আজকাল কিন্তু কেবল জরিমানা করা হয়।

বৌদ্ধ ফাকিয়াল সমাজেও একাধিক পত্নী গ্রহণে অনুমতি দেওয়া হয়, বিধবা-বিবাহও সমর্থন করা হয়। তারা কিন্তু বাল্যবিবাহ হতে দেয় না। দেওর তার বিধবা বৌদিকে পত্নীরূপে গ্রহণ করতে পারে। অরুণাচলের আদি বা আবররা বিধবার পুনর্বিবাহে আপত্তি করে না, প্রাক-বিবাহ পর্বে প্রেম নিবেদনের ব্যাপারেও তারা যথেষ্ঠ স্বাধীনতা দেয়। আদিদের বিয়ের রীতি নিয়ম বেশ সহজ সরল : তরুণ তরুণী পরস্পরের প্রেমে পড়ে। জোট যদি দু'পক্ষের মা-বাবার পছন্দ হয় তাহলে ছেলে নিত্য আসে মেয়ের কাছে। ছ'মাস কাল এইভাবে কেটে যাবার পর তাদের একই শয্যায় শয়ন করার অনুমতি দেওয়া হয়। সন্তান হলে ধরে নেওয়া হয় বিবাহ সম্পন্ন হয়ে গেছে। তখন মেয়ের বাড়িতে ছেলে চিরকালের জন্য থেকে যেতে পারে অথবা স্ত্রীকে নিয়ে আসতে পারে নিজের বাড়ি। একই 'খেল'-এর মধ্যে কিংবা

নিকট সম্বন্ধ থাকলে বিয়ে হতে পারে না। গ্রামের সমস্ত বাদবিসম্বাদ গ্রামের পাঁচজন 'মুখিয়াল' পঞ্চায়েত বসিয়ে মীমাংসা করে। পঞ্চায়েতের অধিবেশনকালে আসামী পক্ষের কাউকে টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করতে দেওয়া হয় না। শাস্তি দেওয়া হয় বেত্রাঘাত করে কিংবা জরিমানা করে. দোষী ব্যক্তির আত্মীয়েরা জরিমানার টাকাটা আদায় দিতে পারে।

বিবাহের পর স্ত্রীলোকের জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল সন্তানের জন্ম। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মত আসামেও সেই বিশেষ দিনটির জন্য ভাবী মাকে অল্পে অল্পে প্রস্তুত করা হয়। বয়োজ্যেষ্ঠারা তার শরীর-স্বাস্থ্যের উপর নজর রাখে, তাকে কোন শারীরিক পরিশ্রমের কাজ করতে দেওয়া হয় না, অপরপক্ষে আলস্য-বিলাসে দিন কাটাতেও দেওয়া হয় না। গর্ভধারনের সময়টা স্বামী বা স্ত্রীর কোন প্রাণী হত্যা করাটা অনুচিত বলে একটা অন্ধবিশ্বাস আছে। স্ত্রী যদি চুল না বাঁধে 'খেতর' তার অপকার করতে পারে। তাকে তাঁত বুনতে কিংবা কাপড় সেলাই করতে দেওয়া হয় না, তাতে করে নাকি প্রসবের সময় বাধা ঘটতে পারে। পরিবারের সকলেই চেষ্টা করে তাকে আনন্দিত রাখতে। বয়স্থা স্ত্রীলোকেরা তার মনের মধ্যে একটা ধর্মভাব জাগিয়ে রাখতে চেষ্টা করে ধর্মপুস্তকাদি পাঠ করে। গর্ভাধানের দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় মাসে পুংসবন অনুষ্ঠান হয় ও ভাবী মাকে পঞ্চামৃত খাওয়ানো হয়। প্রথম সন্তান হবার জন্য মেয়ে যায় তার মায়ের বাড়ি। গৌতম বুদ্ধ ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন তাঁর মাতৃদেবীর মায়ের বাড়ি যাবার পথে—লুম্বিনি গ্রামে। গ্রামের ভাবী মায়েদের অভিজ্ঞ প্রবীণারা সাহায্য করে থাকেন, গ্রামের দাইরাও ধাত্রীবিদ্যায় নিপুণ। শিশু জন্মানোর পর একমাস কাল প্রসূতি অশুচি হয়ে থাকে বলে লোকের ধারণা, সেই একমাস বাড়ির কোন জিনিস তাকে ধরতে ছুঁতে দেওয়া হয় না। তার কাছাকাছি একখানা মাটির পাত্রে তুষ কিংবা ঘুঁটের আগুন সর্বক্ষণ জ্বালিয়ে রাখা হয়—যাতে ভূতপ্রেত কাছে আসতে না পারে। একমাস গত হলে শুদ্ধি পূজা অনুষ্ঠিত হয়, তখন মা ও শিশুকে শুদ্ধ বা শুচি করে নিয়ে অন্য সকলের সঙ্গে মেলামেশা করতে দেওয়া হয়। ক্ষুর দিয়ে শিশুর চুল কামিয়ে ফেলা হয়। গোবরের সঙ্গে সেই চুল মিশিয়ে বাড়ির সদর দরজার কাছে দেয়ালে এমনভাবে টাঙিয়ে রাখা হয় যাতে সকলেই দেখতে পায়। লালুংরা গোবর মাখা চুলগোছার সঙ্গে একটি কড়িও রাখে। কেন তারা এমন করে নিশ্চয় করে বলা শক্ত—হয়ত এমনটা করে শিশুর দীর্ঘায়ু কামনায়—কারণ কড়ি হল উর্বরতার প্রতীক। লালুংদের সমাজে আরো একটি আশ্চর্য রীতি আছে : শিশুকে স্নান করিয়ে শুদ্ধ করে রাত্রি প্রভাতে তাকে বাইরে এনে পুবমুখো

অবস্থায় রেখে, মহিলা পুরোহিত একজন বিশেষ ভাবে তৈরি ধনুর্বাণ শিশুর হাতে স্পর্শ করিয়ে, শিশু নিজেই যেন বাণ ছুঁড়ছে এইরকম ভাব দেখিয়ে, চারি দিকে চারটি বাণ নিক্ষেপ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনা করেন শিশুকে নারায়ণ, অনন্ত, মহাদেব ও যম যেন সকল রকম সংকট ও অমঙ্গল থেকে রক্ষা করেন। শিশু যদি কন্যাসন্তান হয়, তাহলে ধনুর্বাণের পরিবর্তে তার হাতে একটুখানি কাপাস তুলো ও একখানা কাঁচি স্পর্শ করিয়ে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানের শেষে পুরোহিত পুত্রসন্তানের কানে কানে বলেন, 'তোমার সংগ্রাম বাড়ির বাইরে, আর কন্যাসন্তানের কানে কানে বলেন, 'তোমার সংগ্রাম ঘরের ভিতরে।'

নামকরণ, চূড়াকরণ ও অন্নপ্রাশনের মতো সন্তান জন্ম-সম্পর্কিত অন্যান্য আচার-অনুষ্ঠান ব্রাহ্মণেরা শাস্ত্রসম্মত ভাবে পালন করে। সকল শ্রেণীর লোকই নবজাতকের ঠিকুজি প্রস্তুত করার জন্য জ্যোতিষী নিয়োগ করে। অব্রাহ্মণেরা কেবল অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠান করে শিশুর বয়স পাঁচ, সাত বা নয় মাস হলে। সবার আগে মামা অন্ন মুখে তুলে দেয়, সেইজন্য অন্নপ্রাশনকে বলা হয় মুখে ভাত। বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনকে নিমন্ত্রণ করে ভোজ দেওয়া হয়, নামও রাখা হয়। খাসিয়াদের নামকরণ অনুষ্ঠান মনে রাখার মতো: বয়স্ক ও অভিজ্ঞ কোন ব্যক্তিকে সালিশরূপে ঘরে ডেকে আনা হয়। অন্য আরো কিছু লোক উপস্থিত থাকে। তারা পর পর একটার পর একটা নাম বলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে পুরোহিত ভাঁড় থেকে মদ ঢেলে পান করতে থাকে। মদের শেষ ফোঁটার সঙ্গে সঙ্গে যে নামটা উচ্চারিত হয়, সেই নামটাই রাখা হয়। আসামের কোন কোন বৌদ্ধ গোষ্ঠী মা ও শিশু উভয়েরই শুদ্ধীকরণ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, দোওনীয়ারা তাদের ফুঙ্গী বা পুরোহিত ডেকে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে শুদ্ধীকরণ করে। বৌদ্ধ ফাকিয়ালরা জন্মগ্রহণের সাত দিন পরে তাদের 'চাংঘরের' (বাঁশের খুঁটির ওপর তৈরি উঁচু ঘর) বারান্দায় শিশুকে প্রথম বের করে। একমাস গেলে নিচের তলায় প্রথম নামায়, তার আগে বর্ষিয়সী মেয়েরা শিশুর হাতে ও পায়ে কালো সুতো বেঁধে তার মঙ্গল কামনা করে। কোন কোন হিন্দু অসমীয়া শিশুর কোমরে কালো সুতোর ঘুনসি পরিয়ে রাখে, যাতে না কারো নজর লাগে।

বোড়ো সমাজে শিশু জন্মালে জন্মনাড়ীর মূলে একটি সুতো বেঁধে দেওয়া হয় তারপর ক্ষুরধার একটি বাঁশের চোঁচ দিয়ে গিঁটটার উপর দিকটা কেটে বাদ দেওয়া হয়। বাঁশের চোঁচের বদলে কখনো ক্ষুর বা ছুরি যে ব্যবহার করা হয় না এমন নয়, তবে অসমীয়া গ্রামে সচরাচর নাড়ী কাটা হয় ওই বাঁশের চোঁচ দিয়েই। বিধবা,

বিপত্নীক কিংবা নিঃসন্তান ব্যক্তিকে দিয়ে এই কাজ করানো হয় না। নাড়ী কাটা হয়ে গেলে শিশুকে ঈষৎ গরম জলে স্নান করিয়ে দেওয়া হয়। নয় গাছি দূর্বাঘাস, একটি তুলসীর ডাল এবং একটি সোনার আঙটি পুঁটলীতে বেঁধে নদী থেকে বয়ে আনা জলে সেই পুঁটলি ডুবিয়ে দেওয়া হয়। তারপর নবজাতকের শরীরে সেই জল ছিটিয়ে ছিটিয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়: 'বোপাটি (বাবাধন) আগের জন্মে কি ছিলে তুমি—বঙাল (বিদেশী) না হিন্দু, না গারো, না ভুটীয়া, না নেপালী ? যা-ই থেকে থাকো না কেন, আজ থেকে তুমি হলে বোড়ো।' শিশুর মঙ্গলের জন্য দেবতাদের উদ্দেশে একটি মোরগ বলি দেওয়া হয়। ওই পর্যন্ত, অন্য আর কোন আচার পালন করা হয় না। নাভীর ঘা শুকোলে তার চোকড়াটুকু একটি মাদুলীতে পুরে শিশুর গলায় পরিয়ে দেওয়া হয়। শিশুর মাকে দাই ও অন্যান্য শুশ্রূষাকারিণীদের ডেকে ভোজ খাওয়াতে হয়, তা না হলে পাপ হয়। বোড়ো সন্তানদের আনুষ্ঠানিক ভাবে মুখে ভাত দেওয়া হয় না, কিন্তু পাঁচ বছর বয়সে পা দিলে ছেলের মামা এসে তার মাথাটা কামিয়ে দেন। মনে হয়, এই আচার এসে থাকবে আর্য হিন্দুদের প্রভাবে। যে পরিবারে ছেলেমেয়ে বাঁচে না, সেখানে কখনো কখনো তিনমাসের ছেলের সঙ্গে তার মায়ের ও তিন মাসের মেয়ের সঙ্গে তার বাবার, 'বিয়ে' দেওয়া হয়—এই আশায় যে এর ফলে তারা দীর্ঘ জীবন লাভ করবে। কখনো কখনো দুরদৃষ্ট বাবা শিশুকে একটি ঝুড়িতে বসিয়ে, সেই ঝুড়ি মাথায় করে বাড়ি বাড়ি ফেরী করে বেড়ায়—শিশুটিকে 'বেচবে' বলে। প্রত্যেক বাড়িতেই বলা হয়, 'আমরা কিনতে পারব না, পাশের বাড়ি খোঁজ নাও।' বেচতে না পেরে বাবা নিজের বাড়িতে ফিরে আসে এবং মানুষ নিয়ে বেচাকেনা করার পাপ থেকে খালাস পাবার জন্য, প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ গ্রামের লোককে ডেকে ভোজ খাওয়ায়। এই বোড়ো রীতিটা অন্যান্য অসমীয়া সম্প্রদায়ের রীতির সঙ্গে মেলে—তাদের বাড়িতে ঘন ঘন শিশুমৃত্যু ঘটলে তারা সদ্যোজাত শিশুকে একটা পয়সার মতো নামমাত্র মূল্যে বেচে দেবার ভান করে।

প্রখ্যাত অসমীয়া কবি রঘুনাথ চৌধারী লিখেছেন যে, মৃত্যুশয্যা তাঁর কাছে বিবাহের প্রথম নিশার ফুলশয্যা—যেখানে স্রষ্টার সঙ্গে তাঁর আত্মার অবিচ্ছেদ মিলন হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছেও মৃত্যু হল ঈশ্বরের সমান—'মরণরে, তুহুঁ মম শ্যাম সমান'। এরকম কবিজনোচিত ভাবে সরল গ্রাম্য মানুষের কাছ থেকে আশা করা যায় না। কিন্তু তাদের জীবনযাত্রা থেকেই তারা মৃত্যুর মাহাত্ম্য মেনে নেবার শিক্ষা পেয়ে থাকে। বাইবেল বলে: 'ধূলি থেকে তোমার জন্ম, তুমি ফিরে যাবে সেই ধূলিতেই।' আসামের কৃষক গান গেয়ে বলে যে, অন্তিম যাত্রায় তোমার 'লগত যাব

দুচলি খড়ি'—শ্মশানে সঙ্গে যাবে খান কয় চেলাকাঠ। শোকের কয়েকটা দিন সন্তপ্ত পরিবারকে বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন সঙ্গ দান করে—কখনো আমোদ আহ্লাদ করে, কখনো বা ধর্মগ্রন্থ পাঠ ক'রে। তারা চেষ্টা করে পরিবারটির মনোযোগ অন্য দিকে আকর্ষণ করতে। শ্রাদ্ধের দিন প্রকাণ্ড একটি ভোজ হবার সঙ্গে সঙ্গে শোকের পালা সাঙ্গ হয়ে যায়, পরিবারের লোকজন আবার তাদের দৈনন্দিন কাজেকর্মে লেগে যায়।

শবদেহ মাটিতে পুঁতে রাখাটা মনে হয় আসামের সকল অনার্য জাতির প্রথা ছিল। হিন্দু প্রভাবে তাদের কেউ কেউ শবদাহ করতে শিখেছে। তাই দেখা যায় অকা, আদি, দফলা এবং অধিকাংশ নাগা প্রভৃতি জনজাতি, যারা হিন্দু প্রভাবের আওতায় আসেনি, শবদেহ পুঁতে রাখে। আহোমরাও হিন্দুধর্ম গ্রহণ করার আগে মৃতদের কবর দিত। মিকির ও দেউরিরা শবদাহ করে। কিন্তু বোড়োদের মধ্যে তিনরকম প্রথাই প্রচলিত—কেউ কেউ দাহ করে, কেউ কবর দেয়, আর কেউ কেউ মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে গিয়ে সেইখানেই ফেলে আসে। দফলারা মৃতদেহ সমাধিস্থ করার পর চারিদিকে তীর ছুঁড়ে পাঠায়—যাতে ভূতপ্রেত শ্মশানযাত্রীদের পিছু পিছু না আসতে পারে কেউ কেউ বয়সের অনুপাতে শেষকৃত্যে তারতম্য করে থাকে: দোওনীয়ারা মৃত ব্যক্তির বয়স যদি বিশ বছরের বেশি হয়, পুঁতে রাখে। ফাকিয়ালরা পনেরো বছরের বেশি বয়স যাদের তাদের দাহ করে, আর কম হলে পুঁতে রাখে। অস্বাভাবিক ভাবে মৃত্যু ঘটলে নিয়মমাফিক সমাধিস্থ করা হয় না। আদিরা গর্ভবতী স্ত্রীলোকের মৃত্যু হলে কিংবা আকস্মিক দুর্ঘটনায় কারো মৃত্যু ঘটলে তাদের সমাধিতে ভোজ্য দ্রব্য দেয় না। সংক্রামক রোগে মৃত ব্যক্তিকে দেউরীরা দাহ করে না, প্রথমে পুঁতে রাখে এবং পরে মাটি খুঁড়ে কঙ্কালটা অগ্নিসাৎ করে। খাসিয়া ও রাভারা দাহ করা ও পুঁতে রাখা—দুরকমের প্রথাই মেনে চলে। আও নাগারা একটি উঁচু বাঁশের মাচানে খোলা আকাশের তলায় শবদেহ স্থাপন করে যাতে কাকে শকুনে খেতে পারে অথবা গলে পচে শেষ হয়ে যেতে পারে। আগেকার দিনে মাচানের তলায় তারা আগুন জ্বালিয়ে রাখত যাতে শবদেহ শুকিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে।

বেশির ভাগ জনজাতি বিশ্বাস করে যে ইহলোকের পর পরলোক আছে, ইহজন্মের পির জন্মান্তর আছে। কেউ কেউ মনে করে মৃত ব্যক্তির আত্মা রূপান্তরিত হয়ে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে। লালুং শিশু যদি অনেকক্ষণ ধরে ককিয়ে কাঁদে, তাদের ধারণা পরিবারের কোন পরলোকগত আত্মা শিশুর মধ্যে পুনর্জন্ম গ্রহণ করছে। মিকির শিশুকে যখন পিতামহের নামে নামকরণ করা হয়, ভেবে নেওয়া হয় যে পিতামহ জন্মগ্রহণ করেছেন নাতির রূপে। দফলা ও বোড়োদের মধ্যে পুনর্জন্ম

বিষয়ে কয়েকটি আশ্চর্য ধারণা আছে। দফলারা মনে করে রঙবেরঙের প্রজাপতি পরলোকগত ব্যক্তিদের আত্মা। অবিবাহিত বোড়ো যুবকের মৃত্যু হলে তার সমাধির কাছে একটি কলাগাছ পুঁতে দেওয়া হয়—যাতে তারা পরলোকের জীবন ইহলোক থেকে অধিকতর ফলপ্রসূ হতে পারে। বোড়ো স্ত্রীলোকের সমাধির পাশে একটা অশত্থ গাছের ডাল পুঁতে দেওয়া হয়, যাতে জন্মান্তরে সে সুকেশিনী হতে পারে। সমাধিস্থ করার আগে কিংবা দাহ করার আগে মৃত রমণীর মুখখানি জল দিয়ে ধোওয়া হয় এবং তার ঠোঁটদুটির মাঝখানে একটি লাল সুতো রেখে দেওয়া হয়। তার ফলে, পরজন্মে তার ঠোঁটদুটি পাতলা হবে ও রাঙা হবে—কারণ বোড়দের কাছে সেটা সৌন্দর্যের চিহ্ন।

পাঁচ
উৎসব পার্বণ

অতিকৈ চেনেহর মুগারে মহুরা
অতিকৈ চেনেহর মাকো ;
তাতোকৈ চেনেহর ব'হাগর বিহুটি
নেপাতি কেনেকৈ থাকোঁ ?

o

বড় ভালবাসি মুগার নাটাই
বড় ভালবাসি মাকু,
তার চেয়ে বাসি বোশেখের বিহু
না পেতে কেমনে থাকি ?

উপরোক্ত বিহু গীতে মুগা সুতোর নাটাই ও মাকু, অসমীয়া স্ত্রীলোকের অতি আদরের ধন তাঁতশালের উল্লেখ করছে। কিন্তু বৈশাখ মাসের বিহু তাদের কাছে আরো আদরের, এ উৎসব 'না পেতে' তারা থাকতে পারে না। বিহু অসমীয়াদের সবচেয়ে বড় উৎসব। এ উৎসব ধর্ম নিরপেক্ষ কেননা, কৃষি কাজের সঙ্গে এর অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ। আসামের মুখ্য কৃষিকাজ হল ধান চাষ। আসামে যে তিনটি বিহু পালিত হয়—বহাগ (বৈশাখ) বিহু, কাতি (কার্তিক) বিহু এবং মাঘ বিহু—প্রত্যেকটির সঙ্গে ধানচাষের বিশেষ কোন একটা পর্ব সংযুক্ত। বৈশাখে চাষীরা ক্ষেত প্রস্তুত করে চাষের জন্য, কার্তিকে বীজ ধান রোপণের পর ধানক্ষেত সবুজ হয়ে যায়, আর মাঘে সোনার ধান কেটে তোলা হয় গোলায়। সম্বৎসরে আকাশে সূর্যের বিভিন্ন অবস্থানের সঙ্গেও বিহু উৎসবের নির্দিষ্ট সময় মিলে যায়। ডক্টর প্রফুল্লদত্ত গোস্বামী লিখেছেন, 'জ্যোতির্বিদ্যা অনুসারে বহাগ বিহুর সম্পর্ক মহাবিষুব সংক্রান্তির সঙ্গে, কার্তিক বিহুর সম্পর্ক—জলবিষুব সংক্রান্তির সঙ্গে এবং মাঘ বিহুর সম্পর্ক উত্তরায়ণ সংক্রান্তির সঙ্গে। 'বিহু' কথাটি মূল সংস্কৃত শব্দ বিষুবন থেকে এসেছে বলে অনুমান করা হয়।'

তিনটি বিহুর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল বহাগ বিহু। সর্বসাধারণে একে 'রঙালী' (হাসিখুশি আমোদ আহ্লাদের) বিহুও বলে থাকে। এই উৎসবের সূচনা হয় এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি অর্থাৎ পয়লা বৈশাখে, অসমীয়া নববর্ষের শুভারম্ভের দিন। শীত চলে গেছে—বসন্ত সমাগত। হেম বরুয়া এই সময়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন : 'বহাগ বিহু আসে এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি, অসমীয়া নববর্ষের সূচনার সঙ্গে সঙ্গে। এইসময়ে শীতের কুয়াশার ঘোমটা খসে যায়, আর কী যেন এক ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে ধরনীর শুকনো হাড়গুলো নূতন জীবনের ডাকে সাড়া দেয়। সেই নূতন জীবনের স্পর্শ লাগে গাছের শুকনো ডালে ডালে, শূন্য মাঠে প্রান্তরে ও সকল মানুষের অন্তরে। এই স্পর্শ হল সংগীতে-নৃত্যে উচ্ছ্বসিত আনন্দে ভরপুর বসন্তের স্পর্শ। বিহু উৎসব হল প্রকৃতির ঋতুচক্র আবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে, আচার-অনুষ্ঠানে ও গীতনৃত্যের যোগে, মানুষের আদিম আত্মপ্রকাশের বাসনা চরিতার্থ করার উৎসব। বহাগ বিহু হল মানবিক স্তরে প্রকৃতির সৃষ্টি-উদ্দীপনা প্রকাশের প্রতীক।' উৎসবের সূচনা হয় চৈত্রের শেষ দিন। সংক্রান্তির দিনটা গো-সংবর্ধনার জন্য উৎসর্গীকৃত। সেদিনকে তাই বলে 'গরুবিহু'র দিন। ভোরবেলা গোরুর শিং-এ সরষের তেল মাখানো হয়, কলাই ও হলুদ বেঁটে এক সঙ্গে মেখে লেপে দেওয়া হয় গরুর কপালে ও শিং-এ। আগে থেকে, তারা বাঁশ দিয়ে এক ধরনের পাঁচনবাড়ি তৈরি করে নেয়, নিচের দিকে বাড়িটা তিনফালায় বিভক্ত, ফালার আগাটা চেঁছেছুলে ছুঁচালো করা। পাঁচনবাড়ির ছুঁচলো আগায় গেঁথে নেয় লাউ, বেগুন, কাঁচা হলুদ, করলা প্রভৃতির টুকরো। গরুর গায়ে বাড়ি মারতে মারতে নিয়ে যাওয়া হয় কাছাকাছি কোন পুকুরে বা নদীতে স্নান করানোর জন্য। সারাটা পথ রাখাল ছেলেরা গান গাইতে গাইতে যায় :

লাউ খা, বেঙিনা খা
বছরে বছরে বাঢ়ি যা,
মার সরু, বাপের সরু,
তুই হবি বর গরু!

O

লাউ খা, বেগুন খা
বছর বছর বেড়ে যা,
মা ছোট, বাপ ছোট
তুই হবি বড়ো গরু।

বন থেকে আনা দীঘলতী ও মাখিয়তী গাছের ডাল দিয়েও গরুর গায়ে ছাট মারা হয়। পুকুর কিংবা নদীর ঘাটে এসে গরুদের খুব ভালো করে স্নান করানো হয়, তারপর ছেড়ে দেওয়া হয় চরে খাবার জন্য। যে রাখাল ছেলেরা গরু তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল, তারা এরপর একে একে স্নান সেরে নেয়, নিজ নিজ পাঁচন-বাড়ির আগায় তখনো যদি লাউ-বেগুনের টুকরো লেগে থাকে—সেই পাঁচনবাড়ি সুদ্ধ বাড়িতে ফিরে এসে সেটা চালে গুঁজে দেয়। এর পর বাড়ির সকলে হলুদ কলাইবাটা ভালো করে সারা গায়ে মেখে স্নান করে, হরিনাম গায়, বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রণাম ক'রে পিঠে খায় চিড়ে-দই সহযোগে। গোধূলি বেলা গোচারণের মাঠ থেকে গরুরা ফিরে এলে পর সমাদর করে ঘরে আনা হয়, পায়ের খুর ধুইয়ে দেওয়া হয়, শিং ও কপালে সিঁদুর (কখনো বা চন্দন বাটা) লেপে দেওয়া হয়। গরুদের খেতে দেওয়া হয় নোনতা পিঠে। গোয়ালে ঢোকাবার আগে তুষের আগুনে নিসিন্দার মতো উৎকট গন্ধওয়ালা পাতা জ্বালিয়ে ধুঁয়ো দেওয়া হয়, যাতে সমস্ত চৌহদ্দি থেকে মশা পালাতে বাধ্য হয়। নূতন পাখার বাতাস দিয়ে ধুনুচির ধোঁয়া চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়া হয় ; নূতন বছরে এই প্রথম নূতন পাখার ব্যবহার। পুরনো দড়ি ফেলে দিয়ে গোয়ালে গরু বাঁধা হয় নূতন দড়ি দিয়ে। ধুনুচির ছাইয়ের সঙ্গে তেল মিশিয়ে হাল-বলদের ঘাড়ে ঘষে দেওয়া হয়। হাল-লাঙলও ধোয়া হয় পরিষ্কার করে, তার সামনেও রাখা হয় নোনতা পিঠে। ডক্টর প্রফুল্লদত্ত গোস্বামী বলেছেন, কামরূপ জেলায় ব্রাহ্মণেরাও গো-লক্ষ্মীর পূজো করে। সংক্রান্তির পরের দিন অর্থাৎ বছরের প্রথম দিনে অনুষ্ঠিত হয় 'মানুহ' (মানুষ) বিহু। ভোরবেলা স্নান সেরে কনিষ্ঠেরা বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রণাম করে, নূতন কাপড় পরে এবং সকলেই 'বিহুয়ান' উপহার পায়। এ-উপহার সচরাচর হয় বাড়িতে মা-দিদিদের তাঁতে বোনা একটি লাল পাড় গামছা। খাওয়া দাওয়া হয় আগের দিনের মতো। এই দুটো দিন রোজকার মতো বাঁধাপড়ার পাট বন্ধ থাকে। বয়োজ্যেষ্ঠরা সকলে যায় গণকের কাছে পরিবারস্থ সকলের বর্ষফল জেনে নেবার জন্য। এতে অবশ্য ভয়ের কিছু থাকে না, গণক ব্রাহ্মণেরা সচরাচর নাগেশ্বর গাছের পাতায় মহাদেবের প্রতি ঝড়-বন্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে সকলকে রক্ষা করার জন্য একটি প্রার্থনামন্ত্র লিখে দেন। এই নাগেশ্বরের পাতাটি সাবধানে ঘরের চালে গুঁজে রাখতে হয়। সকলে এ-বাড়ি সে-বাড়ি ঘুরতে যায়, সকলে তাদের চা-জলখাবার দিয়ে আপ্যায়ন করে। এই দিনেই গ্রামের 'নামঘর' অর্থাৎ হরিসভা থেকে আনুষ্ঠানিক ভাবে 'হুঁচরি' (সংচরী অর্থাৎ ঘুরে ঘুরে গান করার) দল গ্রামের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত নৃত্যগীত করে ঘুরে বেড়াতে আরম্ভ করে। হুঁচরি

গানের সঙ্গে বাজনা বাজে ঢোল, করতাল ও বাঁশের 'টকা' (টক্‌াটক শব্দ করে)। শুরুতে গান হয় ধর্মমূলক বিষয়ে, পরে হয় বিহু গানের সঙ্গে নাচ। যে ঘরে হুঁচরি হয়, সে বাড়ির লোকে দলটিকে চা জলখাবার খেতে দেয়, একটি বাটা বা মাটির সরাইয়ে একজোড়া তামুলপান এবং সামান্য পয়সা দিয়ে দলের সামনে হাঁটু গেড়ে তাদের অভিবাদন করে। হুঁচরি দল সে বাড়ির লোকের কুশল কামনা করে চলে যায় অন্যবাড়িতে। এই দিন ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ডিম নিয়ে যুদ্ধ করে। যে ডিম ভাঙতে পারে সে জেতে, যার ডিম ভাঙে সে হারে। বড়োরা সেদিন পূর্বাপর প্রথা অনুসারে কড়ি খেলে। চারি দিক থেকে তরুণ-তরুণীরা জনপদ ছাড়িয়ে ছায়াঢাকা কোন প্রান্তরে এসে জমায়েত হয় এবং সেখানে আনন্দ আত্মহারা হয়ে নৃত্যগীত করে। বিহুগানের মধুর সুরে শৃঙ্গার রসের প্রাধান্য একটু বেশি। বিহু নাচের বলিষ্ঠ অঙ্গভঙ্গীতে একটা যৌন আবেদনের ইঙ্গিত দেখা যায়। উৎসবের তৃতীয় দিন হল গোসাঁই-বিহুর দিন—সেদিন গাঁয়ের লোক নামঘরে একত্র সমবেত হয়ে হরিনাম করে। এর পরে এক সপ্তাহ ধরে হুঁচরি গান ও যুবক-যুবতীদের নৃত্যগীত চলতে থাকে। তারপর আসে বিহুকে বিদায় দেবার পালা—তাকে বলে 'বিহু উরুয়া' বা বিহু 'খোয়া'। এ অনুষ্ঠান করা হয় গ্রাম থেকে কিছু দূরে গিয়ে কোন জঙ্গলে কিংবা নির্জন প্রান্তরে। সেখানে গিয়ে গ্রামের লোক বিহু উৎসবে ব্যবহৃত কিছু কিছু জিনিস (যেমন ঢোল বাজাবার কাঠি বা 'টকা') ফেলে রেখে ফিরে আসে গাঁয়ে, একটি বারও পিছন ফিরে না তাকিয়ে।

স্থান বিশেষে কিংবা সম্প্রদায় বিশেষে বিহু উৎসব পালনে সামান্য কিছু ইতর-বিশেষ দেখা যায়। কোন কোন অঞ্চলে উৎসব চলতে থাকে একমাস ধরে। কোন কোন সম্প্রদায় একটা বুধবার দেখে উৎসবের সূচনা করে, বুধবারকে শুভ দিন বলে ধরা হয়। আর্যেতর জাতির গৃহস্থেরা বিহুর সময় তাদের ঘরে অতিথি এলেই তাকে ধেনো মদ খেতে দেয়। ব্রাহ্মণেরা সচরাচর বিহুর নাচ-গান হৈ-হল্লায় যোগ দেয় না। পশ্চিম আসামের জেলাগুলিতে আর্য হিন্দুরা হুঁচরির দল নিয়ে বাড়িবাড়ি ঘুরতে বেরোয় না। কিন্তু ডক্টর প্রফুল্ল দত্ত গোস্বামী বরপেটা জেলায় প্রচলিত একটি স্থানীয় প্রথার উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেছেন : 'বরপেটার বয়স্কা স্ত্রীলোকেরা একটা কোন নির্জন প্রান্তরে একজোট হয়ে একটু নাচে, হাস্যকৌতুকের গান গায় আর মনের খুশিতে ঘুরে ঘুরে সাত রকম শাক সংগ্রহ করে আনে (বিহুর সপ্তম দিনে সাত শাক একত্র রেঁধে খাওয়াটা নিয়ম। প্রথম বর্ষণের পর এই সব শাক এখানে-ওখানে গজায়)। তারা পুরুষ মানুষদের ধারে কাছে আসতে দেয় না

আর তারা যেসব গান গায় তা কাউকে জানতেও দেয় না। লোকমুখে শুনেছি এই অনুষ্ঠানে তাদের কেউ কেউ পুরুষের বেশ ধারণ করে।' পশ্চিম অঞ্চলের বোড়োদের মধ্যে 'মাগন' (ভিক্ষা নেবার) প্রথা আছে—হুঁচরির মতো। বিহুর প্রথম দিন ভোর থাকতে বোড়োরা গোরু-মোষকে স্নান করাতে নিয়ে যাবার আগে ধান খেতে দেয়। দ্বিতীয় দিন তারা তাদের দেবতা 'বাথৌ' বা মহাদেবকে পুজো দেয় এবং বাঁশি বাজিয়ে নূতন বছরকে আহ্বান করে। আহোমরাও বিহুর প্রথম দিন দেবতাদের উদ্দেশে ধেনো মদ উৎসর্গ করে।

'কাতি' (কার্তিক মাসের) বিহুকে 'কঙালী' (কাঙালী) বিহুও বলা হয়। চাষীদের গোলা তখন শূন্যপ্রায় থাকায় এই বিহুতে বিশেষ আমোদ-প্রমোদ হয় না। বছরের এই সময়টাতে প্রত্যেকটি ক্ষেতে বীজধানের চারা বোনা হয়, চারাগুলি সবুজ হয়ে মাথা চাড়া দিতে থাকে। গোধূলি বেলায় উঠোনে তুলসীমঞ্চের তলায় নৈবেদ্য সাজিয়ে দেওয়া হয়। মঞ্চের ধারে-কাছে একটি কলা গাছ পুঁতে, তার গায়ে পাতলা বাঁশের পাটা লাগিয়ে, সেইসব পাটার উপর মাটির প্রদীপ জ্বালানো হয়। প্রদীপ জ্বালানো হয় গোলার সামনেও। তারপর চাষী যায় তার ধানের ক্ষেতে। মাটির প্রদীপ একটি জ্বালিয়ে, শস্যের মাথার উপর দিয়ে একখানা লাঠি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মন্ত্র পড়ে যাতে পাখি, ইঁদুর, পোকামাকড়, জীবজন্তুর হাত থেকে ক্ষেত তার রক্ষা পায়। বস্তুতপক্ষে 'কাতি বিহুর' সকল পূজা-অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য হল খাদ্যশস্যের ভালো ফলন।

'ভোগ' কথাটা ভোজন কিংবা উপভোগের অর্থে ধরে নিয়ে মাঘ বিহুকে 'ভোগালি' বিহুও বলা হয়। মাঘ মাসে ধান কাটা শেষ হয় অথবা শেষ হবার মতো হয়—সেই সঙ্গে শেষ হয়ে যায় অভাব-অনটনের পালা। মাঘ বিহু ফসল কাটার উৎসব, ফসল গোলায় তোলার উৎসব। মাঘ বিহুর আগের দিন অর্থাৎ পৌষ সংক্রান্তির দিনটাকে বলা হয় 'উরুকা'—সেদিন সকলেরই মনে আনন্দে উড়ু উড়ু ভাব। বাড়ির মেয়েরা সারাদিন ধরে চালের পুলি বা পিঠে ও অন্যান্য জলখাবার তৈরি করতে ব্যস্ত থাকে। পুরুষদের মধ্যে জোয়ান যারা তারা চলে যায় ধানক্ষেতে। ক্ষেতে এখন জলকাদা নেই—শুকনো খট্‌খটে, ধানকাটা শেষ হয়ে যাবার ফলে চারিদিক খোলামেলা। তরুণের দল সেই উন্মুক্ত প্রান্তরে, সম্ভবপক্ষে কোন নদীর ধারে, 'ভেলাঘর' (চড়ুইভাতির জন্য সাময়িক একটা চালা ঘর) ও প্রান্তরের চারকোণায় 'মেজি' বাঁধে। 'মেজি' বানানো হয় চারকোণে চারটা বাঁশ পুঁতে তার মাঝখানে একটার পর একটা চেলা কাঠ খুব উঁচু একটা মন্দিরের আকারে সাজিয়ে। কোন

কোন গ্রামে এক একটা দল তাদের নির্দিষ্ট কোণায় তিন-তিনটি মেজি বানায়। এইসব কাজ শেষ হলে পর সারা রাত ধরে তরুণেরা চড়ুইভাতি খেয়ে, আমোদ আহ্লাদ ও নাচ-গানে সারারাত কাটিয়ে দেয়। চড়ুইভাতির প্রধান উপকরণ হল মাছ, যা নাকি তারা দিনের বেলা ধরে আনে। অন্ধকারের আড়ালে একদল ছেলে গৃহস্থদের বাড়ি থেকে কাঠ-খড়, বাগানের শাক-তরকারী, আর তাদের মা-বোনেদের হাতে তৈরি পিঠে প্রভৃতি চুরি করে নিয়ে আসে। খুব মজা করে চড়ুইভাতি হয়। কিন্তু পুব আকাশ ফর্সা হতেই সংক্রান্তি শেষ হয়ে মাঘ মাসের প্রথম দিন আসে। তখন তরুণদের একজন সেই হাড়কাঁপানো শীতে নদীর জলে ভালো করে স্নান সেরে ঈশ্বরের নাম নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে মেজিগুলিতে আগুন ধরিয়ে দেয়। গাঁয়ের লোকেরা দলে দলে এসে মেজির চারদিকে দাঁড়িয়ে আগুন পোহায়, কিছু কিছু দ্রব্য-সামগ্রী অগ্নিকে উৎসর্গ করে, গাঁয়ের ব্রাহ্মণ পুরোহিত কিংবা তাঁর অভাবে গাঁয়ের মুরুব্বীজাতীয় কোনো বয়স্ক ব্যক্তি, মেজির ছাই নিয়ে সমবেত সকলের কপালে ফোঁটা পরিয়ে দেন। তারপর সকলে সমস্বরে নামগান করে। মেজিগুলি পুড়ে শেষ হয়ে যাবার পর সকলে নদীর জলে স্নান করে। ফিরতি পথে সবাই মেজির আধ-পোড়া কোন কাঠের টুকরো হাতে করে নিজেদের বাড়ির ফলের বাগানে ফেলে দেয়—তাতে নাকি ফল ভালো হয় ও মিষ্টি হয়। ফলের বাগানের প্রত্যেকটি গাছের গায়ে ধানের নাড়া কিংবা বাঁশের ছাল জড়িয়ে দেওয়া হয়। স্ত্রীলোকেরা পুরুষ ও ছেলেমেয়েদের সবাইকে পিঠে ও জলখাবার খেতে দেয়। গাঁয়ের সকলে এবাড়ি সেবাড়ি ঘুরে ঘুরে খাওয়া-দাওয়া করে। এই দিনে নানারকম খেলাধুলা হয়ে থাকে, তারমধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল মোষের যুদ্ধ—যদিচ ক্রমেই এটা লোপ পেতে বসেছে। রাজারাজড়াদের আমলে অসিযুদ্ধ, বর্শা-নিক্ষেপ, বাজপাখির লড়াই প্রভৃতি নিয়েও প্রতিযোগিতা হত।

উল্লিখিত তথ্যাদি থেকে সহজেই বুঝতে পারা যায় যে বিহু উৎসবগুলির সঙ্গে কৃষিকর্মের সম্পর্ক অন্তরঙ্গ। নিশ্চয় আদিম কোন জনজাতির জীবনে এই উৎসবের সূচনা ঘটে থাকবে। আজকের দিনেও মিরিরা তিনটি অসমীয়া বিহুর অতিরিক্ত নিজেদের আরো দুটি বিহু পালন করে—একটি 'আহু' অর্থাৎ আউস ধান বপনের আগে আর দ্বিতীয়টি আউস ধান কাটার পর। গারো উৎসবসমূহ বীজ বপন ও ফসল কাটার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। অরুণাচলের আদি-রা প্রতিবেশী সমতলবাসীদের মত ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে তাদের ফসল কাটার 'সলুং' উৎসব পালন করে সপ্তাহকাল ধরে। আদি স্ত্রীলোকেরা সমতলবাসী ভগ্নীদের মত ঘরদোর, বাসনকোষন

ধুয়ে মুছে সাফ-সুতরো করে এবং উৎসবের ষষ্ঠদিনে যে ভোজ হয়, তার জন্য পূর্ব থেকে ভোজ্য বস্তু প্রস্তুত করতে থাকে। পুরুষ মানুষেরা চারদিনের জন্য ঘর ছেড়ে জঙ্গলে বেরিয়ে যায় শিকারের উদ্দেশ্যে, সমতলবাসীরা যেমন মাছ ধরতে বেরোয়। শিকারে যা কিছু মেলে গ্রামের লোকের মধ্যে তা সমভাবে ভাগ করে দেওয়া হয়। অবিবাহিত আদি তরুণদের নিজস্ব বাসগৃহ 'মুসুপ'-এ, প্রকাণ্ড একটা অগ্নিকুণ্ডের চারপাশে বসে, শিকারীর দল সারারাত মদ খেয়ে ফুর্তি-তামাসা করে। এইরকম কোন আদিম উৎসব থেকেই হয়তো মাঘ বিহুর উদ্ভব হয়েছিল। গো-সম্বর্ধনা কিংবা বর্ষফল স্বরূপ নাগেশ্বর পাতায় মন্ত্র লেখা—এসব প্রথা হয়ত অনেক পরে এসে থাকবে আর্য-প্রভাবে। আসামের বৌদ্ধরা বিহুর দিন মন্দিরের ভিতর থেকে বুদ্ধমূর্তি বাইরে বের করে ; মূর্তিকে স্নান করিয়ে নেবার সময় তারা পরস্পরের গায়ে জল ছিটোয়। সেইসময় তাদের কেউ কেউ অষ্টশীল গ্রহণ করে।

আপাতদৃষ্টিতে কোন ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে সম্বন্ধবিহীন আসামের অপর একটি উৎসব হল 'ভঠেলি'—একে 'সরি'-ও বলা হয়ে থাকে। দক্ষিণের কামরূপ ও গোয়ালপাড়া এই দুটি জেলায় এবং কামরূপের সন্নিহিত দরং জেলার কোন কোন অঞ্চলের মধ্যে এই উৎসব সীমাবদ্ধ। দরং অঞ্চলে একে বলে 'দেউল'। (বরপেটার 'দৌল' বা হোলি উৎসবের নামের সঙ্গে এ নামের কোন সম্বন্ধ নেই। বরপেটার দৌলকে সাধারণ মানুষ দেউলও বলে থাকে। 'দৌল' ও 'দেউল' দুটি শব্দই অসমীয়া ভাষায় মন্দিরের সমার্থক)। ভঠেলি বা সরি উৎসব অনুষ্ঠানের সময়টা হল আসামের মুখ্য ধর্মনিরপেক্ষ উৎসব—বহাগ বিহুর নির্ধারিত সময়ের কাছাকাছি। এ উৎসব হল একদিনের উৎসব। রাত্রিপ্রভাতে গ্রামের যুবকেরা স্নান সেরে একটি দীর্ঘ বাঁশ কেটে আনে, তারপর দা-কাটারি দিয়ে বাঁশটা চেঁচে ছুলে খুব মসৃণ করে তোলে। বাঁশটা ভাল করে ধুয়ে নেবার পর রঙিন কাগজ, কড়ি ও চামর দিয়ে সুসজ্জিত করে। অতঃপর শঙ্খঘন্টা বাজিয়ে সেই সুসজ্জিত বাঁশটা ধ্বজার আকারে আনুষ্ঠানিকভাবে নামঘরের সামনে একটা খোলা জায়গায় পুঁতে দেয়। ইতিমধ্যে পাশের গ্রামের যুবকেরা দৈর্ঘ্যে কিঞ্চিৎ কম অথচ একইধরনে সুসজ্জিত আর একটি বাঁশ ধরে এনে দীর্ঘতর ধ্বজাটির বাঁ ধারে এনে মাটিতে বসায়। এই দুটি ধ্বজাকে বলা হয় 'পায়রা' অর্থাৎ পায়রা, বড়োটি বর-পায়রা এবং ছোটটি কনে-পায়রা। যে গ্রাম উৎসবের আয়োজন করে, দীর্ঘতর ধ্বজা অর্থাৎ বর-পায়রাকে স্থাপন করার অধিকার পায় সেই গ্রামের যুবকেরা। এবার তৃতীয় একটি ছোট বাঁশের খুঁটি পুঁতে তার চারদিকে তোরণের আকারে একটি কলাপাতার ছাউনি তৈরি হয়—একেই বলে ভঠেলি ঘর।

এই ভঠেলি ঘরের সিংহাসনে বিগ্রহ স্থাপন করে তাঁকে নৈবেদ্য ও দক্ষিণা নিবেদন করা হয়। গ্রামের লোকেরা দেবতার পূজো সেরে বাঁশের ধ্বজা দুটিকে নমস্কার করে ও ভক্তিভরে স্পর্শ করে। এবার ভঠেলি ঘরের সিংহাসন পুরোভাগে বহন করে শোভাযাত্রা বের হয়, আশপাশ থেকে গাঁয়ের লোকেরা এসে সেই শোভাযাত্রায় যোগদান করে। সকলে আসে উৎসব সজ্জায়, বস্ত্রালংকারে সুসজ্জিত হয়ে। সারাটা পথ চলতে চলতে বিবাহ-বিষয়ে একধরনের বিদ্রূপাত্মক গান গাওয়া হয়—তাকে বলে খিচা-গীত। সমস্ত পরিবেশটা আনন্দমুখর হয়ে উঠে। পিঠে, মেঠাই, মাটির পুতুল, সস্তা মনোহারী দ্রব্যের দোকান প্রভৃতি নিয়ে একটা ছোটখাটো মেলা বসে যায়।. এইরকম একটা মেলার বর্ণনা দিতে গিয়ে ডক্টর প্রফুল্লদত্ত গোস্বামী লিখেছেন, 'সুন্দর সাজসজ্জা করে যুবতী মেয়েরা দলে দলে এইসব জিনিসপত্র সওদা করে বেড়ায়। তাদের পিছু পিছু চলে তেল-জবজবে চুলে টেরি বাগানো যুবকেরা, মেয়েদের দিকে তাকাতে তাকাতে কিংবা তাদের উদ্দেশ্যে শিস্ দিতে দিতে।' কিন্তু মেয়েদের উপর কড়া নজর রাখার জন্য দিদিমা-ঠাকুমারা তাদের পিছনে ছায়ার মত ঘুরে বেড়ায়। মেলার কোন কোন জায়গায় হয়ত দধি-মন্থনের বিষয় নিয়ে নৃত্যগীত হয়—আটটি বালিকা গোপী হয়ে এবং বারজন বালক রাখাল হয়ে অভিনয়ের ভঙ্গী করে নাচে। কয়েক দশক আগে এইরকম ভঠেলি উৎসবে ঘোড়দৌড় হত। মোষ কিংবা হাতীর লড়াই হত। আজকাল সেসব আর হয় না।

আনুষ্ঠানিকভাবে ভঠেলি উৎসবের সূচনা হয় দুপুরবেলা। উৎসবে যোগদানকারী বিভিন্ন গ্রামের লোকেরা প্রত্যেক গ্রামের পক্ষ থেকে একটি করে সিংহাসন শোভাযাত্রা সহকারে নিয়ে আসতে পারে—সমস্ত উপাচার সহ। ভঠেলি ঘর থেকে সিংহাসন নিয়ে শোভাযাত্রায় বেরোবার অগ্রাধিকার পায় উৎসবের আয়োজনকারী গাঁয়ের লোক। অন্য গাঁয়ের শোভাযাত্রা প্রথমটির অনুসরণ করে। সন্ধ্যা যখন নামে, স্থানীয় ছেলেরা চীৎকার করে ঘোষণা করে, 'ভঠেলি শেষ হয়ে গেল।' তখন তারা লাঠির ঘায়ে ভঠেলি ঘরখানা ভেঙে ফেলে। এবার ভিন্ গাঁয়ের লোকদের ফিরে যাবার পালা। নিজেদের গ্রামে এসে তারা প্রত্যেক বাড়ির দরজায় সিংহাসনটা নামায়, যাতে গৃহস্থবাড়ির লোকেরা একটি ডালায় একখানি প্রদীপ জ্বালিয়ে তার চারদিকে চাল-ডাল-ফলমূলের নৈবেদ্য সাজিয়ে দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদন করতে পারে। এইসব নৈবেদ্য পরে প্রসাদরূপে সবাইকে বিতরণ করা হয়। দোকানপাট থেকে পিঠা-মেঠাই ভেট দেয় ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে বণ্টন করে দেবার জন্য। এই আনন্দ-উৎসবে কখনো কখনো গ্রামের মুসলমান ভাইরাও যোগ দেয়।

এমন কি উত্তর কামরূপের কোন কোন গ্রামে ভঠেলির বিকল্প রূপে 'বাঁহরিয়া' অর্থাৎ বাঁশ-বিয়ে নামে মুসলমানেরা নিজেদের একটা উৎসব করে থাকে। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন 'ভঠেলি' কথাটা এসেছে সংস্কৃত ভস্থলিকা বা আকাশ থেকে। আকাশচুম্বী বাঁশের ধ্বজদণ্ড হয়ত তারই প্রতীক। মহাভারতে একটা উৎসবের বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, ইন্দ্র যাতে যথোচিত বারি বর্ষণ করেন তাই তাঁর প্রীতি-কামনায় ইন্দ্র-ধ্বজা স্থাপন করা হয়। সপ্তাহকাল পরে সেই ধ্বজা নামিয়ে নেওয়া হয় আশ্বিন-পূর্ণিমার দিনে। কৃষ্ণ এই উৎসবকে গোবর্ধন পূজায় পরিণত করেছিলেন। কোচবিহারে চৈত্রপূর্ণিমার দিন একটি লম্বা বাঁশ পুঁতে তার তলায় কামদেবের পূজা দেওয়া হয়—এই পূজাকে বলে মদন-কাম পূজা অথবা বাঁশ-বিয়া। উত্তর কামরূপের বজালী অঞ্চলে কোন গাছের উপর ভর দিয়ে রাখে একখানি বাঁশ এবং সেই বাঁশকে পূজা করা হয় মদনমোহন বলে। ইন্দ্রধ্বজ ও গোবর্ধনধারী দুটি ধারণাই হয়ত লৌকিক বিশ্বাসের অঙ্গীভূত হয়ে, কামরূপের গ্রামবাসীদের প্রেরণা দিয়েছে, যাতে তারা ভঠেলি উৎসবের সূত্র ধরে আসন্ন কৃষিকর্মের সূচনায় বৃষ্টিপাতের জন্য প্রার্থনা করতে পারে। ঋগ্বেদে আকাশ ও জলের দেবতা ইন্দ্রকে পক্ষীরূপে পূজা করার কথা আছে। হয়ত সেই কারণেই আসামের গ্রামবাসী বাঁশের ধ্বজাকে পায়রা বলে কল্পনা করেছে। ডক্টর প্রফুল্লদত্ত গোস্বামী কালিকাপুরাণে একজন রাজার উল্লেখ দেখেছেন যিনি স্বকীয় উন্নতি কামনায় ইন্দ্রের পূজা করেছিলেন। সম্প্রতি গৌহাটির অনতিদূরে একটি ইন্দ্রমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে।

দরঙা মেলার সঙ্গে ধর্মকর্মের কোন সম্পর্ক নেই। এ মেলা আসলে একটা প্রকাণ্ড হাট—প্রতি বছরে একমাস ধরে এই হাট বসে। উত্তর কামরূপের রঙিয়া থেকে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত দরঙা, ভূটান পাহাড়ের পাদদেশে একটা নির্জন জায়গা। বর্ষাকালে পাহাড়ী নদীর ঢল নেমে সমস্ত জায়গাটা বন্যাপ্লাবিত হয়। জল সরে গেলে থাকে কেবল পাঁক, মাটি ও বড় বড় পাথরের টুকরো। কিন্তু শরৎকাল থেকে শুরু করে বসন্ত ঋতুর শেষ পর্যন্ত দরঙায় কাদা শুকিয়ে নূতন শোভা ধরে, তখন দরঙা হয় আন্তঃরাষ্ট্রীয় বিচিত্র পণ্যসম্ভার লেনদেনের কেন্দ্র। দলে দলে ভূটীয়ারা আসে পুরুষ-নারী-ছেলে-বুড়ো নির্বিশেষে। পিঠের উপর কিংবা ঘোড়ার পিঠে বিবিধ পণ্যদ্রব্যের বোঝা চাপিয়ে, আঁকাবাঁকা পাহাড়ী রাস্তার প্রায় একশো মাইল কিংবা তারও বেশি পথ পায়ে হেঁটে তারা আসে দরঙার হাটে। আসামের সমতল অঞ্চল থেকেও প্রচুর লোক—বিশেষত ব্যাপারীর দল—সেখানে গিয়ে জড়ো হয় ব্যবসা করতে। খৃস্টীয় 1865 অব্দে ভূটান ও ভারতের মধ্যে নিঃশুল্ক বাণিজ্যের একটা চুক্তি সম্পাদিত হয়।

তারপর 1896 অব্দে ভূটানের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী উরগেন দর্জি সে দেশের প্রধান রপ্তানী পণ্য লাক্ষা বিক্রয়ের জন্য ভারত-ভূটান সীমান্তের নিকটবর্তী একটা উপযুক্ত অঞ্চলরূপে নির্বাচন করেছিলেন দরঙাকে। সেই চুক্তি এখনো বলবৎ। কালক্রমে দরঙা মেলা একটু একটু করে বৃহদাকার ধারণ করতে লাগল। বেচাকেনার অন্যান্য কেন্দ্র থাকা সত্ত্বেও দরঙার মেলাই ভূটানীদের কাছে সবচেয়ে সুপরিচিত ও জনপ্রিয় কেননা, এই কেন্দ্রেই ভূটান থেকে পণ্যসম্ভার এনে জড়ো করা সবচেয়ে সহজসাধ্য। তদুপরি ভূটীয়াদের অন্যতম আকর্ষণ হল হাজো শহরের হয়গ্রীব মাধবের মন্দির। গৌহাটি থেকে প্রায় ষোল মাইল উত্তরে এই ছোট শহরটি অবস্থিত। ভূটীয়াদের ধারণা হয়গ্রীব মাধবের মন্দির আসলে বৌদ্ধ মন্দির। সেজন্য হাজো তাদের কাছে তীর্থ-বিশেষ। দরঙা মেলায় এলেই তারা দলে দলে যায় এই মন্দির দর্শন করতে। দরঙা মেলায় লাক্ষা ছাড়া ভূটীয়ারা আর আর যে সব পণ্যদ্রব্য আনে, তারমধ্যে উল্লেখ-যোগ্য হল কমলা লেবু, মৃগনাভি বা কস্তুরী, মাখন, ঘি, হাতে বোনা কাপড়-চোপড়। গোরু-মোষ, টাট্টু ঘোড়া ও কুকুর। ভূটীয়া কুকুর সমতলবাসীদের বিশেষ প্রিয়। ফিরতি পথে ভূটীয়ারা নিজেদের দেশে নিয়ে যায় কেরোসিন, নারিকেল তেল, লবণ, কাপড় বোনা সুতোর গাঁঠি, বাসনকোষণ, তামাকপাতা, দেশলাই, চাষ-আবাদ কিংবা নিত্যব্যবহারের উপযোগী লোহার যন্ত্রপাতি ইত্যাদি। বছরে প্রায় পনেরো লাখ টাকা মূল্যের পণ্য লেনদেন হয়। ভূটীয়ারা এই মেলার সূত্রে আসামের লোকেদের সঙ্গে মিত্রভাবাপন্ন হয়ে মেলামেশা করে, অনেকে অসমীয়া বাড়িতেও যায়। আসাম সরকারও এই মেলার সুবিধার্থে বাস চলাচলের জন্য রাস্তাঘাট মেরামত করিয়ে দেন, মেলায় আগত ভূটীয়াদের জন্য সাময়িকভাবে স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করেন, শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য পুলিশ নিয়োগ করেন।

মহ্হো অপর একটি সহজ সরল উৎসব। অসমীয়াভাষায় 'মহ্' কথাটার অর্থ হল মশা। মহ্হো অথবা মহ্-খেদা হল মশা তাড়ানোর উৎসব। তাড়ানোটা নিতান্তই অভিনয়, এই অভিনয়ে যোগ দেয় গাঁয়ের কিশোরবয়স্ক ছেলেরা। উৎসব হয় অঘ্রাণ-পূর্ণিমার দিন। উৎসবের দু-তিন দিন আগে থাকতে তারা লাঠি-মুগুর নিয়ে গানের আখড়ায় জড়ো হয়ে মহড়া দেয়। উৎসবে গাইবার জন্য কয়েকটি প্রচলিত গান আছে, ঘুরেফিরে সেই গানগুলিই গাওয়া হয়। উৎসবের দিন সন্ধ্যাবেলা তারা গাঁয়ের এ-ঘর থেকে সে-ঘর ঘুরে বেড়ায়। গৃহস্থের উঠোনে তারা গোল হয়ে দাঁড়ায় ছোট ছোট লাঠি হাতে। কেন্দ্রে যে ছেলেটি দাঁড়ায় সে কেন্দ্রবিন্দুর উপরে মুগুরটি খাড়া দাঁড় করিয়ে ধরে থাকে। বাকি ছেলেরা মণ্ডলাকারে ঘুরে ঘুরে গান

গায় ও কেন্দ্রস্থ মুগুরের উপরে নিজ নিজ লাঠির ঘা মেরে তাল দিতে থাকে। গানের শেষে তারা সিকিটা, আধুলিটা যা চায়, গৃহস্থ তাই দিয়ে দেন এবং সেই সঙ্গে কিছু চাল। এই ভাবে যে পয়সা ও চাল জোগাড় হয় তাই দিয়ে একটা ভোজ হয়। কখনো কখনো একজন ছেলে গায়ে কলার পাতা ও কলার বাকল জড়িয়ে ভালুক সাজে। কিন্তু এ কাজটা একটু বিপজ্জনক, কারণ আসল ভালুক নকল ভালুককে তাড়া লাগাতে পারে কিংবা না জেনেশুনে কেউ তার প্রতি ভালুক-মারা মন্ত্রও প্রয়োগ করতে পারে। সেইজন্য মহ্-খেদা অভিনয় শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে পাতা-বাকল কোন নির্জন জায়গায় নিয়ে গিয়ে পুঁতে ফেলা হয়। অগ্রাণ মাস শুরু হতেই শীত এসে পড়ে, মশাও কমতে শুরু করে। কিন্তু কামরূপ, দরং, গোয়ালপাড়া এবং কোচবিহারের কোন কোন অঞ্চলের কিশোর ছেলেরা দাবী করে, মহ্-খেদা উৎসব করে তারাই মশা তাড়িয়েছে।

নিছক ধর্মমূলক উৎসবের সংখ্যা আসামে কিছু কম নয়, তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য বরপেটার 'দেউল' (দোলাযাত্রা বা হোলি), কামাখ্যার অম্বুবাচী, ও শিবসাগরের শিবরাত্রি। উত্তর কামরূপের বরপেটাকে বলা হয় 'সত্রীয়া' নগর, কারণ এই জায়গায় শ্রীশঙ্করদেবের প্রধান শিষ্য শ্রীমাধবদেব বৈষ্ণবদের জন্য একটি আখড়া বা সত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বরপেটা আসামে বৈষ্ণব ধর্মের একটি প্রধান কেন্দ্র, বরপেটার লোকদের উপর সত্রের প্রভাব খুবই গভীর। প্রশস্ত কীর্তনঘরটি বরপেটার মুখ্য মন্দির, সেখানে প্রত্যহ নিয়মিতভাবে বৈষ্ণব ধর্মীয় কোন-না-কোন অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। এই সত্রের জন্য আহোম রাজা শিবসিংহ ও কোচ রাজা নরনারায়ণ প্রভূত পরিমাণ ভূমি দেবত্র করে যান। রঘু রায় নামে আর একজন কোচ রাজা সত্রের জন্য একটি সোনার কৃষ্ণমূর্তি দান করেছিলেন। আজও সেটি সত্রে সযত্নে সংরক্ষিত রয়েছে।

দেউল উৎসবের প্রথম দিনটিকে বলা হয় গোন্ধ। সেদিন সন্ধ্যায় মহাপ্রভু কলীয়া (কালো) ঠাকুর অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ প্রস্তুত হন তাঁর স্ত্রী ঘুনুচার (গুণ্ডিচা) বাড়ি যাবার জন্য। তদুপলক্ষে তাঁর অনুগামীরা (বরপেটাবাসীরা) প্রচুর নলখাগড়া জোগাড় করে কীর্তনঘরের সামনে প্রকাণ্ড একটি বহ্ন্যুৎসবের আয়োজন করে। আচার অনুষ্ঠানসম্মত পূজাপ্রার্থনার পর খোল, করতাল, মৃদঙ্গ বাজিয়ে এবং আতশবাজি পুড়িয়ে কলীয়াঠাকুরকে তাঁর সিংহাসন থেকে তুলে আনা হয়। হাজার হাজার ভক্ত তাঁর পিছু পিছু আসে। তাঁকে চৌদোলায় চড়িয়ে আগুনের চারপাশে ঘোরানো হয় যাতে তিনি একটু আগুন পোহাতে পারেন। অতঃপর তাঁকে স্থাপন করা হয় দৌল বা বেদীর উপর। উৎসবের দিনগুলিতে কীর্তনঘরের যাবতীয় ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও

নাম-প্রসঙ্গাদি করা হয় এই বেদীর সামনে। দ্বিতীয় দিন এইসব অনুষ্ঠান ছাড়াও গীতবাদ্য সহকারে আসামের বৈষ্ণব ঐতিহ্যবাহী 'ভাওনা' নাট্যাভিনয় হয়। তারপর রাত্রে হয় যাত্রা। দূরদূরান্ত থেকে যেসব তীর্থযাত্রী আসে, তারা এইসব অনুষ্ঠান দেখে না-ঘুমিয়ে রাত কাটিয়ে দেয়। তৃতীয় দিনের উৎসব হয় আগেকার দিনের অনুরূপ। চতুর্থ দিন হল উৎসবের শেষ দিন, এইদিনকে বলা হয় 'সুয়েরি'। এইদিনেই ঘুনুচার বাড়ি থেকে কলীয়াঠাকুরের লক্ষ্মী-মায়ের ঘরে ফেরবার কথা। ঠাকুরকে তাঁর ভক্তেরা বিচিত্র রঙের আবির মাখিয়ে একটা চৌদোলায় চাপিয়ে নিয়ে আসে। ঠিক সেইসময়েই অপর একটি বৈষ্ণব কেন্দ্র, বারাদি থেকে বিরাট এক ভক্তের দল এসে যোগ দেয় তাদের নিজেদের চৌদোলা বহন করে। কীর্তনঘরের চারিদিকটা হয়ে উঠে যেন ভক্তদের জনসমুদ্র। শঙ্খ, ঘণ্টা, খোল, মৃদঙ্গ, করতাল, খঞ্জনীর ধ্বনিতে এবং সমবেত কণ্ঠে হোলি গানে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠে। জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ নির্বিশেষে সকলে সকলের দিকে আবির ছুড়ে দেয়। এবার সকলে শোভাযাত্রা সহকারে ঠাকুরকে বহন করে নিয়ে যায় আধ মাইলটাক দূরে কনরিয়া নামে একটি জায়গায়। শোভাযাত্রীরা সংখ্যায় এত বেশি থাকে যে ওইটুকু পথ অতিক্রম করতে সময় লেগে যায় প্রায় তিন ঘণ্টা। কনরিয়া পৌঁছুলে পর ঠাকুরকে চৌদোলা থেকে নামিয়ে 'হেকেরা' বলে এক ধরনের কাঁচা ডাল খেতে দেওয়া হয়। অতঃপর কনরিয়ার সত্রাধিকারী উৎসবের তাৎপর্য সম্বন্ধে দু-চারটা কথা বলেন। এবার ঠাকুরের বরপেটায় ফেরবার পালা। ফিরে এসে সভয় বিস্ময়ে তিনি লক্ষ্য করেন যে কীর্তনঘরের প্রবেশদ্বারের কাছে প্রকাণ্ড শক্ত একটা বাঁশের ব্যবধান সৃষ্টি করে তাঁর পথ রোধ করা হয়েছে। এই কয়েকটা দিন তিনি ঘুনুচার বাড়িতে গিয়ে ছিলেন বলে, লক্ষ্মী-মা তাঁর উপর অভিমান করে তাঁর ভক্তদের আদেশ দিয়ে রেখেছেন, কলীয়াঠাকুরের ফেরবার পথ যেন বন্ধ রাখা হয়। ঠাকুরের অনুচরেরা বহু অনুনয় বিনয় করে মার্জনা ভিক্ষা করে ঠাকুরের হয়ে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। দুই পক্ষের মধ্যে তর্কবিতর্ক শেষপর্যন্ত কলহতে পরিণত হয়, কলহ থেকে এক প্রকার হাতাহাতি। এই কলহ মাঝে মাঝে বিপদ ডেকে আনে, কারণ যুবকেরা তাদের স্বভাবসুলভ উৎসাহের আতিশয্যে বাঁশের বেড়াটা ভাঙবার জন্য সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে, ধাক্কাধাক্কি ধ্বস্তাধ্বস্তিতে কয়েকজন লোক আহত হয়। যেকোন উপায়ে বেড়া ভেঙে কলীয়াঠাকুরকে কীর্তনঘরের আঙিনায় নিয়ে যাওয়া হয়। আঙিনায় এসে ঠাকুর কীর্তনঘরের চারিদিকে সাত পাক ঘুরে আসেন। তারপর ক্লান্ত হয়ে তিনি একটু বিশ্রাম গ্রহণ করেন। সেই সুযোগে লক্ষ্মী-মায়ের পক্ষ থেকে একজন

ভক্ত তাঁকে 'ককর্থনা' অর্থাৎ কটুকাটব্য করতে থাকে। প্রত্যুত্তর দেয় কলীয়াঠাকুরের কোন ভক্ত, বেশ একটা মজার বাক্‌যুদ্ধ চলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ঠাকুর যেকোন কলহক্লান্ত পতির মত পরাজয় মেনে নেন। টাকা-পয়সা ও অন্যান্য উপহার দিয়ে মায়ের সন্তোষ সাধন করেন এবং এইভাবে কীর্তনঘরে প্রবেশের অনুমতি লাভ করেন। অতঃপর এই বিরাট দেউল উৎসবের অবসান হয়। বরপেটাবাসীদের উপর এই উৎসবের প্রভাব এতই গভীর যে সম্ভবপক্ষে তাদের কেউ বছরের ওই সময়টাতে ওই সত্রীয়া শহরের বাইরে থাকতে চায় না। তীর্থযাত্রী যত আসেন, তাঁদের সবাইকে সত্র থেকে বিনামূল্যে থাকবার সুবিধা করে দেওয়া হয় এবং স্বপাক রন্ধনের জন্য 'সিঠা' দেওয়া হয়। সত্র যতটুকু সুবিধা দিতে পারে যাত্রীর সংখ্যা যদি তার চেয়ে ঢের বেশি হয় (সচরাচর বেশিই হয়ে থাকে) তাহলে অনেকে উৎসবের দিনগুলি কোন বাড়িতে অতিথি হিসাবে কাটায়।

অম্বুবাচী আসলে কোন উৎসব নয়—এ হল ব্রত উপবাস উদ্‌যাপন। কিন্তু এই উপলক্ষে কামাখ্যায় একটি বৃহৎ মেলা বসে। সংস্কৃতে 'অম্বু' অর্থে জল ও 'বাচী' অর্থে প্রকাশিত বা পুষ্পিত হওয়া। অম্বুবাচীর কয়েকটি দিন জননী বসুমতী রজস্বলা হন বলে লোকের বিশ্বাস, সুতরাং সেই দিনগুলিতে তিনি অশুচি থাকেন। আষাঢ় মাসের ছয় দিন গত হবার পর সূর্য যখন মিথুন রাশিতে প্রবেশ করে তখন 'ভবেৎ পৃথ্বী রজস্বলা'। এই পর্ব চলে চুরাশি ঘণ্টা ধরে। এই সময়ের মধ্যে চাষী মাটি চষে না কারণ, শাস্ত্রমতে ওই সময়ে মাটি কাটা নিষিদ্ধ। কোন পূজাপার্বণও অনুষ্ঠিত হয় না সে সময়ে। বিধবা ও ঋতুমতী নারীরা সে সময় সচরাচর উপবাস করে থাকে এবং শয্যা ছেড়ে মাটিতে পা দেয় না, পাছে মাটির স্পর্শ লাগে। গ্রাম্য মানুষদের মধ্যে অনেকে সে সময় বাক্স-পেটরা খোলে না। দৈনন্দিন কাজকর্ম বা চাষবাস থেকে বিরত থাকা সকলের পক্ষে সম্ভবপর না-ও হতে পারে। কিন্তু ব্রহ্মচারী ও বিধবাদের মতো ব্রত-উদ্‌যাপনকারীরা সেই সময়টাতে পাকান্ন গ্রহণ করে না। এই কয়েকটা দিন তারা ফলমূল ও দুধ প্রভৃতি খেয়ে কাটান। বলা হয় যে অম্বুবাচীর সময় দুধ খেলে শাপে কাটার ভয় থাকে না। গ্রাম্য মানুষদের বিশ্বাস, এই সময়ে নাকি উই-পিঁপড়ে-কেঁচো বা শূকর জাতীয় জীবও মাটি খোঁড়া থেকে বিরত থাকে। এই তিনদিন একরাত ব্যাপী সময়টা কেটে গেলেই প্রত্যেকটি বাড়ি ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করা হয়, বাড়ির সমস্ত কাপড়চোপড় কেঁচে ধুয়ে সাফ করা হয়—যেমন শুচী হয় ঋতুর অন্তে ঋতুমতী নারী।

কামরূপ জেলায় অম্বুবাচীকে বলা হয় 'আমতি'—কথাটা সম্ভবত অম্বুবাচীর

অপভ্রংশ। পূর্বাঞ্চলে অম্বুবাচীকে 'সাত' বলা হয়, সম্ভবত আষাঢ়ের সপ্তম দিনে উৎসবের সূত্রপাত হয় বলে। মনে রাখা দরকার, এই সময়ে ভারতের পূর্বাঞ্চলে অবিরত ধারায় বর্ষণ হতে থাকে। ধারাবর্ষণের ফলে মাতা ধরিত্রী থাকেন নিমজ্জিত অবস্থায়। এই সময়ে প্রচুর শস্য উদ্‌গত হয় এবং গাছের ডালপালায় ফল ধরে থাকে। কিছুদিন তাদের তদারকী করারও দরকার হয় না। কলসীর কানা উপচে পড়ার মতো যখন অঝোরে বৃষ্টি পড়তে থাকে, কোন কিছু করবার মতো উপায়ও থাকে না। মূলত অম্বুবাচী হয়তো ছিল কৃষি সম্পর্কিত উৎসব বিশেষ কেননা, এখনো আসামের কোন কোন অঞ্চলে জলে ভরা সরার মধ্যে শস্যের বীজ রাখা হয় অঙ্কুরিত হবার জন্য। বীজ অঙ্কুরিত হলে সরাটি অম্বুবাচীর পরে কোন নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। কামাখ্যায় সেই তিনটি দিন একটি রাত ধরে মন্দিরের দরজা বন্ধ রাখা হয়, কোন ভক্তকে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। কিন্তু এই উপলক্ষে কামাখ্যায় যে মেলা বসে সেখানে লোক আসে হাজারে হাজারে। ছোট ছোট নানা বস্তুসম্ভার কেনাবেচা হয়, ছেলেমেয়েরা পাতার বাঁশি বাজিয়ে ছুটে বেড়ায়। মাইক-যোগে যে সঙ্গীত পরিবেশিত হয় তাতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়। বাংলা ও বিহার থেকে আমদানী করা আমের তখন চাহিদা হয় খুব। তীর্থযাত্রীদের মধ্যে অধিকাংশই বাঙালী। গ্রীষ্মতাপ দূর করার জন্য বরফ দেওয়া সরবৎ পান করা হয় প্রচুর। নানা ফুলে গাঁথা মালা গাদা গাদা বিক্রি হয়। তিনদিন পরে মন্দিরের দ্বার খুলে দেবার পর সেই সব মালা দেবীর উদ্দেশে উৎসর্গিত হয়। কুমারী মেয়েরা এক একটা থালা হাতে ভক্তদের সামনে দাঁড়ায় দুটো পয়সা পাবার জন্য। কেউ তাদের প্রত্যাখ্যান করতে পারে না কারণ, কামাখ্যায় কুমারীপূজা অনুষ্ঠানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গবিশেষ। চতুর্থ দিনে তীর্থযাত্রীদের মন্দিরে প্রবেশ করে পূজা দিতে দেওয়া হয়—বিনিময়ে তারা আশীর্বাদীস্বরূপ পায় একখণ্ড রাঙা কাপড়ের টুকরো। কামাখ্যার সুপবিত্র স্মৃতিচিহ্নরূপে তারা সেই বস্ত্রখণ্ড নিজ নিজ বাড়ি নিয়ে যায়। এই সম্পর্কে হেম বরুয়া লিখেছেন, 'লাল রঙ হল সর্বজনগ্রাহ্য একটি রঙ—তাই লাল ফুল, লাল সিঁদুর, লাল কাপড়ের টুকরোর এত কদর। লাল রঙের কোন যে বিশেষ তাৎপর্য নেই এমন নয়, এই অনুষ্ঠানের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে লাল রঙের একটা সংগতি আছে। লাল হল কাম ও যৌনভাবের প্রতীক, এবং এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কিত ঋতু-স্নানেরও প্রতীক। বলা হয়ে থাকে যে অম্বুবাচীর সময়ে দেবীর ঋতুরক্তে ডোবানো লাল কাপড়ের টুকরো পবিত্রতার চিহ্নস্বরূপ ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করা হয়

আসামের সর্বত্র যেসব শিবমন্দির ছড়িয়ে আছে, সেসব মন্দিরেই শিবরাত্রি পালন

করা হয়ে থাকে। গৌহাটির উমানন্দে, তেজপুর মহকুমার মহাভৈরব, শিঙরি, বিশ্বনাথ ও নাগশঙ্কর মন্দিরে এবং শিবসাগর শহরের শিবদোলে শিবরাত্রি উপলক্ষে বড় বড় মেলা বসে। ফাল্গুন মাসের চতুর্দশ দিনে শিবচতুর্দশী তিথিতে, হাজার হাজার লোক এই সব মন্দিরে গিয়ে বেলপাতা, ফুল, নারিকেল, দই, মধু ও ঘি নিবেদন করে শিবকে পূজা করে। সঙ্গে নিয়ে যায় পাত্রভরা জল কিংবা দুধ শিবলিঙ্গকে স্নান করাবার জন্য। কথিত আছে যে সুদূর অতীতে ফাল্গুন মাসের এমনি একটি রাতে জনৈক দরিদ্র ব্যাধ নিজের অজ্ঞাতেই এই পূজার সূচনা করেছিল। কাহিনীতে বলা হয়, মৃগয়ার সন্ধানে এই ব্যাধ একদিন অরণ্যের গভীরে প্রবেশ করেছিল। দীর্ঘ অনুসন্ধান সত্ত্বেও নিষ্ফল হয়ে সে যখন বন থেকে বেরোবার চেষ্টা করছে, সেই সময় তার চোখে পড়ল একটা হরিণ। তীর ছুঁড়ে ব্যাধ তাকে মেরে ফেলল। হরিণ মেরেই সে তার ছাল ছাড়িয়ে মাংস কাটাছাঁটায় লেগে গেল। মাংসের টুকরোগুলি বেলপাতায় দিয়ে বেঁধে নিল। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসছে বলে সে ঘরে ফেরার পথে পা বাড়াল। কিন্তু গভীর জঙ্গলে বন্য পশুর ভয় থাকায়, শিকারী মনস্থ করল রাতটা হাতের কাছে সেই বেল গাছটার উপরে চড়েই কাটিয়ে দেবে। গাছের তলায় মাটিতে পোঁতা ছিল একটি শিবলিঙ্গ। কাঁচা মাংসের সেই পোঁটলা থেকে টপটপ করে বিন্দু বিন্দু রক্ত ঝরতে লাগল শিবলিঙ্গের উপর। গাছের উপর ঠাঁয় বসে থাকার একঘেয়েমি থেকে রক্ষা পাবার জন্য ব্যাধ আনমনে বেলগাছের পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে তলায় ফেলে দিতে লাগল। পাতাগুলিও পড়ল গিয়ে সেই শিবলিঙ্গের উপর। অল্পে সন্তুষ্ট বলে শিবকে বলা হয় আশুতোষ। আশুতোষ তখন, ব্যাধের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে সশরীরে দর্শন দিলেন। লোকটা তরতর করে নেমে এসে সাস্টাঙ্গে প্রণাম করল। ব্যাধের সকল দুঃখকষ্ট দূর হয়ে যাবে—এই বর দিয়ে শিব অন্তর্হিত হলেন। সেই রাত থেকে শিবচতুর্দশীতে দিনের বেলা উপবাসে থেকে এবং সারা রাত জেগে প্রহরে প্রহরে নানা উপাচার উৎসর্গ করে পূজা দেবার প্রথা প্রচলিত হল। শিবপূজার সঙ্গে ব্যাধ ও কাঁচামাংসের সম্পর্ক থেকে অনুমান হয় এই দেবতা অনার্য-মূলজ।

শিবসাগরের শিবদোলে যে শিবরাত্রি অনুষ্ঠিত হয়, সে খুবই বড় রকমের উৎসব। দেশের দূরদূরান্ত থেকে তীর্থযাত্রীরা এই উৎসবে সমাগত হয়। মাঘমাসে পরশুরাম কুণ্ড দর্শনার্থ সন্ন্যাসীর দল নিজ নিজ স্থানে প্রত্যাবর্তনের সময়, শিবসাগরের এই উৎসবে যোগদান না করে যায় না। শিবদোল আহোম স্থাপত্যের একটি চমৎকার নিদর্শন। খৃস্টীয় 1733 অব্দে আহোম রাজা শিবসিংহের রাণী অম্বিকা দেবী শিবের

দ্বারা স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে এই মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। মন্দিরের উচ্চতা 180 ফুট, ভিত্তিমূলে এর বেড় 195 ফুট। চার বর্গফুট মাপের চেপ্টা পাথর একটির উপর একটি চুন-সুরকির মসলা দিয়ে গেঁথে গেঁথে মন্দিরটি তৈরি। আটকোণা মন্দিরটি মধ্যভাগ থেকে উপরের দিকে উঠতে ক্রমে ক্রমে মোচার আকার ধার করেছে। চূড়ায় একটি সোনার কলস আছে—আসলে দুই দিকে সোনার পাতমোড়া একটি তাম্র কলস। বিগ্রহের বৈশিষ্ট্য এই যে চেপ্টা একটি পাথরের উপর লিঙ্গ ও যোনি একত্রে উৎকীর্ণ করা আছে। এই বিগ্রহই পূজা পান। শিবসাগর নামে যে বিরাট দীঘি আছে, মন্দিরটি তারই দক্ষিণ পারে অবস্থিত। যে গুহার মধ্যে বিগ্রহটি অধিষ্ঠিত সেটি নাকি অন্তঃসলিলা একটি নহরের যোগে এই শিবসাগরের সঙ্গে যুক্ত। ফলে বিগ্রহ অনবরত বিধৌত হয়ে থাকে। পুরোহিতেরা বলেন ওই গুহার মধ্যে একজোড়া প্রকাণ্ড গোখ্‌রো সাপ বসবাস করে। আরও দুটি ছোট মন্দির আছে শিবদোল-এর দুপাশে—দেবীদোল ও বিষ্ণুদোল। বিরাট দীঘিটির সামনে এক সারিতে দাঁড়িয়ে থাকা তিনটি মন্দির একটি বিস্ময়কর দৃশ্যের সৃষ্টি করে।

শিবরাত্রির দিন (কখনো কখনো উৎসব আরো একদিনের জন্য বাড়িয়ে দেওয়া হয়) সকল দিক থেকে জনস্রোত এসে যেন একটি বিরাট সংগমে পরিণত হয়। অধ্যাপক পরাগ চালিহা লিখেছেন, মন্দিরের চত্বর থেকে সামনের দিকের প্রধান রাজপথ, লক্ষ্মীনাথ পথের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করলে এক মাইলেরও বেশি দূর অবধি দেখা যায় কেবল মানুষের মাথা। যোরহাট থেকে চল্লিশটির মতো, ডিব্রুগড় থেকে ত্রিশটি এবং শিমুলগুড়ি থেকে প্রায় দশটি সরকারী বাসযাত্রীদের বহন করে নিয়ে আসে। এতদ্ব্যতীত প্রাইভেট বাস ও অন্যান্য যানবাহন তো আছেই। এসব যাত্রীরা আসে দেশ ও ভাষা নির্বিশেষে, নানা সম্প্রদায়ের লোক তারা, বিচিত্র তাদের জীবন ও জীবিকার ধারা। দোল সমিতি মেলা নিয়ন্ত্রণ করে ও যাত্রীদের জন্য সকল রকম সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করে। পুরুষ ও মহিলাদের জন্য মন্দির প্রবেশের পথ পৃথক পৃথক করে দেওয়া হয়। সেবকেরা শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে যাত্রীদের মন্দিরে প্রবেশের পথ করে দেয়। মেলায় গয়নাগাঁটি, কাপড়চোপড়, ভূটীয়াও যুধবিযুধ, দা-কাটারী, মাছধরার সরঞ্জাম প্রভৃতি সব রকমের জিনিস বিক্রি হয়। অস্থায়ী ভোজনাগার-গুলি প্রচুর লাভ করে। অনেকে পুরী-তরকারী খেয়ে সারাটা দিন কাটিয়ে দেয়। স্থানীয় পুতুল-গড়িয়েরা অনেক সময় কোন মহৎ লোকের কীর্তিকলাপ মাটির পুতুলের সাহায্যে প্রদর্শন করে। প্রতিবারই একজন না একজন যাদুকর এসে উপস্থিত হয়, মুখের বুলি শুনিয়ে ও মজার 'খেল' দেখিয়ে সে চেষ্টা করে দর্শক জড়ো করতে।

অনেক জ্ঞানী গুণী সাধু ব্যক্তি এবং প্রকৃত সাধকেরাও আর পাঁচজন ভক্তদের মধ্যে মিলে মিশে ঘুরে বেড়ান। প্রতি বছর একজন শিখ সন্ত এসে গ্রন্থসাহেব থেকে অখণ্ড কীর্তন করেন। বহু শিখ যাত্রী তাঁর সংগতে যোগদান করে। দূর থেকে যারা এসেছে কিংবা যাদের কোন সংস্থান নেই—দোল কর্তৃপক্ষ তাদের আহারের ব্যবস্থা করেন। সারারাত ধরে শিবসাগরের আকাশ বাতাস 'মুক্তিনাথ বাবা কী জয়!' ধ্বনিতে মুখরিত হতে থাকে।

দরং জেলার ঢেকীয়াজুলি শহর থেকে প্রায় আট মাইল দূরে শিঙরি-তে যে শিবরাত্রির মেলা হয়—সেও খুব কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এখানেও শিবসাগরের মতো অসংখ্য ভক্তের সমাবেশ হয়। অস্থায়ী দোকান-পসার বসে। গাড়ীঘোড়া চারপাশের গ্রাম ও চা-বাগিচা থেকে যাত্রী জুটিয়ে আনে। পরিবেশটা প্রায় শিবসাগরের মতোই আনন্দমুখর হয়ে উঠে। গ্রামের মানুষেরা এখানে হরিসভায় জমায়েত হয়ে নামগান করে, ভাওনা অভিনয় করে। এখানকার মন্দির খুব বেশি বড় নয়, উচ্চতায় মাত্র 15 ফুট। বিগ্রহের নাম গোপেশ্বর। ধান কেটে গোলায় তোলার সময় আশেপাশের চাষীরা এই মন্দিরে এসে গোপেশ্বরের নামে কিছু শস্য উৎসর্গ করে, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্য 'ভোগ' দেয়। শিঙরি পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত গোপেশ্বর মন্দির দেখতে অবিকল শিবদোলের মতো। এখানেও একটি কুণ্ড আছে এবং শিব নাকি সেই কুণ্ডে গুপ্তভাবে থাকেন। সেই জন্য তিনি এখানে গুপ্তেশ্বর শিব নামে পরিচিত। এমনও বলা হয় যে, তেজপুরের বাণরাজা গোপনে শিবকে পূজা দেবার জন্য এখানে এসেছিলেন। গোপেশ্বর নামটা গুপ্তেশ্বরেরই রূপান্তর। শিঙরি পর্বত ভূটীয়া বৌদ্ধদের কাছেও পবিত্র তীর্থ। প্রতি বছর তারা এখানে দলে দলে আসে তীর্থ করতে। যে বছর তাদের আত্মীয়স্বজনের মৃত্যু হয় সেই বছরের মাঘ-ফাল্গুন মাসে তারা এই মন্দিরে এসে তাদের পারলৌকিক কৃত্যাদি করে থাকে।

আসামের বিভিন্ন পর্বের মধ্যে অশোকাষ্টমীতে অনুষ্ঠিত শুদ্ধীকরণ স্নানও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ব্রহ্মপুত্র নদে যেমন নানা দিক থেকে উপনদীরা এসে মেলে, তেমনি ব্রহ্মপুত্রের উভয় পার থেকে স্নানযাত্রীদের জনস্রোত ভোর থাকতে দলে দলে ব্রহ্মপুত্রের দিকে ধাবিত হয়। এই দৃশ্যটি চমৎকার। তেজপুরের অপর দিকে ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ পারে অবস্থিত শিলঘাটে এবং গৌহাটির উত্তরপশ্চিমে ব্রহ্মপুত্রের উত্তর পারে অবস্থিত শুয়ালকুচিতে বড় বড় মেলা বসে। এই শুদ্ধি স্নানের উদ্ভব সম্পর্কিত কাহিনীটি খুবই চমকপ্রদ। জমদগ্নি রাম পিতার আদেশে মাতা রেণুকাকে

কুঠার বা পরশুর আঘাতে হত্যা করেছিলেন। মাতৃহত্যার পাপে পরশু তাঁর হাতে লেগে থাকে। পুনরায় পিতার আদেশ অনুসারে হস্তধৃত পরশুর সাহায্যে জমদগ্নি রাম ব্রহ্মকুণ্ডের পার কেটে একটি নদীর ধারা বইয়ে দিলেন। সেই নদীই পূত পবিত্র ব্রহ্মপুত্র। এইভাবে তাঁর মাতৃহত্যা পাপের স্খালন হল, পরশু তাঁর হাত থেকে খসে পড়ল। বিরাট নদ প্রবাহিত হয়ে চলল, কিন্তু সেই পার্বত্যনদীর খরধার স্রোতে ভেসে গেল অশোব ঋষির আশ্রম। রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে মুনি অভিশাপ দিলেন, ব্রহ্মপুত্র নদের পবিত্রতা আর থাকবে না। পরম ত্রাসে ব্রহ্মপুত্র ঋষির কাছ থেকে ক্ষমা ভিক্ষা করলেন। অশোকমুনির মন একটু নরম হল, তিনি তখন বিধান দিলেন বছরে কেবল একটি দিনের জন্য ব্রহ্মপুত্র পুণ্যতোয়া হবে। চৈত্রমাসের সেই অষ্টম দিনের সঙ্গে মুনির নাম চিরস্মরণীয় রাখতে গিয়ে সে দিনটিকে বলে অশোকাষ্টমী। ওই দিনে সীতাদেবীরও জন্ম হয়েছিল বলে সীতাষ্টমীও বলা হয়। গঙ্গা ও অশোক ফুলের সঙ্গেও এই শুদ্ধি স্নানের সম্পর্ক আছে। অশোকাষ্টমীর দিন ব্রহ্মপুত্রে স্নান করলে গঙ্গাস্নানের পুণ্য অর্জিত হয়। যারা মৃত আত্মীয়স্বজনের অস্থি গঙ্গায় বিসর্জন দিতে চান, অশোকাষ্টমীর দিন তারা সে অস্থি বিসর্জন দেন ব্রহ্মপুত্রের জলে। যথাবিহিত মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক অনুষ্ঠানিকভাবে ব্রহ্মপুত্রে ডুব দেবার পর আপনি অশোকফুলের দু-একটি কলি চিবিয়ে খেয়ে ফেলুন, আপনার সকল পাপ ধুয়ে মুছে শেষ হয়ে গেল ; আপনি সকল শোকদুঃখ ভুলে গিয়ে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হলেন। অবশ্য একটা শর্ত আছে। এই সমস্ত কাজ আপনাকে পবিত্র মনে করতে হবে আর আপনার সকল ইন্দ্রিয়গ্রাস কঠোর ভাবে দমন করতে হবে। শিলঘাটে ব্রহ্মপুত্রের বিস্তীর্ণ বালুতটে হাজার হাজার লোক তিন-চার দিন আগের থেকেই জমায়েত হয়। শুদ্ধিস্নানের পর শিলঘাটের স্নানযাত্রীরা আঁকাবাঁকা পাথরের রাস্তা দিয়ে পাহাড়ের মাথায় অবস্থিত একটি মন্দিরে গিয়ে কালী ও দুর্গা দেবীকে পুজো দেয়। সেখানে মন্দিরের পূজারী ও অন্যান্য সেবকেরা অগণিত ভক্তকে তুষ্ট করার জন্য অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ছোটখাটো নানা জিনিস বেচবার জন্য সেখানে অস্থায়ী দোকানপাট বসে।

শুয়ালকুচি গ্রামটি পৃথক ধরনের গ্রাম—এত বড় গ্রাম বড় একটা দেখা যায় না। এখানকার 'পাট কাপোর অর্থাৎ আসামের বিশেষ ধরনের রেশমে বোনা কাপড় বহুখ্যাত ও বহুল প্রশংসিত। শুয়ালকুচি তাঁতীদের গ্রাম। এখানকার ঘন বসতিপূর্ণ সংকীর্ণ পথগুলি নানা বর্ণের সুতোর গাঁটে ভর্তি। রাস্তার দু'-ধারে গাঁটগুলি স্তূপ করা। সারাদিন সারারাত ধরে তাঁতবোনা ও মাকু-চলার খটাখট্ শব্দে এখানকার আকাশ-বাতাস মুখরিত। এই গ্রামে গেলে আপনি দেখতে পাবেন লোকেরা হয় তকলি

কাটছে কিংবা বৈষ্ণব নামঘরে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছে। অশোকাষ্টমী মেলার একদিন আগে গ্রামের মাতব্বরেরা ব্রহ্মপুত্রের পারে গিয়ে মেলা বসানোর উপযোগী একটা জায়গা বেছে নেয়। চারিদিকের মন্দির থেকে যেসব বিগ্রহ আসবার কথা, তাঁদের জন্য মেলা প্রাঙ্গণের একটা অংশ আলাদা করে রাখা হয়—স্পর্শদোষ থেকে মুক্ত রাখার জন্য। দোকানপাটের বেপারীরা রাতটা মেলা প্রাঙ্গণেই কাটিয়ে দেয়—যাতে ভোর থেকেই বেচাকেনা শুরু হতে পারে। দূরাগত যাত্রীদের গ্রামের সম্পন্ন গৃহস্থেরা নিজেদের বাড়িতেই অতিথি করে রাখে। তারা যদি আত্মীয়-স্বজন হয় তবে তো খাওয়া-দাওয়া নিয়ে কোন সমস্যা হয় না, তা যদি না হয় তাহলে সিধা দেওয়া হয় স্বপাক করার জন্য। গ্রামের মানুষ আগের থেকে অশোক ফুল সংগ্রহ করে রাখে নিজেদের ব্যবহারের জন্য এবং অতিথিদের জন্য। ভোর থাকতে স্নান করাটা প্রশস্ত বলে মনে করা হয়। ভোর হতেই দেখা যায় ব্রহ্মপুত্রের বালুতট লোকে লোকারণ্য, নদীর বুকে ভাসছে অসংখ্য ছোট ছোট নৌকা। সমস্ত জায়গাটা আবালবৃদ্ধবণিতার একটি সাগরে পরিণত হয়। ভক্তদের কাঁধে চৌদলা চড়ে দেবতারা একে একে যখন আসতে শুরু করেন উৎসবের পরিবেশ জমজমাট হয়। মাধব, কেদার, কামেশ্বর, ভৃঙ্গেশ্বর, ধীরেশ্বর ও সিদ্ধেশ্বর মন্দিরের বিগ্রহগুলি এইভাবে বিশেষ আড়ম্বরের সঙ্গে খোল-করতাল বাজিয়ে বাজিয়ে নিয়ে আসার পর, তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে এক সারিতে স্থাপন করা হয়। সবকটি বিগ্রহ এসে পৌঁছুলে পর তাঁদের সবাইকে নিয়ে ব্রহ্মপুত্রের জলে স্নান করানো হয়। স্নানান্তে আবার তাঁরা এক সারিতে আগের মতো বসে থাকেন। একই সময়ে এতগুলি দেবতা একত্র হবার ফলে ভক্তের কাছে মেলা-প্রাঙ্গণ যেন স্বর্গে পরিণত হয়। দেবতাকে দর্শন করে তাঁকে প্রণাম নিবেদনের জন্য সকলে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে, সবাই এগিয়ে যেতে চায়। কিন্তু ভক্তেরা সংখ্যায় এত বেশি যে শেষ ভক্তের শেষ প্রণামের সঙ্গে দিনাবসান হয়ে যায়। বছরের এই সময়টাতে সাধারণত 'পছোয়া' অর্থাৎ পশ্চিমা বাতাস বয়। অশোকাষ্টমীর দিনটা এগিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমা বাতাস সারা আকাশ ঢেকে দেয় পাতলা ধুলোর আস্তরণে। বাতাসে জোর থাকলে অনেক সময় নদীতে নৌকা বওয়া অসাধ্য হয়ে যায়, ফলে বাতাস শান্ত না হওয়া পর্যন্ত ওপারের যাত্রীদের মেলা-প্রাঙ্গণে বসে অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় থাকে না। অন্যান্য গতানুগতিক পণ্য ছাড়াও স্থানীয় কুমোরেরা রঙবেরঙের পুতুল গড়ে মেলায় বেচতে আসে, স্থানীয় চাষীরা বেচে তাদের ক্ষেতের ফসল।

কামাখ্যায় অনুষ্ঠিত অপর একটি উল্লেখযোগ্য উৎসব হল—দেবধ্বনি। শ্রাবণের

শেষ দিন থেকে ভাদ্রের দ্বিতীয় দিন অবধি এই তিনদিন ব্যাপী উৎসবের মেয়াদ। এ উৎসব মনসা বা 'মারৈ' পূজার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সর্পদেবী মনসাকে আসামের গোয়ালপাড়া, কামরূপ, দরং ও নগাঁও জেলার বহু লোকে পূজা করে। শুয়ালকুচি ও পসরিয়া গ্রামে এই পূজা-উৎসব চলতে থাকে পাঁচ দিন ধরে। কিছু লোক কোন নির্দিষ্ট দিনে পূজা করে না, কেউ কেউ আবার বছরে দু'বার পূজার আয়োজন করে। দেবী নিঃসন্তানকে সন্তান পাওয়ার বর দিতে পারেন, নির্ধনকে দিতে পারেন ধনৈশ্বর্যের বর। ভয়াবহ রোগ ও মহামারীর তিনিই অধিষ্ঠাত্রী দেবী। 'মারৈ' কথাটা মড়ক বা মহামারী থেকে উদ্ভূত হওয়া সম্ভব। দক্ষিণ ভারতে মারাম্মা ও মারী আম্মাকে বলা হয় কলেরা ও বসন্তের মতো মারাত্মক রোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। মাতৃকা দেবীর ধারণা মনসার প্রভাব বিস্তারে সহায়ক হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু কামাখ্যাধামের আচার অনুষ্ঠানে মনসাদেবী কি করে এমন গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করলেন, সে কথা বলা শক্ত। শ্রীউমেশচন্দ্র শর্মা একটি প্রবন্ধে লিখেছেন, প্রথম প্রথম মনসা সর্বশক্তিমতী কামাখ্যাদেবীর অনুগ্রহ লাভে বঞ্চিত ছিলেন। গৌহাটি থেকে ছাব্বিশ মাইল উত্তরে অবস্থিত হাজো শহরে দুর্গাবর নামে একজন কবি ছিলেন। পরে তিনি কামাখ্যাবাসী হন। এই কবি মনসার বিষয়ে একটি পুঁথি লিখে দেবীর পূজা-প্রচারে যত্নবান ছিলেন। কামাখ্যায় দেবধ্বনি উৎসবের তিনটি দিনেই এই পুঁথি পাঠ করা হয়। বিভিন্ন স্থানে মনসা পূজার বিভিন্ন ও জটিল পদ্ধতি আছে। এই পূজায় ব্রাহ্মণ পুরোহিত নিয়োগ করা হয়, জীবজন্তু বলি দেওয়া হয়—এমন কি ওজা-পালির মতো সারা রাত ঘুরে ঘুরে নৃত্যগীতও হয়। স্ত্রীলোকেরা আনুষ্ঠানিক ভাবে নদী কিংবা পুকুর থেকে জল তুলে আনে এবং একটা সাধারণ বিবাহের মতো নানারকম আচার অনুষ্ঠানে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। খোল বাজানো হয়, শিঙ্গা বাজানো হয়, শঙ্খঘণ্টা বাজে, আবার কখনো বন্দুক পর্যন্ত দাগা হয়ে থাকে। সর্বপ্রথমে ধর্মপূজা হয়, তার পরে হয় পঞ্চ দেবতার পূজা (এই পঞ্চ দেবতা হলেন গণেশ, দিনেশ অর্থাৎ সূর্য, বাসুদেব, শিব ও পার্বতী)। সর্বশেষে পূজা দেওয়া হয় অষ্টনাগকে (অনন্ত, বাসুকী, তক্ষক, কর্কট, শঙ্খ, পদ্ম, মহাপদ্ম ও কুলীর—এরা হলেন অষ্ট নাগ)। আরো কয়েকজন স্থানীয় মাহাত্ম্য সম্পন্ন দেবতাকেও পূজা করা হয় মনসার সঙ্গে। কামাখ্যার ভক্তেরা অষ্টনাগ মাটির মূর্তি উৎসর্গ করে থাকে। কিন্তু মনসা দেবীর কোন মূর্তি থাকে না। দেবীর নামে পুরোহিতই সকল অনুষ্ঠান পালন করে থাকেন। এই উৎসবের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল প্রত্যাদিষ্ট দেওধাদের ভাবাবেগে নৃত্য। এই নৃত্যকে বলে 'জ‍ঁকি উঠা' নৃত্য অর্থাৎ দশায়



চিত্র ১—বেহ-দিউ-খ্লাম উৎসব, জয়ন্তীয়া

চিত্র 6—কামাখ্যা



। মন্দির, গৌহাটি





চিত্র 7—মোষের যুদ্ধ : বিহুর খেলায় বড় আকর্ষণ

চিত্র 8—অসমীয়া অলঙ্কার ↓



পাওয়া নৃত্য। দেবালয়ের এইসব নর্তক হল এক বিশিষ্ট শ্রেণীর নাচিয়ে—এরা আসে সমাজের অতি সাধারণ স্তর থেকে। কামরূপের পুরোহিত শ্রেণীর সঙ্গে এদের কোন সম্বন্ধ নেই। মন্দির থেকে কোন বিশেষ সুযোগ-সুবিধাও এরা ভোগ করে না। শ্রীউমেশচন্দ্র শর্মা তাঁর বইয়ে উল্লেখ করেছেন, বিলাসপুরের একজন সাঁওতালের কথা—সে নাকি ছ'বছর ধরে দেওধারূপে নৃত্য করেছিল। আরেকজন বিহারী নেচেছিল কুড়ি বছর ধরে। দেব-দেবীরা নাকি কেবল তাদের কাছেই আবির্ভূত হন। প্রত্যেক দেব-দেবীর নিজস্ব দেওধা থাকে। দেওধাকে জ"কি কিংবা ঘোড়াও বলা হয়। অসমীয়া ভাষায় 'জ"ক উঠা' মানে আধ্যাত্মিক প্রেরণা অনুভব করা অথবা ভূতগ্রস্ত হওয়া। সুতরাং জ"কী মানে দেব-দেবী যার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েছেন এমন কোন লোক। 'ঘোড়া' অর্থে দেব-দেবী যার পিঠে চড়েছেন অথবা দেবদেবী যার উপর ভর করেছেন। দেওধারা একমাস কাল শুচিশুদ্ধ জীবন যাপন করে, স্বল্প পরিমাণে আহার করে এবং নির্জনে থাকতে ভালোবাসে। ঢোল-শিঙ্গার শব্দ কানে প্রবেশ করা মাত্র সে তার ঘর ছেড়ে ছুটে আসে মন্দির চত্বরে। সেইখানে তার স্বর্গীয় নৃত্য শুরু হয়। এমনকি রোগাক্রান্ত দেওধা যদি সেই বাদ্য শুনতে পায়, এক লাফে শয্যা ছেড়ে বেরিয়ে গিয়ে উন্মাদের মতো নাচতে থাকে। নাচের সঙ্গে সঙ্গে তার ব্যাধি দূর হয়ে যায়। মনসা পূজার প্রথম দিনটিতে সকল দেওধাই মহাদেবের মন্দিরে নাচে। এই অনুষ্ঠানে অগ্রাধিকার পায় শিবের ঘোড়া অর্থাৎ শিব যার উপর ভর করেছেন। উৎসবের শেষ দুটো দিন কামাখ্যা মন্দিরের যথা নিয়মিত পূজা অর্চনা হয়ে যাবার পর আবার ঢোল-শিঙ্গা বেজে ওঠে। সেই শব্দ দেওধাদের টেনে আনে, তারা না এসে থাকতে পারে না। কিছুক্ষণ নাচবার পর তারা নিজ নিজ দেব-দেবীর মতো সাজসজ্জা করে, তাঁদের মতোই গলায় মালা পরে এবং নিজ নিজ মন্দিরে গিয়ে ভক্তি-শ্রদ্ধা নিবেদন করে। সেই অবস্থায় দেওধারা নাকি ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে। ভক্তেরা পায়রা, পাঁঠা ও বস্ত্রাদির অর্ঘ্য দিয়ে নিজেদের ভাগ্য গণনা করিয়ে নেয়। দেওধারা উপর-মুখ-করা দা-এর উপর নাচতে পারে, হাঁ করে মশালের আগুন মুখে পুরে দিতে পারে, পায়রা কিম্বা পাঁঠা বলি হয়ে গেলে তাদের রক্ত পান করতে পারে। মেঠাই মণ্ডা, ডাবের জল, কাঁচা মাংস ইত্যাদি যা কিছু ভক্তেরা তাদের কাছে নিবেদন করে তারা সবকিছু বিনা দ্বিধায় উদরসাৎ করতে পারে। দেওধারা যখন নাচে তাদের হাতে থাকে ঢাল তরোয়াল কিংবা লাঠি। নাচতে নাচতে তারা সমস্তটা রাত পার করে দেয়।

ছয়

মৌখিক সাহিত্য

অসমীয়া সাহিত্যের ইতিহাস একখানা হাতে নিলে দেখতে পাবেন, মৌখিক সাহিত্য বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে লেখক শুরু করেছেন বিহুগীত দিয়ে, তার পর গেছেন বিয়ানামের প্রসঙ্গে এবং তার পরে ঘুমপাড়ানী ও ছেলে ভুলানো ছড়ায়। এই ক্রমটা যেন স্বাভাবিক। বিহু উৎসবের সময় যুবক-যুবতীরা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে এবং অর্থপূর্ণ নৃত্যগীতের মধ্যে দিয়ে প্রেমের ভাব প্রকাশ করে। বিয়ে একটা লাগলেই স্ত্রীলোকেরা মুখে মুখে বিয়ানাম রচনা করে এবং সেগুলি গেয়ে নিজেদের কৃতিত্ব প্রমাণের সুযোগ যায়। তারপর যখন ছেলেমেয়ে জন্মায়, মা-মাসি পিসি-দিদিমা-ঠাকুমারা ঘুমপাড়ানী ও ছেলে ভুলানো ছড়া আউড়ে শোনায়।

বিহুনাম বা বিহুগীতের দুটি দিক আছে। কিছু কিছু গান কেবল উৎসব উপলক্ষেই গাওয়া হয়। বিহু সার্বজনিক উৎসব, সকলেই এ উৎসবে যোগ দিতে পারে। কাজে কাজেই সামাজিক স্তরে যখন বিহুগান হয়, সে সব গানে সচরাচর অশ্লীলতা কিংবা আপত্তিজনক কিছু থাকতে পারে না। হুচরি দল যখন উঠোনে এসে জমায়েত হয়, তাদের সকলে চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে প্রথমে বিশেষভাবে রচিত ধর্মসঙ্গীত গান করে। তার পরেই আসে বিহুগান ও বিহুনাচ। ঢোল ও বাঁশের বাদ্যযন্ত্র সহযোগে তখন যেসব গান হয় তার বেশির ভাগই এই উৎসবের প্রশংসা সূচক। যথা :

চ'তে গই গই   ব'হাগে পালেহি
ফুলিলে ভেবেলি লতা ;
কৈনো থাকোঁ মানে   ওরকে নপরে
ব'হাগর বিহুরে কথা।

o

চৈত্র চলে গিয়ে   বৈশাখে পড়ল
ফোটে দেখি ভেবেলি লতা,
যতই না বলা হয়   বলা শেষ হয় কই
বৈশাখী বিহুটির কথা।



চোলে বায় ঢুলীয়া   খোলে বায় খুলীয়া
কার ঘরর নাচনী নাচে ;
ওচর চাপি চাপি   নাহিবা নাচনী
তোমার গাত মোহনী আছে।

o

ঢোল বাজায় ঢুলীরে   খোল বাজায় খুলীরে
কার বাড়ির নাচুনী নাচে,
ও নাচুনী এসো না   কাছাকাছি চেপো না
দেহে তোমার মোহিনী আছে।

কিন্তু তার মানে এই নয় যে, যুবক-যুবতীরা তাদের প্রেম ও যৌবনের গান গাইবে না। ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে, বিহু উৎসবকে অতীতের কোন উর্বরতা উৎসবের অবশেষ বলে গন্য করা হয়। এই উৎসবের মধ্যদিয়ে আদিম মানুষ মাতা বসুমতীর শস্য-প্রজননের ক্ষমতা সঞ্জীবিত করতে চেয়েছিল। আরো বলা হয়েছে যে, বিহু উৎসবের শেষ দিকটাতে বিভিন্ন গ্রামের যুবক-যুবতীরা প্রবীণদের দৃষ্টি এড়িয়ে নির্জন বনে-উপবনে একত্র হয়ে প্রাণ ভরে নাচ গান করে থাকে :

এপর দুপর করি   রাতি পার হ'ব
আমার বিহুত আমনি নাই ;
রাতি পরে পরে   ফেঁচাই কুরুলিয়ায়
আমার বিহু ভাঙোতা নাই।

o

প্রহরে প্রহরে রাতি   হয়ে যায় শেষ
বিহু নাচে শেষ নেই কোনো,
পেঁচা ওই থেকে থেকে   রাতেরে কেবল বকে
নাচে বাধা দেয় না কখনো।



যোয়াটো বিহুতে   গগণা খুজিলোঁ
ইবেলিও নিদিলা সাজি;
তোমারে গগণা   আমাকো নালাগে
দিয়াগৈ সিজনীক সাজি।

O

গত বিহু বলেছিনু গড়ে দিস্ মোরে বেণু
এবারেও দিলি না আমাকে.
থাক তবে বেণু তোর চাই না চাই না মোর
দে না গিয়ে ওই মেয়েটাকে।

আর একটি বিহুগীতে বলা হয়েছে :

ত'তে শুনিলোঁ সুরতে বুজিলোঁ
মোর ধনে গগণা বায় ;
কিনো অমাতরে মাতে মোর চেনাই ঐ
বুকেদি সরকি যায়।

O

ওই খানে শুনলাম, সুর শুনে বুঝলাম
ধন মোর বাঁশরী বাজায়,
কোনো কথা নাহি বলে, সে আমায় ডেকে চলে
বুক খানা ফেটে বুঝি যায়।

এবার বিহুগীতের অন্য দিকটার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া যাক। এই সব গীতকে বলা হয় 'বনঘোষা' বা 'বনগীত', যার অক্ষরিক অর্থ হল 'বন্য' গীত। এইসব গীতে উদ্দাম প্রেমের ভাব থাকায় সম্ভবত এই ধরনের নামকরণ। বনঘোষা বছরের যেকোন সময়েই গাওয়া চলে। তরুণ রাখাল যখন মোষের পিঠে চেপে জনহীন বিরাট প্রান্তরে খালবিলের ধারে কাছে তার গরু-মোষ চরায়, যখন সে জঙ্গলে ঢুকে কাঠ কাটতে যায় কিংবা দিনের শেষে সে যখন গরু-মোষের পাল নিয়ে বাড়িমুখো হয়, সেকসপীয়র-এর সেই ছত্রের মতো, 'ব্যাকুল হৃদয়ের সমস্ত বেদনা ঢেলে দিয়ে' সে বনগীত গেয়ে থাকে। সোজা সরল ও স্পষ্ট এই সব গানের আবেদনে, কথায় অনেক সময় সূক্ষ্ম কাব্যিক সৌন্দর্য প্রকাশ যায়। নিরক্ষর লোকেরা এই সব গান মুখে মুখে রচনা করে, মুখে মুখেই এই সব গান চালু হয়ে যায়, কবে যে কে এসব গান বেঁধেছিল তাদের নাম কেউ জানে না। সহজ সরল এই সব গানে যৌন-প্রণয়ের কথা সোজাসুজি বলা হয়ে থাকে বলে, রুচিবাগীশ বিদগ্ধদের কাছে গানের বিষয় ইতর বলে মনে হতে পারে। মনের বনের গভীরে যেসব ভাব লুকিয়ে থাকে, এগুলি তারই বন্ধনবিহীন বহিঃপ্রকাশ। অধ্যাপক লীলা

গগৈ বলেছেন, 'বনঘোষা উদ্দাম যৌবনের গীতিব্যঞ্জক অভিব্যক্তি।' বসন্তের পশ্চিমী হাওয়া প্রকৃতিকে যেমন জাগিয়ে তোলে, তেমনি জাগিয়ে তোলে যৌবনকেও। 'যৌবন জীবনের অনাহুত অতিথি' এবং 'যৌবনের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে আসে যৌবনের সাঙ্গনী—প্রেম।' যৌবন বাতাসে ভেসে আসা পাতলা শিমূল তুলোর মতো, যৌবনের কামনা-বাসনাও হালকা তুলোর মতো সহজ সুরে ভেসে বেড়ায় আকাশে-বাতাসে। হৃদয়ের কথার এই বহিঃপ্রকাশ নিয়ে আপত্তি করা চলে না, কারণ :

প্রথমে ঈশ্বরে   সৃষ্টি সরজিলে
তার পিছত সেজিলে জীব,
সেইজন ঈশ্বরে   পীরিতি করিলে
আমিনো নকরিম কিয় ?

O

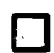
প্রথমে ঈশ্বর   সৃষ্টি সরজিল
পরে সৃজিলেন প্রাণী,।
সেই সে ঈশ্বর   প্রণয় করিল
কেন না করিব আমি ?

তরুণ গীতিকার নিশ্চয় গানের ছলে কৃষ্ণ ও শিবের নানা প্রেমলীলার কাহিনীর প্রতি ইঙ্গিত করছেন। তাঁর কবিকল্পনায় ডানা গজায় কখনো কখনো, তিনি তখন অবলীলায় বিমান-বিহার করেন :

হাঁহে হৈ চরিমগৈ   তোমারে পুখুরীত
পার হৈ পরিমগৈ চালত
ঘামে হৈ ওলামগৈ   তোমারে শরীরত
মাখি হৈ চুমিমগৈ গালত।

O

হাঁস হয়ে চরিব   তোমার পুকুরে,
পায়রা, পড়িব চালে,
ঘাম হয়ে ঢুকিব   তোমার শরীরে,
মক্ষী, চুমিব গালে।



চমকত চাবলৈ নহওঁ মই বিজুলী
নহওঁ মই বোয়ঁতী নৈ,
চরায়ো নহলোঁ উরি গলোঁহেঁতেন
দুকাষে দু'পাখি লৈ।

o

চাইব চমক মেরে আমি নই বিজুলি,
নদী নই কাছে যাব বয়ে ;
হতাম পাখি যদি যেতাম উড়ে তবে
দু'পাশে দুই ডানা লয়ে।

প্রণয়-ভাবাত্মক প্রকৃত বিহুগীত থেকে বনঘোষা বা বনগীত পৃথক করে দেখা শক্ত। বিহু উৎসবে যুবক যুবতীরা প্রায়ই বনগীত গেয়ে থাকে, বিশেষত যখন তারা বড়দের চোখের আড়ালে, বনে-উপবনে মিলিত হয়ে নৃত্যগীত করে। তেমন যখন সুযোগ আসে তারা মনের ভাব বেশ খোলাখুলি ব্যক্ত করে থাকে, যথা :

তিয়ঁহো নহলি চিরালো নহলি
চোবাই খালোহেঁতেন তোক,

o

হতিস শশা হতিস চিড়ে
চিবিয়ে খেতাম তোকে



তোমার চকুযুরি হরিণার চকু যেন
বুকুতো পদুমর চকা ;
তোমার বাহু দুটি পদুমর ঠারি যেন
রেচমর কাপোরে ঢকা।

o

তোমার যুগল আঁখি হরিণের মতো দেখি
বুক যেন কমলকোরক ;
তোমার বাহুলতা কোমল মৃণাল তা,
রেশমেতে ঢাকা হয় হোক।



বিহুর তলীতে তোমাক বাছি ললোঁ।
কঁকাল খামুচীয়া পাই।

O

বিহুতলায় গেলাম তোমায় বেছে নিলাম,
এক খাবল কোমরের বেড়।



গাত জুই জ্বলিছে সরিয়হ ফুটিছে
ধনক পানী ঘাটত দেখি।

O

আগুনে সরিষা পারা জ্বলে পুড়ে হই সারা,
ধনে মোর দেখিলাম ঘাটে।

গ্রামদেশের সমগ্র জীবনটা যেন বিহুনাম ও বনঘোষার মধ্যদিয়ে প্রতিফলিত। কারো কারো পক্ষে বহাগবিহু কেবল আনন্দ-উৎসব না-ও হতে পারে। কেউ কেউ এমনি গরিব যে উৎসবের সময় নূতন বস্ত্রখণ্ড কেনবারও সামর্থ্য নেই ; কারো হয়তো শিশু বয়সে মা মারা গেছে বলে এমন কেউ নেই যে বিহুর আয়োজনটুকু করে দিতে পারে ; কারো ক্ষেতের ধান হয়তো বন্যার জলে ভেসে গিয়েছে। বিহু-সম্পর্কিত বিভিন্ন কাজে-কর্মে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার কথাও আছে এইসব গানে। একটি গানে বলা হয়েছে গুরু ও ভক্তদের শ্রদ্ধা সম্মান দেখাতে হয়—'তেহে পাবা বৈকুণ্ঠত ঠাই', তাহলে বৈকুণ্ঠে স্থান পাবে। অপর একটি গানের সূচনায় 'দেবী সরস্বতী' ও 'হরি-র নাম নেওয়া হয়েছে, তারপর প্রণাম নিবেদন করা হয়েছে গ্রামের 'বুঢ়ামেঠা'কে —বর্ষিয়ান ভক্ত ব্যক্তিকে, সর্বশেষে রচয়িতা কোন ইতর বিষয়ে অবনমনের আশঙ্কায়, পূর্ব থেকেই শ্রোতাদের ক্ষমা ভিক্ষা করে রেখেছেন। নিরক্ষর রচয়িতারা কখনো কখনো দার্শনিকের মতো বলে থাকেন, প্রাণপাত পরিশ্রম করে ধনসম্পত্তি সঞ্চয় করে কোন লাভ নেই—কেননা সবকিছু পিছনে পড়ে থাকে, 'লগত যায় মাত্র দু চলি খরি'—শব যাত্রার সঙ্গে যায় দু চারটে চেলাকাঠ মাত্র। কখনো কখনো জাত-বেজাতের বেড়া অতিক্রম করতে না পেরে, প্রেমিক-প্রেমিকা প্রতিবাদ জানিয়ে বলে :

তোমাকে আমাকে ভেটিলে সমাজে
দুটি দেহা দুফাল করি।

O

তোমার আমার মাঝে বেড়া বাঁধে সমাজে
দুটি দেহ দুই-ফালা করি।

বিয়ের গান অর্থাৎ 'বিয়ানাম'-এর ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকদের একাধিপত্য। একটা বিয়ের কতরকম যে জটিলতাপূর্ণ আচার অনুষ্ঠান আছে—সে খবর কেবল মেয়েরাই রাখে। 'জোরোণ' বা তত্ত্ব পাঠানো থেকে শুরু করে বিয়ে হওয়া পর্যন্ত (চতুর্থ অধ্যায়ে এ সবের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে) যুবতী ও প্রবীণার দল অনুষ্ঠানের পর্ব থেকে পর্বান্তরে ব্যস্তসমস্ত হয়ে থাকে। করনীয় 'কাজ' করার সঙ্গে সঙ্গে সেইসব কাজের সঙ্গে বিশেষ ভাবে যোগযুক্ত গানও চলতে থাকে। এসব গান মুখে মুখে রচিত হয়ে দিদিমা-ঠাকুমা মারফত সকল স্ত্রীলোকের সাধারণ সম্পত্তি। সরল ভাষা ও সহজ কল্পচিত্রের সাহায্যে রচিত এইসব গান উপমা, অনুপ্রাস ও শ্লেষ-বিদ্রূপে পরিপূর্ণ। বিবাহ-উৎসবের নায়ক ও নায়িকা হল বর এবং কন্যা। গানগুলি বিশেষ ভাবে কন্যাকে কেন্দ্র করে রচিত। মেয়ে যে পরের বাড়ি চলে যাবে—সেকথা ভাবলেই দুঃখ না হয়ে পারে না। নিজের জন্মস্থান ছেড়ে নিতান্ত তার আপনজনদের ছেড়ে, চিরদিনের জন্য একান্ত অজানা শ্বশুরবাড়ি যাবার জন্য সে যে পা বাড়াচ্ছে—ভাবতেও কান্না পায়। কুটনো কুটতে গিয়ে তাই গান গাওয়া হয় :

কেনৈ কুটিলা চুমৈকৈ পচলা
লোকে বাটি ভরাই খাব ;
কেনৈ তুলিলা রূপহী আইদেউক
লোকে বনে করাই খাব

O

কেন থোড় কাটলে এমন মিহি করে
অন্য লোক খাবে বাটি ভরে ;
কেন কাজ সেখানে রূপসী ওই মেয়েকে
খাটবে গিয়ে অন্য কার ঘরে।

☐

কালি এতেবেলি আহিলা আইদেউ[1]
মারার পালেঙত শুই ;

1. আহোম আমলে রাজা কিংবা সম্ভ্রান্ত পরিবারের বিবাহিত ও অবিবাহিত মেয়েদের বলা হত আইদেউ—অর্থাৎ মা-দেবী। পরপৃষ্ঠায় বাংলা অনুবাদে 'মামণি' কথাটা ব্যবহৃত হয়েছে।

আজি এতেবেলি যাবলৈ ও লালা
অৰণ্যত লগালা জুই।

o

কালকে এসময় ছিলে তুমি মায়ণি
মায়ের বিছানায় শুয়ে,
আজকে এ সময় ঘর ছেড়ে বেরোলে
পুড়ে যায় সব দাবদহে।

আরো সব বিয়ানামে বলা হয়েছে যে মাণণির হাতের কঙ্কণ গড়বার জন্য স্যাকরার হাতুড়ি নিত্য ঠক ঠক আওয়াজ তোলে ; কন্যার বিয়ের শাড়ি এমন মিহি যে মুঠোর মধ্যে ভরা যায়, ছায়াতে শুকোয় সেই শাড়ি ; সে যখন জড়ির বুটিদার মেখলা পরে তখন সারাদেশের কোন রূপসী তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না। বিবাহের বিভিন্ন পর্বের উপযোগী বিভিন্ন বিয়ানাম আছে: যেমন কন্যার আনুষ্ঠানিক স্নানের জল তুলে আনার গান, কন্যার বাড়িতে সমাগত বরের অভ্যর্থনার গান, বরকন্যার হোমের জায়গায় বসানোর গান এবং কন্যার পতিগৃহ যাত্রার গান। এসব গান বিবাহের কার্যসূচির অন্তর্গত—এসবের বাইরেও এক ধরনের গান হয়, যাকে বলে 'যোয়ানাম' কিংবা 'খিচাগীত'। পূর্বাঞ্চলে বলে 'যোরানাম' এবং পশ্চিমের জেলাগুলিতে 'খিচাগীত'। এসব গান হল হাসিকৌতুকের গান—কন্যা-পক্ষের মেয়েরা বর ও তার ছোট ভাই-বোন নিয়ে ঠাট্টা মশকরা করে, পাল্টা জবাবে বরপক্ষের মেয়েরা কন্যাপক্ষকে এক হাত নেয়। কখনো কখনো বরকে বলা হয় 'জপরা' (ঝাঁকড়া চুলো), বলা হয় 'লুভিয়া' (লোভী বা পেটুক)। যথাসময় যথাস্থানে মুখে মুখে এই রকম 'জাগসই' গান রচনা করা হয়। বেচারা পুরোহিতও বিনাদোষে অনেক সময় বাক্যবাণে বিদ্ধ হন :

বিধি পঢ়ে বাপুদেয়ে মাজে মাজে এরে
ঘরত আছে থালৈপেটী তালৈ মনে পরে।

o

কিছু মন্তর হাড়ে ঠাকুর, কিছু মন্তর পড়ে,
ঘরে আছে নাদাপেটী, তারে মনে পড়ে।

☐

পূজা করোঁ বুলি বাইকহ বামুণে
মধুপর্ককণো থালে।

O

কাণ্ড দেখো, রাক্ষস বামুন পুজো করবে বলে,
মধুপর্ক-পাত্রখানা গলায় দিল ঢেলে !

ডক্টর মহেশ্বর নেওগ একটি বিয়ানামে বৈদিক যুগের প্রভাব লক্ষ্য করেছেন। এই গানটি কন্যার আনুষ্ঠানিক স্নানের বিষয়ে : মা-মণির স্নান যেই সারা হয়, ইন্দ্র তাঁকে জোগান দেবাঙ্গ ভূষণ। স্নান সেরে মা-মণি যখন মাথা নত করে প্রণাম করেন, স্বর্গ থেকে দেবতারা তাঁকে আশীর্বাদ করেন। প্রণাম সেরে মা-মণি যখন হাত যোড় করে দাঁড়ান, ইন্দ্র তাঁর হাতে অর্পণ করেন পারিজাত পুষ্প। মা-মণি তখন ইন্দ্রের কাছে এই বর ভিক্ষা করেন যে জন্মে জন্মে যেন দামোদরের মতো তাঁর স্বামী হয়। অবশ্য বৈদিক আর্যেরা কেবল এক ইন্দ্রকে নয়, সূর্য, বরুণ, অগ্নি, সোম ও মরুৎকেও পুজো দিত। ধর্মবিশ্বাসের পরিবর্তনের ফলে অসমীয়া মা-বোনেরা হয়তো আর সব দেবতার কথা ভুলে গিয়ে কেবল ইন্দ্রের নামটাই মনে রেখে থাকবেন। নবদম্পতিকে সাধারণত কৃষ্ণ-রুক্মিনী, হর-গৌরী, রাম-সীতা, অর্জুন-সুভদ্রা, ঊষা-অনিরুদ্ধ প্রভৃতি আদর্শ দম্পতিদের সঙ্গে তুলনা করা হয়। দেব-দেবীর নামে ছেলেমেয়ের নাম রাখলে, পুত্র কন্যার বিবাহে দেব-দেবীর নাম নিলে, হয়তো তারা ভূতপ্রেতের সংস্পর্শ থেকে রক্ষা পেতে পারে-এমন একটা বিশ্বাসও—হয়তো মনের ভিতরে কাজ করে থাকে।

'ধাইনাম' বা 'নিচুকনী' গীত গাওয়া হয় ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য। ধাই বা দাই থেকে এসেছে 'ধাইনাম', শিশুকে ভোলাবার জন্য শিশুর দেখাশুনো তদারকিতে রত দাই বা দাসীদের গান হল 'ধাইনাম'। 'নিচুকনী' কথার অর্থ হল ক্রন্দনরত শিশুকে নীরব বা শান্ত করার জন্য গান গাওয়া কিংবা ছড়া কাটা। ঘুমপাড়ানি গান, ছেলেভুলানো ছড়া ও খেলাধূলার ছড়া এই শ্রেণীর সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত বলে ধরা হয়। শিশুর মনোরাজ্যে ও রূপকথার দেশে যেমন যুক্তি-বিচারের বালাই নেই, এই ধরনের সাহিত্যে তার প্রতিফলন দেখা যায়। দাই-মা'রা অনেক সময় নিজের শিশুটিকে আর কোথাও রেখে, পরের বাড়ির শিশুকে বুকের দুধ খাইয়ে মানুষ করে তোলে। লালনপালনের শিশুটি ঘুমিয়ে পড়লে সে ছুটি পায় নিজের শিশুর কাছে যাবার জন্য। অনেক সময় দুটি শিশুই এক ঘরে ঘুম যায়—একটি বিছানায়, একটি মাটিতে। দাইমার স্নেহ তখন দ্বিগুণ হয়ে তার গুন গুন গানের মধ্যে আশ্চর্য কোমল হয়ে প্রকাশ পায়। এই সব গানের মধ্যে নূতন জগতে নবাগত শিশুর ভয় ও বিস্ময়, আনন্দ ও সংশয় নিপুণভাবে রূপায়িত :

শিয়ালী এ নাহিরি রাতি
তোরে কান কাটি লগাম বাতি;
শিয়ালীয় মূররে মরয়া ফুল
শিয়ালী পালেগৈ রতনপুর।

o

শিয়ালী, তুই এলে রাতি
কান কেটে তোর জ্বালাই বাতি ;
শিয়ালীর মাথায় মরুয়া ফুল,
শিয়ালী গেল রতনপুর।

আর একটি ছড়ায় একজন শিশু তার চাঁদ-দিদিকে আব্দার জানিয়ে বলছে তার একটি ছোট্ট তারা চাই। চাঁদ দিদি বলছে, পাতা নেই, লতা নেই, মোড়ক বেঁধে কী করে পাঠাবে তারা! ওদিকে আবার হলদে পাখি খাচ্ছে বাওধান আর শ্বশুরের ছেলে সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে চলে যাচ্ছে নৌকা বেয়ে। নৌকা করছে টলমল। সন্ধ্যাবেলা মন্দিরে মন্দিরে বাদ্য বাজছে। তৃতীয় একটি গীতে বলা হয়েছে :

লাই হালে-জালে আবেলি বতাহে
লফা হালে-জালে পাতে
আমারে মইনা হালিছে-জালিছে
কালি দুপরর ভাতে।

o

লাই শাক হেলে দোলে বিকেল বাতাসে
লাফা শাকের হেলে দোলে পাতা ;
সোনা আমার হেলে দোলে যখন মনে পড়ে
কাল দুপুরে ভোজ খাবার কথা।

এই সমস্ত ভাব যে পরস্পর সম্বন্ধ বিবর্জিত, সে তো সহজেই বুঝতে পারা যায়। কিন্তু ভর সন্ধেবেলা শিয়ালী যদি বাড়িতে এসে হাজির হয়, শিশুর পক্ষে সেটা যে ভয়াবহ হবে—এতে আর বিচিত্র কী! এখন যদি কেউ শিয়ালীর কান দুটো কেটে তাকে রতনপুরে পালিয়ে যেতে বাধ্য করে, ভয়ে কাতর শিশু তাহলে নিরুদ্বেগ হয়। সবুজ ধানের ক্ষেতে এক ঝাঁক নানা রঙের পাখি এসে পড়তেই শিশুর মন তার পরিচিত জগৎ ছেড়ে অনেক দূরে উড়ে যায়। তারপর সন্ধ্যার আবছায়ায়

শ্বশুরপুত্রটি যদি নিস্তরঙ্গ নদীর জলে নাও বেয়ে বাড়ির দিকে বাঁক নেয়, তা হলে শিশুর চোখ তো আপনা থেকেই ঘুমে জড়িয়ে যাবে। আজ বিকেলবেলা যেসব উপাদেয় শাকের গাছ বাতাসে হেলছে ও দুলছে, সেই সঙ্গে কালকের দুপুরের আহারে স্বাদ মুখে যদি লেগে থাকে, তা হলে দোল দোল দুলুনি করতে করতে ঝিমুনি আসতে বাধা। এইভাবেই গ্রাম্যমেয়েরা শিশুমনের মনস্তত্ত্বে তাদের সহজাত বোধ থেকে তাদের কান্নাকাটি রাগ-অভিমানের নিরসনঘ টিয়ে থাকে। শিশুর হয়তো বেশ খিদে পেয়েছে, অথচ সন্ধেবেলার খাবার তখনো তৈরী হয়নি। পাছে না খেয়ে অসময়ে শিশু ঘুমিয়ে পড়ে, তাই তাকে জাগিয়ে রাখবার জন্য দিদিমা-ঠাকুমারা নাতি-নাতনীদের একটা ছড়া শোনান :

জোনবাই এ, বেজী এটি দিয়া।
বেজী নো কেলৈ ? মোনা সীবলৈ।
মোনা নো কেলৈ ? ধন ভরাবলৈ।
ধন নো কেলৈ ? হাতী কিনিবলৈ।
হাতী নো কেলৈ ? উঠি ফুরিবলৈ।
হাতীত উঠি পানীরাম ঘরলৈ যায়,
আলি বাটর মানুহে ঘুরি ঘুরি চায়।

০

ও চাঁদ দিদি, সুচ এক দাও।
সুচে কী হবে ? থলে বানাব।
কেন রে থলে ? টাকা রাখব।
কী হবে টাকায় ? হাতী কিনিব।
কেন রে হাতী ? চড়ে বেড়াব।
হাতীর পিঠে পানীরাম ঘরে ফিরে যায়,
পথে পথে সকল লোক ঘুরে ঘুরে চায়।

পানীরামের মতো সেই প্রকাণ্ড জন্তুটার পিঠে চড়ে বেড়াতে কোন্ শিশুর না সাধ হয়। কিন্তু হাতী কিনতে টাকা লাগে, আর টাকা রাখতে লাগে থলে, থলে সেলাই করতে সুচ। যা চাওয়া যায় তা কি সহজে পাওয়া যায়!

ছেলেমেয়েদের খেলাধূলোর ছড়াগুলি সচরাচর বিশেষ বিশেষ খেলার সঙ্গে সংযুক্ত। এই সব ছড়ার বিশেষ কোন অর্থ না থাকতে পারে, কিন্তু ছোট ছোট খেলুড়েদের

মনে এসব ছড়ার অনুরনিত ভাষা এবং ছন্দের মিল আনন্দের অনুভূতি জাগিয়ে তোলে। সচরাচর এসব ছড়ায় হাতের কাছের দৃশ্যরাজির বর্ণনা থাকে, এর ফলে পরিবেশের রূপের সঙ্গে নামের যোগে ছেলেমেয়েদের পরিচয় ঘটতে থাকে। সেই অর্থে এসব ছড়া শিক্ষামূলক, প্রকৃতির জগৎ, পশুপাখির জগৎ—মানুষের জগতের প্রতিবেশী। এসব ছড়ার মধ্যদিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে, পশুপাখির সঙ্গে মানবশিশুর আত্মীয়তা জন্মায়। সে সূর্যকে বলে রোদ দিতে, টাপুর টুপুর বৃষ্টি পড়লে তার মজা লাগে, রোদ ও বৃষ্টি যদি একসঙ্গে দেখতে পায়, মনে পড়ে যায় লেজ কাটা শেয়ালের বিয়ের কথা, খাঁদা-নাকী মেয়ে ও পেটুক জামাইকে নিয়ে তারা ঠাট্টাতামাশা করে এবং নাদা-পেটা গোবিন্দের সঙ্গে মাছ ধরতে বেরোতে পারলে তারা খুব মজা পায়।

'আইনাম' গাওয়া হয় বসন্তরোগের দেবী 'আই' বা 'মা'-কে এবং তাঁর সাত বোনকে স্তুতি করার জন্য। 'আই'-কে মানুষ ভয় করে। মায়ের যদি কৃপা হয় কোন ওষুধ দেয় না। সরল মানুষ জানে 'আই' তাঁর খুশিমত আসেন, খুশিমত যান। ধর্মসম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল অসমীয়া বিনাবাক্যব্যয়ে মায়ের সামনে হাঁটু গাড়ে। তারা জানে 'আই' যতদিন কৃপা করে থাকবেন, ঘরের সবাইকে দেহ মনের শুচিতা রক্ষা করে চলতে হবে, সকল ক্ষেত্রে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করে চলতে হবে। রোগ থাকাকালীন এইটাই শুধু পালনীয় কর্তব্য—বাড়ির স্ত্রীলোকেরা এই কর্তব্যপালনে সর্বদা যত্নবতী। সমবেতভাবে নাম-গান করে প্রার্থনা করাটাই এই সময়ে স্ত্রীলোকদের পক্ষে প্রধান পূজা। যে ঘরে 'আই' কৃপা করে আসেন, সেই সব ঘরে এ রকম নাম-গানের আসর বসে। গভীর নম্রভাবে আত্মসমর্পণের ভাবটাই হল এইসব স্তুতি-গানের মূল কথা :

দুখীয়ার ঘরলৈ আছে সাতো ভনী
দিবলৈ নাইকিয়া একো;
মূরর চুলি ছিঙি দুটি পায় মলচি
দেহাক পারি দিম সাঁকো।
না জানি সোমালোঁ আইরে ফুলবারীত
নিচিনি ছিঙিলোঁ কলি;
এইবার দোষকে ক্ষমা ভগবতী
মাতোঁ চরনত ধরে।

০

গরিবের ঘরেতে এল সাত ভগিনী
কিছুই দিতে পারি নাকো
মাথার চুল ছিঁড়ে পাদুটি দেব মুছে
দেহটাকে করে দেব সাঁকো।
না জেনে ঢুকেছি মায়ের ফুল বাগানে
না চিনে ছিঁড়েছি কলি,
এইবার দোষ মোর ক্ষমো ভগবতী
শ্রীচরণ ধরিয়া বলি।

এই আইনামে শব্দের প্রতীকী প্রয়োগ লক্ষ্যনীয়—এখানে বসন্তরোগকে বলা হচ্ছে ফুলের 'কলি'। এই প্রতীকী ভাব অবলম্বন করেই দেবীকে কখনো বলা হয় 'শীতলা' (যিনি শীতল করেন) কখনো বা 'ধরমী' (যিনি ধর্ম পালন করেন)। আই-কে তুষ্ট করার জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে নানা উপচারে পূজা দেওয়া হয়। তারপর তিনি অন্য কোন স্থানে চলে যান। কোন কোন আইনামে কল্পনা করা হয়েছে যে কামাখ্যা থেকে নেমে দেবী ব্রহ্মপুত্র নদ দিয়ে উজিয়ে চলে যান উত্তর লক্ষ্মীমপুরের পিচলা গ্রামে এবং তারপর সেখান থেকে শদিয়া পৌঁছে তার যাত্রা শেষ হয়। বলা হয় ভগবতী, ভবানী, পার্বতী, মহামায়া ও দুর্গতিনাশিনীর সঙ্গে দেবীর কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু শাক্তমতের এইসব দেবীদের সঙ্গে আই-এর কোন সম্পর্ক থাকা সম্ভব নয়, বসন্তরোগ দুরারোগ্য বলেই তাকে একটি শক্তির অভিব্যক্তি বলে ধরা হয়। এটা নিছক লৌকিক কল্পনা। সে যাই হোক, লৌকিক কল্পনা মতে আই যখন উজিয়ে আসেন, ব্রহ্মপুত্রের দুই পারের মানুষজন ও নিসর্গ প্রকৃতি সকলেই তাকে ভক্তিভরে প্রণাম করে :

উজাই থাহিলে আইরে সাত ভনী
চটাই পরেবত জ্বারি
তৃণ-তরুলতা সবে দোয়াঁয় মাথা
আই আহিবরে শুনি।
উজাই আহিলে আইরে সাত ভনী
লুইতত মারিলে খেয়া;
ভয় ন করিবা ভয়াতুর ন হবা
আয়ে করি যাব দয়া।

উজাই থাহিলে আইৰে সাত ভনী
নাওচ গুটি ফুলর থোপা ;
গুটিকে আনিছে মুঠিকে বিলাইছে
নরক করি গৈছে কৃপা।

O

উজিয়ে এলরে মায়ের সাত বোন
পাহাড় পর্বত জুড়ে,
তরুতৃণলতা নোয়ায় সবে মাথা
মা আসিছেন শুনে।
উজিয়ে এল রে মায়ের সাত বোন
নদীতে বেয়ে খেয়া,
কোরোনা ভয় কোনো ভয়াতুর হোয়ো না
আই-মা করে যাবে দয়া।
উজিয়ে এসেছে মায়ের সাত বোন
নৌকায় কলি থোপা থোপা,
এনেছে কত কলি মুঠো মুঠো করে বিলি
মানুষে কত তাঁর কৃপা।

কোন কোন রোগে আই-কে কীরকম পূজা দিতে হবে তার উল্লেখও আছে আইনামে। আরোগ্যের পর কী রকম ওষুধপথ্য দেওয়া দরকার, তারও উল্লেখ আছে।

'নাম' কথার অর্থে যদিচ সচরাচর 'ঈশ্বরের নাম' বোঝায়, উপরে অসমীয়া মৌখিক সাহিত্যের যেসব দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা হয়েছে সেখানে 'নাম' অর্থে অধিকাংশ স্থলে 'গান'। ষোড়শ শতকের নববৈষ্ণব আন্দোলন আসামের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে একটি বৃহৎ ঘটনা। আসামের সমাজ জীবনে এর প্রভাব খুবই গভীর। আসামের বৈষ্ণবধর্মকে নামধর্মও বলা হয়। সুতরাং এই সব লোকগীতের সঙ্গে যখন 'নাম' কথাটা যুক্ত হয় (যথা বিয়ানাম, আইনাম, বিহুনাম, ধাইনাম প্রভৃতি) বুঝতে হবে সেটা বৈষ্ণব প্রভাবের চিহ্ন হতে পারে। নাম ও গীত—এই দুটি কথা অনেক সময় সমার্থক হয়ে এক ধরনের গান অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, এই সব গান ষোড়শ শতকের রচনা। এগুলি তা থেকে অনেক পুরাতন ;

বোধ করি অসমীয়া ভাষার জন্মকাল ও এই সব গান ও ছড়ার জন্মকাল, প্রায় একই সময়ে। এগুলির মূল রূপ হয়তো আর নেই, যুগে যুগে মুখে মুখে চালিত হতে হতে হয়তো এদের ভাষা ও প্রকাশভঙ্গীতে পরিবর্তন ঘটে থাকবে।

'নাম' আখ্যাযুক্ত এইরকম লোকগীত আরও নানা ধরনের আছে। গোসাঁইনামে কৃষ্ণের কারাগারে জন্ম, তাঁর গোষ্ঠলীলা, বালগোপালের ছল ও চাতুরী, রাধিকা ও অন্যান্য গোপিনীদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক, কালিনাগের ফণার উপর নৃত্যের ছলে তাকে দমন ইত্যাদি কৃষ্ণ বিষয়ক কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। সদাশিবনামে দেখা যায়, ভাং খেয়ে শিব পৃথিবীর সকলকে বর দিয়ে বেড়াচ্ছেন অথচ নিজে তিনি দিগম্বর। একটি শিবনামে সাধারণ অসমীয়া দম্পতির গৃহস্থালির আদর্শে শিব-পার্বতীর সংসারকে চিত্রিত করা হয়েছে। বৃন্দাবনীনামে কৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলার কথা প্রকাশিত হয়েছে। এই সব 'নাম' বা 'গীত' সার্বজনিক অনুষ্ঠানে স্ত্রীলোকেরাই গেয়ে-থাকে। লোক-গীতিকারেরা এইসব রচনা করতে গিয়ে বেশ খানিকটা স্বাধীনতা নিয়েছেন। প্রেম-রস অথবা আদি রসাত্মক এমন কিছু বিষয়ের অবতারণা করেছেন যা হয়তো বৈষ্ণব প্রচারকেরা অনুমোদন করতেন না। অসমীয়া বৈষ্ণব-সাহিত্যে কোথাও রাধার নাম দেখা যায় না, কিন্তু নিম্নলিখিত বৃন্দাবনীনামে রাধিকাকে নায়িকা করে অনেকটা তলায় যেন নামিয়ে দেওয়া হয়েছে :

শীঘ্রে নদী পার করা দধি নষ্ট যায়।
ভাঙিলে মথুরা হাট আর কৈভ পায়॥
কৃষ্ণ বোলে প্রিয়া লজ্জা পরিহরা।
আগে আলিঙ্গন দিয়া পাছে নদী তরা॥
রাধার বচন শুনি হাসি বোলে কানু।
ভয় পরিহরা প্রিয়া স্থির করা তনু॥
রতিদান দিয়া মোক রাখা সুবদনী।
আন দান না লাগয় বোলো নিষ্ঠবাণী॥

O

শীঘ্র নদী পার করো দধি নষ্ট যায়,
ভাঙিলে মথুরা হাট আর কোথা যাই॥
কৃষ্ণ বলে প্রিয়া তুমি লজ্জা পরিহর,
অগ্রে আলিঙ্গন দিয়া পাছে নদী তরো॥

রাধার বচন শুনি হাসি বলে কানু,
ভয় পরিহর প্রিয়া স্থির করো তনু ॥
রতিদান দিয়া মোরে রাখো সুবদনী,
অন্য দান নাহি চাই বলো প্রেমবাণী ॥

দেহবিচারের গান অথবা দেহতত্ত্বের গান একটি বিশেষ ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে যোগযুক্ত। রাতিখোয়া, রীতীয়া, পূর্ণদেবা, গোপীধরা প্রভৃতি বিভিন্ন নামে পরিচিত এক বা একাধিক গুহ্য সম্প্রদায়ের ভাবধারা, তান্ত্রিক প্রভাবে পুষ্ট হয়েছে বলে মনে হয়। এই ধরনের গান এই সব সম্প্রদায়েই প্রচলিত। হেম বরুয়া বলেছেন, এই সব গানে আধ্যাত্মিকতায় আত্মনিমগ্ন ভাবের আভাস দেখা যায়। এদের মূল বক্তব্য হল মানব জীবনের ব্যর্থতা এবং মানুষের ভাগ্য-বিধায়ক একটি কোন উচ্চতর অনুভূতির অস্তিত্ব।' আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় এই গানগুলি বৈষ্ণব পদ-বিশেষ। অনেক সময় বিখ্যাত বৈষ্ণব প্রচারক মাধবদেবের নাম এইসব পদের সঙ্গে যুক্ত করে এগুলিকে একটা বৈষ্ণব রূপ দেবার চেষ্টা থাকে। দেহকে কেন্দ্র করে কতকগুলি প্রতীকের সাহায্যে একটা আধ্যাত্মিক উপলব্ধিতে পৌঁছানো হল এই সব গানের লক্ষ্য। দেহ-বিচার গীতগুলিতে ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না প্রভৃতি নাড়ীর এবং যোগশাস্ত্র ও ষট্‌চক্র প্রভৃতির উল্লেখ থাকায়, মনে হয় তান্ত্রিক ধর্মসম্মত যোগাভ্যাসের অল্পস্বল্প প্রভাবও পড়ে থাকতে পারে এই সব গানের উপর। একটি গানে বলা হয়েছে :

দেহার বিচার করোঁ প্রাণবান্ধব
দেহার বিচার করোঁ :
চৈধ্যয় বৈকুণ্ঠ চৈধ্যয় ব্রহ্মাণ্ড,
দেহাতে বিচার ধরোঁ।
ইন্দ্র আদি করি ত্রিদশ দেবতা
দেহাতে বিচারি পায় ;
উরণ বুরণ আদি চারি মূর্তি জীব
লৈবো শরীরত ঠাই।
ব্রহ্মা হরিহর কৃষ্ণ বলভদ্র
আতমার ভিতরে আছে ;
গঙ্গা গয়া কাশী গণ্ডকী যমুনা
আছে শরীররে কাছে।

০

দেহের বিচার কারি প্রাণবান্ধব
দেহের বিচার করি ;
চৌদ্দ বৈকুণ্ঠ চৌদ্দ ব্রহ্মাণ্ড
দেহের মাঝারে ধরি।
ইন্দ্র আদি যত ত্রিদশ দেবতা
দেহতে খুঁজিয়া পাই
উড়ে ডুবে আদি চারি জাতি জীব
শরীরে লয়েছে ঠাঁই।
ব্রহ্মা হরিহর কৃষ্ণ বলভদ্র
আত্মার ভিতরে আছে ;
গঙ্গা গয়া কাশী গণ্ডকী যমুনা
আছে শরীরের কাছে।

কখনো দেহকে একটি গৃহ বলে কল্পনা করা হয়, সে-গৃহে আছে নয়টি দ্বার। কখনো আবার দেহকে বলা হয় নৌকা. মন তার মাঝি হয়ে পঞ্চেন্দ্রিয়কে চালনা করে।

'জিকির' ও 'জারি' হল অসমীয়া মুসলমানদের ভক্তিমূলক গান। জিকিরকে বলা হয় দেহবিচার গীতের ইসলামী সংস্করণ। 'জিকির' কথাটি এসেছে আরবী 'জিক্‌র' থেকে—তার অর্থ হল 'আল্লার নাম গান করা অথবা আল্লাকে স্মরণ করা।' এই গীতগুলির রচয়িতা একাধিক যদিচ আজান ফকির তাঁদের মধ্যে মুখ্য। একাই তিনি প্রায় আট-কুড়ি (160) জিকির রচনা করেছিলেন। তিনি এক আশ্চর্য মানুষ ছিলেন, তাঁর জীবনও ছিল বিচিত্র। কথিত আছে যে তিনি এসেছিলেন বাগ্‌দাদ থেকে এবং তিনি ছিলেন খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়ার শিষ্য। তিনি একজন সম্ভ্রান্তবংশীয় আহোম রমণীকে বিবাহ করে শিবসাগর শহরের অনতিদূরে গড়গাঁও-এ বসতি স্থাপন করেন। তিনি ছিলেন সপ্তদশ শতকের লোক—মীরজুমলার সঙ্গে আহোমদের যে যুদ্ধ হয় তিনি ছিলেন তার প্রত্যক্ষদর্শী। আসামে তিনি এসেছিলেন তাঁর ভাই শাহ নবীর সঙ্গে। তিনি আজান পীর ও শাহ মিলন (সম্ভবত 'মিরণ' থেকে) নামেও খ্যাত ছিলেন। অন্য একটা মত অনুসারে তাঁর পুরো নাম ও আসল নাম ছিল হজরত শাহ সৈয়দ মৈনুদ্দীন। পীর রূপে তিনি শরিয়ৎ-এর শিক্ষাবলী প্রচার করতেন এবং সেই উদ্দেশ্যেই জিকির রচনা করতেন। প্রথম প্রথম তিনি আরবী ভাষা বলতেন। আসামকে স্বদেশ বলে গ্রহণ করার পর তিনি অসমীয়া কেবল যে শিখলেন এমন নয়, এমন সম্পূর্ণ ভাবে আয়ত্ত

করলেন এবং তাঁর আধ্যাত্মিক গানগুলি এমনই ঘরোয়া ভাষায় রচনা করলেন যে, সেগুলি সহজেই তাঁর সমসাময়িক বৈষ্ণব কবিদের রচনাবলীর সঙ্গে তুলনীয় বলা যায়। কালক্রমে তাঁর প্রভাব বিস্তৃত হল, কিছুসংখ্যক লোক তাঁর অনুগামী হল। আহোম রাজার জনৈক মুসলমান কর্মচারী রপাই দাধরা-র এটা সহ্য হল না। সে ষড়যন্ত্র করে আহোম রাজাকে বোঝাল যে আজান ফকির ইসলামী আদর্শের বিরুদ্ধাচরণ করছে। রাজাকে দিয়ে পীরের চোখ দুটি উপড়ে ফেলার আদেশ জারী করাল। কতিপয় গীতে বলা হয়েছে যে রাজার আদেশের কথা শুনে পীর সাহেব তাঁর এক শিষ্যকে দিয়ে দুটি মাটির পাত্র এনে একে একে দুই চোখের তলায় ধরলেন, তাঁর নজর (দুই চোখ) যেন আপনা থেকে খসে পড়ল সেই দুটি পাত্রে। কথাটা শুনে রাজা আতঙ্কিত হলেন এবং প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ শিবসাগরের নিকটবর্তী শোরাগুরি চাপরি অঞ্চলে আজান ফকিরকে ভূমিদান করে সেই জায়গায় একটি মঠ প্রতিষ্ঠিত করে দিলেন :

শোরাগুরি চাপরি
দিখৌ নৈর কাষরি
রজাই সজাই দিলে মঠ।

O

শোরাগুরি চাপরি
দিখৌ নদীর ধারে
রাজা দিলেন মঠ বানিয়ে।

ব্রহ্মপুত্রের তীরবর্তী এই জায়গাটি এবং আজান পীরের দরগা সম্প্রতি এক তীর্থে পরিণত হয়েছে, সেখানে প্রতি বৎসর উর্স বসে।

আজান পীর ছাড়া অন্য সব জিকির-কবির (তাদের মধ্যে কয়েকজন হিন্দুও ছিল) নাম লোকে বড় একটা জানে না। আসামের অন্যান্য মৌখিক গীতে যেমন রচয়িতার নাম থাকে না, কিছু কিছু জিকির গানের কবি যে কে, তা কেউ জানে না। শোনা যায় আগে আগে জিকির গান আরবী কিংবা আহোম লিপিতে লিখে সংরক্ষণ করা হত, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন লিখিত জিকির উদ্ধার করা যায়নি। গ্রামের সরল মুসলমানেরা বংশানুক্রমে এইসব গান মনে রেখেছে ও মুখে মুখে গেয়ে তিনশো বছর ধরে প্রচার করে এসেছে। বিয়ে কিংবা সার্বজনিক ভোজ-সভায় তারা দল বেঁধে জিকির গায় এবং গানের ভাবের সঙ্গে সংগতি রেখে নাচেও।

মেয়েরাও জিকির গায়, কিন্তু নাচে না। কিছু কিছু জিকির, বিশেষত আজান সাহেবের রচিত জিকিরগুলি সরল ভাষায় ইসলাম ধর্মের শিক্ষা। বলা হয়েছে 'কলিমা জিকিরর মূল' অর্থাৎ কলমা থেকে জিকির-এর উৎপত্তি। অন্য কিছু জিকির আছে যা সুফী ভাবধারায় প্রভাবিত, তাদের মধ্যে এমন কিছু নিহিত তাৎপর্য থাকে যা সহজে বুঝতে পারা যায় না, ব্যাখ্যা করা যায় না। এই শ্রেণীর জিকিরের সঙ্গে তুলনীয় হল দেহবিচার গীত। এর মধ্যে থাকে দেহ ও আত্মার সম্পর্কের কথা, এই নশ্বর পৃথিবীর অনিশ্চয়তার কথা—অর্থাৎ এমন সব প্রসঙ্গ যা মানুষকে সততার পথে নিয়ে যেতে প্রেরণা দেয়। কোন কোন জিকিরে একটা কোন কাহিনীর অবতারণা করা হয়, কিছুতে দেবদেবীর চরিত্র থাকে, কিছুতে আবার তান্ত্রিক, শাক্ত কিংবা বৈষ্ণব মতবাদেরও উল্লেখ থাকে। এই সমস্ত নিদর্শন থেকে এইটুকুই স্পষ্ট হয় যে আজান পীরের মতো আসামের আদি মুসলমানেরা কেবল যে স্থানীয় রমনীদের স্ত্রী রূপে গ্রহণ করেছিল এমন নয়, সেই সঙ্গে তাদের স্থানীয় জীবন-পদ্ধতি ও সংস্কৃতিও বহুল পরিমাণে গ্রহণ করতে হয়েছিল—ভাষা ও নৃত্যগীত সমেত। মনে রাখা দরকার, কতকগুলি অপরিহার্য আরবী কথা বাদ দিলে জিকিরগুলির ভাষা অন্য যে কোন অসমীয়া লোকগীতের ভাষার অনুরূপ। গ্রাম-আসামে হিন্দু মুসলমানে যেরকম সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি দেখা যায় সমগ্র ভারতে তার তুলনা মেলা ভার। এই প্রীতির সম্পর্ক ঐতিহাসিক কারণেও উল্লেখযোগ্য। ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে, ত্রয়োদশ শতকে খেনদের রাজত্বকালে বাংলার মুসলমান সুবেদাররা পর পর কয়েকবার আসাম আক্রমণ করে। মুসলমান রাজত্ব আসামে কায়েম না হলেও আক্রমণকারীদের কেউ কেউ আসামে থেকে গিয়েছিল। আসামের অন্য বাসিন্দাদের সঙ্গে সম্প্রীতি গড়ে তুলেছিল তারাই এবং তাদের বংশধরেরা। চারশো বছর পরে আবার যখন মুসলমান আক্রমণ আসে মীরজুমলার সেনাপতিত্বে মোগলবাহিনীরূপে, সেই আদি মুসলমানেরা আসামের অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিলে মিশে এক হয়ে গিয়ে থাকবে। আজান ফকির ওরফে শাহ মিলন গড়গাঁও-এর উপর মোগল আক্রমণের একজন প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। সেইসময় রাজনৈতিক কারণে তাঁকে ও তাঁর ভাইকে কামরূপে জেলার হাজোতে পালিয়ে গিয়ে আত্মগোপন করে থাকতে হয়েছিল। অধ্যাপক সৈয়দ আবদুল মালিক আজান সাহেবের জিকির ও জারি গানের একটি সংকলনের ভূমিকা লিখতে গিয়ে বলেছেন যে তিনি সাম্প্রদায়িক মনোভাবের বহু উর্দ্ধে ছিলেন। প্রমাণ স্বরূপ অধ্যাপক মালিক দুটি জিকির উদ্ধৃত করেছেন। তার একটিতে আছে ;

কোরাণে পুরাণে একেকে কৈছে
বুজিবা মহন্ত লোক ;
এই দুনীয়াতে আছে দুই বেশে
মুৰ্শিদে বুজাব তোক।

O

কোরাণ পুরাণ একই কথা বলে
বুঝিবে মহন্ত লোকে,
এই দুনিয়াতে আছে দুই বেশে
মুর্শিদে বুঝাবে তোকে।

অন্য একটি জিকিরে বর্ণিত হয়েছে, পীরের প্রতি আহোম রাজার শাস্তিদানের সময় যখন তাঁর দুটি চোখ খসে পড়ল মাটির পাত্রে, তখন পদস্থ রাজকর্মচারী হাতী বরুয়া 'তাওরে পাগুড়ি ছিঙি' অর্থাৎ তাঁর মাথার পাগড়ি থেকে কাপড় ছিঁড়ে, পীরের চোখের জল মুছিয়ে দিলে পীর তাঁকে কেমন আশীর্বাদ করে বললেন :

পুরুষে পুরুষে বিষয় খাই যাবি
ভাঙোতা নহ'ব তোক।

O

বংশ পরম্পরা র'বি উচ্চপদে
কেহ না হটাবে তোরে।

আজান ফকির ও অন্যান্য মুসলমান জিকির রচয়িতারা ওজা-পালি, দেহবিচারের গীত ও বৈষ্ণব কাব্যসমূহের সুর ও ভাব আহরণ করেছিলেন। বৈষ্ণবদের মতো ঈশ্বরকে মনে রাখার পন্থারূপে তাঁর নাম উচ্চারণ করার পদ্ধতিও গ্রহণ করেছিলেন। জিকিরগুলিতে প্রায়ই 'সবারি ঘটে ঘটে আল্লা' এই ধরনের কথা পাওয়া যায় যা নিশ্চয় বৈষ্ণবকাব্য থেকে ধার করা। নিম্নলিখিত জিকিরটি দেহবিচার গীতের সঙ্গে অনায়াসেই তুলনা করা যায়, হিন্দু বৈরাগীরাও কখনো কখনো এ গান গেয়ে থাকে :

দুনীয়াই এদিনর দুনীয়াই দুদিনর
দুনীয়াই ফুলনিবারী।
কতক ছলে বলে কর তই দুনীয়াই
ধরিব খেয়ালি মারি॥

এই দুনীয়াৰৈ   কেলেই আহিলোঁ
সৰুতে নগলোঁ মরি
গোর আজাবর   বাতরি শুনি মোর
আগলৈ নচলে ভরি ॥

O

এসেছি এ দুনিয়ায়   দু'দিন বৈ তো নয়
এ দুনিয়া ফুলের বাগান,
ছলনা করে কি হবে   দুনিয়ায় কেবা রবে
খেপাজালে দেবে যবে টান।
কেন এই দুনিয়ায়   আমরা এলাম হায়
ভালো হত জন্মেই মরা,
কবরের পরে শাস্তি   হবে যৎপরোনাস্তি
শুনে আমি ভেবে হই সারা।

জারি গান বা মর্সিয়াগানগুলি আজান পীরের রচনা কিনা নিশ্চিত বলা শক্ত। অন্য যেকোন দেশের মুসলমানদের মতোই অসমীয়া মুসলমানেরাও কারবালার বিয়োগান্ত ঘটনায় তাদের শোকার্ত হৃদয়ের বেদনা এইসব গানের যোগে প্রকাশ করে থাকে। দেখা যায়, ধর্মপ্রাণ মুসলমানেরা রাত্রি শেষ না হওয়া পর্যন্ত জারি গান শুনতে ভালোবাসে। জারি গান যদিচ ইসলামীয় শিক্ষার অঙ্গবিশেষ নয়, অধ্যাপক আবদুল মালিকের মতে এইসব গানে কারবালার দুঃখাত্মক কাহিনীটি জড়িত থাকায়, করুণ সুরে গাওয়া এইসব বেদনার গান, সকল ধর্মপ্রাণ মুসলমানকে গভীর ভাবে আকর্ষণ করে। অসমীয়া ভাষায় রচিত জারি গানগুলিতে সুদূর আরব দেশের চরিত্রগুলিকে যেন অসমীয়া সাজ পরিয়ে উপস্থাপন করা হয়। অসমীয়া মুসলমানেরা তাদের নিজেদের বাড়িতে নিজস্ব প্রথাপদ্ধতিতে যেমন বিবাহ অনুষ্ঠান করে থাকে, হজরত আলির বিবাহ ঠিক সেইভাবে বর্নিত হয়েছে জারি গানে।

'বারমাহী গীত' অথাৎ বারোমাস্যা গানের বিষয়বস্তু মূলত একই ধরনের। স্বামী দূর দেশে প্রবাসী; পতিবিরহিনী মাসের পর মাস ধরে তার বিচ্ছেদের বেদনা বর্ননা করছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বামী হলেন সদাগর পুত্র—বিদেশে গেছেন বাণিজ্য করতে। তবে নিম্নাভিমুখী ব্রহ্মপুত্রের দুই পারে একাধিক ধরনের বারোমাস্যার গান প্রচলিত আছে। যথা : রাধা বারমাহী, সীতা বারমাহী, রাম বারমাহী, কন্যা বারমাহী ও শান্তি বারমাহী। প্রতিটি গানে থাকে বারো থেকে তেরোটি কলি,

প্রত্যেক কলিতে অন্ত্যমিল বিশিষ্ট দুটি করে চরণ। এক একটি কলি যেন এক-একটি মাসের বর্ণনা, বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে সাযুজ্য রেখে নায়িকার অন্তঃপ্রকৃতির ভাবান্তরের চিত্র। সাধারণত প্রতিটি গীতের সূচনা হয় অগ্রহায়ণ মাস থেকে। কারণ, প্রাচীন কালে আসামের বৎসর-গণনা শুরু হত ওই মাস থেকেই। সীতা ও রাম-বারমাহীতে রামায়ণের গল্পাংশ চুম্বকরূপে বর্ণিত। অন্য গীতগুলিতে দীর্ঘকাল ধরে স্বামী-বিচ্ছেদে কাতর বিরহবিধুরা কোনো পত্নীর শোকবিহ্বল হৃদয়ের উচ্ছ্বাস প্রকাশিত। প্রতি স্তবকে এক একটি মাসের কথা ব'লে, সেই সেই মাসে নায়িকার মানসিক অবস্থার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। ঋতু-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিরহিনীর মনেরও ভাবান্তর হয়। সীত বারমাহীতে নির্বাসনে একাকিনী সীতার বিলাপ এইভাবে বর্ণিত হয়েছে :

আঘোণর মাহতে বাপু শালিরে বতর।
দূরর পরা রামচন্দ্রক করিছোঁ কাতর ॥
পুহর মাহতে বাপু অতি বড় শীত।
মই অভাগিনী সীতার নাই থান থিত ॥
মাঘর মাহতে বাপু ধরমর থিতি।
বনবাসে দিলা মোক গরভে সহিতি ॥
ফাগুণর মাহতে বাপু পছোয়া মেলে বায়।
মই সীতা অভাগিনীর নাই বাপ মায় ॥

O

অঘ্রাণ মাসে দেখি শালি ধান ফলে,
দূর হতে কান্দি আমি রামচন্দ্র বলে।
পৌষের শীতে সীতা কাতর সতত,
কোথা নাই ঠাঁই মাথা গুঁজিবার মতো।
শুনি ধর্ম স্থিতিলাভ করে মাঘ মাসে,
কোন পাপে সগর্ভারে দিল বনবাসে।
ফাল্গুন মাসে হাওয়া পশ্চিমে বহে,
পিতৃমাতৃহীন সীতা অভাগিনী কহে ॥

রাম বারমাহীতে দেখা যায়, সীতা ফিরে এলে পর ভবিষ্যতের দিনগুলি কী ভাবে তার সঙ্গে কাটানো সম্ভব হবে, সেই কথা ভেবে রাম বিমূঢ় বোধ করছেন। রাধা

বারমাহীতে কৃষ্ণের থেকে রাধার বিচ্ছেদের বেদনা পরিবর্তনশীল ঋতুচক্রের পটভূমিতে সুচিত্রিত। আশ্বিন মাসে দুর্গা-রূপে রাধার হাঁস-পায়রার বলি গ্রহণ করার কথা। আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজার কোন নারী যখন বলি উৎসর্গ করে তখন দূরস্থিত স্বামীর মঙ্গল কামনাতেই সে বলি দেয়। তাই আশ্বিনে কৃষ্ণের কথা রাধার বিশেষ রূপে মনে পড়া স্বাভাবিক। অন্য একটি বারমাহীর নায়িকা মধুমতী বলছেন, বৈশাখ মাসে কোকিলের ডাক শুনলে তার গা যেন জ্বলে যায়, জ্যৈষ্ঠে ডাহুকীর ডাকে গায়ে তার জ্বর আসে আর শ্রাবণে তার দেহমন এমন উচাটন করে যে তার মনে হয় 'গলত কটারী দি তেজিম পরনে'—গলায় কাটারী দিয়ে প্রাণ ত্যাগ করব! আসামের বারমাহী গীতগুলি বঙ্গদেশ ও ওড়িশার 'বারমাসা' গীত ও বিহারের 'চৌমাসা' গীতের মতো। সুরদাসও কৃষ্ণের প্রতি গোপীদের মনোভাব প্রকাশ করে একটি গীত রচনা করেছিলেন—সে গানের শুরুতে ও অগ্রহায়ণ মাসের কথা বলা হয়েছে।

ঋতু পরিবর্তনের সুন্দর চিত্র পাওয়া যায় ফুলবন্তী কন্যা শান্তির বারমাহী গীতে :

পুহর মাহতে শান্তি আতি বরি কুঁয়া।
প্রাণনাথে জীউনাথে খেলে পাশা জুয়া॥
পাশা খেলে জুয়া পাশাই নেদে ঢাল।
কৈক এরি গৈলা প্রভু বিনন্দ গোপাল॥
ফাগুণর মাহতে শান্তি দেউল যাতরা।
দেউলর ওপরে আছে মঠ যে মগরা॥

O

পৌষ মাসে চারি দিকে ভরা কুয়াশা,
প্রাণজীবননাথ খেলে জুয়া পাশা।
ছকে ফেলে পাশা আর ছকে ফেলে কড়ি,
আমারে ছাড়িয়া কোথা গিয়েছে শ্রীহরি!
ফাল্গুন মাসে শান্তি যায় দেবালয়
মন্দিরে মকর চূড়া' নেহারি বিস্ময়।

☐

মঠ নোহে মগর নোহে জগতরে হরি।
আলানি-বিলানি কান্দে ধরণীতে পরি॥

বৈহাগর মাহতে শান্তি দেবতার গর্জনি।
দেয়তার গর্জনি শুনি মাছে দেই উজনি ॥

O

মন্দির রহুক পড়ে, চাই যে শ্রীহরি,
ইনায়ে বিনায়ে কান্দে ধরনীতে পড়ি।
বৈশাখ মাসে দেব ঘন গরজায়,
ডিম্ব দিতে মৎস্য যত নদীতে উজায়।

□

শিশু মাছে উজান দেই বছরে একবার।
আমি অভাগিনী নারী সেই পটন্তর ॥

O

সংসরান্তে একবার ডিম্ব ছাড়ে মীন,
আমি নারী অভাগিনী তারো চেয়ে হীন।

□

জেঠর মাহতে শান্তি জেঠুয়া বরি খর।
বনর হরিণাবাছু সিও চাপে ঘর ॥
যাকে দেখো আপোন আপোন সিও হয়ে পর।
বিচুধিয়া সাউদর কোয়ঁর ফিরি নাহে ঘর ॥

O

জ্যৈষ্ঠ মাসে খরা ভারি, হয়ে অথান্তর
বনের হরিণ সেও নাহি ছাড়ে ঘর।
যাহারে আপন ভাবি, সেও হয় পর,
অবোধ সাউত পুত্র ফেরে নাকো ঘর।

□

আহারর মাহতে শান্তি রোয়ানর দিন।
যিটো নারীর পুরুষ নাই সকলোতকৈ হীন ॥
আকাশত চন্দ্র নাই নিজিলিকে তরা!
যিটো নারীর পুরুষ নাই জীয়ন্ততে মরা ॥

o

আষাঢ় মাসেতে বীজ বপনের দিন.
পুরুষ বিহীন নারী সবা চেয়ে হীন।
আকাশেতে চন্দ্র নাই না ঝলকে তারা,
পুরুষ বিহীন নারী. জীবন্তেই মরা।

□

ভাদর মাহতে শান্তি ভৈলা বর খর।
নদী শুকাল নালা শুকাল পরিল বালির চর ॥
কাইমে রায়ে কোয়াই রায়ে রায়ে রাজহাঁহ।
হাহিতে খেলিতে গৈল বরিষা ছয় মাহ ॥

o

ভাদ্র মাসে খরা এল শ্রাবণের পর ,
নদী নালা শুকাইয়া হল বালু চর।
কাকপক্ষী ডেকে যায়, ডাকে রাজহাঁস.
হাসিয়া খেলিয়া গেল বরিষা ছ' মাস।

□

আহিনর মাহতে শান্তি দেবীপূজা খায়।
হাঁহ পরে ছাগল পরে পারর লেখ নাই ॥
হাঁহ পরে ছাগল পরে পারয়া জাকে জাক।
যৈতে আছা সাউদর কোয়ঁর তৈতে ভালে থাক ॥

o

আশ্বিন মাসে শান্তি দেবী পূজারত,
হাঁস বলি, পাঁঠা বলি, পায়রা কত শত ॥
বলি হয় হাঁস ছাগল, পায়রা ঝাঁকে ঝাঁক,
যেথা আছা সাউত পুত্র সেথা সুখে যায় ॥

কাহিনী-গীত বা গাথা-সঙ্গীত অসমীয়া মৌখিক সাহিত্যের অন্যতম উল্লেখযোগ্য শাখা। এই জাতীয় সঙ্গীতকে বলা হয় 'মালিতা'। এই ধরনের গাথা-সঙ্গীত একাধিক আছে যদিও কোন কোনটার কেবল খণ্ডাংশ পাওয়া যায়। মালিতা দু' ভাগে ভাগ করা যায়। এর কতকগুলি জনপ্রিয়, কতকগুলি ঐতিহাসিক। প্রথম ভাগে পাওয়া যায় জনপ্রিয় কতকগুলি কাহিনী-গানের আকারে, আর দ্বিতীয়

ভাগের উপজীব্য হল কতিপয় ঐতিহাসিক ঘটনা বা চরিত্র। জনপ্রিয়তার নিরিখে সবচেয়ে খ্যাত হল ফুলকোয়ঁর ও মনিকোয়ঁর-এর গীত। এই দুটি গাথা-সঙ্গীত শুনে মনে হয় যেন একই কাহিনীর দুটি অংশ। গল্পাংশটি এই : বরকলার রাজা শঙ্খদেব অথবা শঙ্কর দেবের ঔরসে তাঁর পাটরানী ময়নাবতীর গর্ভে একটি পুত্র সন্তান জন্মেছিল—নাম মণিকোয়ঁর। কুমারের আয়ু ছিল মাত্র ষোলো বছর। এই ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্য রাজা সকল জ্যোতিষীকে বন্দী শালায় বন্দী করে রেখেছিলেন। উচ্চপর্যায়ের রাজপুরুষ ফুকনের মেয়ে কাঞ্চনমতীর সঙ্গে রাজা কুমারের বিয়ে দিয়ে দিলেন। একদিন শনিবারে ষোলো বছর বয়স্ক কুমার স্নান করবেন বলে রাজবাড়ির মাটির তলার একটি সুড়ঙ্গ পথে, কাউকে কিছু না খবর দিয়ে, চলে গেল দিখৌ নদীতে। সেখানে জলকোয়ঁর তাকে ধরে নিয়ে গেল। বিধবা হয়ে কাঞ্চনমতী চলে গেলেন তাঁর পিতৃগৃহে। সেখানে তাঁর একটি পুত্রসন্তান জন্মাল। নাম রাখা হল ফুলকোয়ঁর। রাজা ও রানী সেই শিশু কুমারকে প্রাসাদে নিয়ে এলেন। দিন যেতে লাগল, কালক্রমে ফুলকোয়ঁর পশ্চিম দেশের দিকে অভিযাত্রা করার একটা ইচ্ছা প্রকাশ করল। অচেনা আজানা অঞ্চলে ছেলেকে যেতে দিতে মা কাঞ্চনমতী সম্মত হলেন না। ফুলকোয়ঁর তখন শরণ নিল তার পিতামহের। তাঁর সম্মতি সহজেই পাওয়া গেল। তিনি যাত্রার সাফল্যের জন্য আশীর্বাদ করলেন এবং ফুকন ও রাজখোয়া-দের মতো উচ্চ রাজকর্মচারীদের ডেকে বলে দিলেন যাত্রার সব ব্যবস্থা করে দিতে। তাঁরা আবার হুকুম দিলেন রাজবাড়ির সূত্রধার বাঢৈ-কে। বাঢৈ বিশ্বকর্মাকে পূজা দিয়ে বানাল কাঠের এক পক্ষীরাজ ঘোড়া। কুমার সেই ঘোড়াতে উঠতেই ঘোড়া তাকে আকাশ পথে উড়িয়ে নিয়ে চলল। কয়েকটা দিন এইভাবে কাটলে পর কুমার একবার পিছন ফিরে তাকাল—যদিও পিতামহ তাকে সাবধান করে বলে দিয়েছিলেন পিছন ফিরে না তাকাতে। ফলে পক্ষীরাজ ধীরে ধীরে নিচে নামতে শুরু করল। নামল গিয়ে দিজাই মালিনীর বারো বছর ধরে শুকিয়ে থাকা ফুলবাগানে। ফুলকোয়ঁর নামতেই শুকনো ফুল গাছগুলি বেঁচে উঠল, বিচিত্র বর্ণের ফুলে সারা বাগান ঝলমল করে উঠল। তারপর দিজাই মালিনীর দৌত্যে ফুলকোয়ঁয়ের সঙ্গে সে-দেশের রাজকুমারী পচতুলার প্রণয় সংঘটিত হল। 'চোর' ধরা পড়ল। রাজার আদেশে মৃত্যুদণ্ড বিধানের জন্য তাকে নিয়ে যাওয়া হল বধ্যভূমির দিকে। রাজকুমারী গোপনে অনুসরণ করে চললেন তাঁর প্রণয়ীকে। পথে প্রহরীদের চোখে ধুলো দিয়ে প্রণয়ীযুগল সে-দেশ থেকে যেনতেনপ্রকারেন পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেন। একটা গভীর অরণ্যানীতে বাস

বেঁধে তাঁরা বসবাস করতে লাগলেন, সেখানে তাঁদের দুটি ছেলে হল, অরুণা ও জগরা। ফুলকোয়ঁর একদিন জল আনবার জন্য বেরিয়েছেন, পথে একটি শ্বেত হস্তী তাঁকে শুঁড়ে জড়িয়ে ধরে পিঠে তুলে নিয়ে চলে গেল অন্য এক রাজত্বে। এদিকে পচতুলাকে এক সওদাগরের লোক জোর করে ধরে নিয়ে গেল। ছেলে দুটি টারজানের মতো অরণ্যের গভীরে বন্য জন্তুদের মধ্যে বড় হয়ে উঠল। একদিন তারা বেরোল অরণ্য থেকে মা-বাবার খোঁজে। পরনে তাদের শতছিন্ন কাপড়, হাতে একতারা নিয়ে তারা এখানে ওখানে মালিতা গাইবার ছলে নিজেদের দুঃখের কাহিনী গেয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল—লবকুশের মতো। এইভাবে গান গেয়ে ভিক্ষা করতে গিয়ে একদিন ওরা দাঁড়াল গিয়ে সেই সওদাগরের কর্মচারীর বাড়ির দরজায়। গান শুনেই পচতুলা ছেলেদের চিনতে পারলেন ও কোলে তুলে নিয়ে কত আদর করলেন। অতঃপর অরুণা ও জগরা বেরোল তাদের বাবার খোঁজে। শ্বেতহস্তী ফুলকোয়ঁরকে এনে একটি দেশের রাজা পাটে বসিয়ে দিয়েছিল। ছেলেরা খুঁজতে খুঁজতে এল সেই রাজ্যে। ফুলকোয়ঁর চিনতে পারলেন অরুণা ও জগরাকে। তাদের কাছ থেকে পচতুলার খবর পেয়ে, ফুলকোয়ঁর সেই সওদাগরের লোকটাকে মেরে পচতুলাকে নিজের রাজ্যে নিয়ে এলেন।

অপর একটি বিখ্যাত ও জনপ্রিয় মালিতা হল 'জনাগাভরুর গীত' অর্থাৎ জনা যুবতীর কাহিনী! জনা ছিল প্রাচীন গরুচর রাজ্যের বৃদ্ধ রাজার মেয়ে। একটি পরীক্ষায় হারিয়ে জনা ন'শো যুবককে বন্দীশালায় আটক রেখেছিল। কালিধন নটও একদা জনা যুবতীর পরীক্ষায় নেমেছিল, কিন্তু হেরে গিয়ে রাজকুমারীর হাতে নাককান কাটা যাবার পর ফিরে আসতে বাধ্য হয়। কালিধন তখন নগাঁও এসে গোপীচন কোয়ঁরকে ধরল যাতে সে জনাগাভরুকে পরাস্ত করতে পারে। গোপীচন ব্রহ্মপুত্র পার হয়ে গরুচর গেল। একটার পর একটা এই রকম তিনটি পরীক্ষায় হারিয়ে দিল গাভরুকে। অবশেষে জনা বাধ্য হল গোপীচনকে স্বামীরূপে গ্রহণ করতে। বুড়ো রাজা তাঁর ছেলে অভিমানকে পাঠালেন গোপীচনের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করতে। সে-যুদ্ধে অভিমান নিহত হল। তখন রাজা পাঠালেন বারো কুড়ি হাতী —গোপীচনকে পিষে মারার জন্য। গোপীচন মন্ত্রের বলে ঝাঁকে ঝাঁকে ভীমরুল পাঠাল হাতীদের পিছু হঠিয়ে দেবার জন্য। গরুচর যাবার আগে গোপীচনের বিধবা মা শোনা কথার উপর নির্ভর করে জনার বিরুদ্ধে অনেক সব খারাপ খারাপ কথা ছেলের কানে তুলেছিলেন। কিন্তু গোপীচন যখন বউ নিয়ে ঘর ঢুকল প্রথম দর্শনেই শাশুড়ীর ভালো লাগল বউকে। জনার রূপের প্রশংসাতে তিনিও পঞ্চমুখ হলেন

এক দুটি গাথা-সঙ্গীতের উদ্ভব সম্ভবত আহোম রাজাদের রাজত্বকালে। ফুলকোয়ঁরের কাহিনীতে বরুয়া, ফুকন, রাজখোয়া ও তামুলীর উল্লেখ আছে। এ সব নাম ছিল আহোম রাজপুরুষদের উপাধি। এখনো লোকের বিশ্বাস ফুলকোয়ঁরের রাজত্ব ছিল শিবসাগর জেলার বকতা অঞ্চলে। মণিকোয়ঁরের নগর বলে বর্ণিত বরকলা শহরটা বসিয়েছিলেন আহোম রাজা গদাধর সিংহ। এতদ্ব্যতীত মালিতাটিতে যে দিখৌ নদী, বলমা ও আমগুরির উল্লেখ রয়েছে সে সমস্তই শিবসাগর জেলায় আজও বর্তমান এবং ওই সব অঞ্চলে আহোমদের ঘন বসতি। জনাগাভরুর গীতে মান অর্থাৎ কর্মীদের সঙ্গে সিংফৌ জনজাতির যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে। তা থেকে মনে হয় এই গীত রচিত হয়ে থাকবে আহোম রাজত্বের শেষ ভাগে। এই গীতের সঙ্গে বঙ্গ দেশের গোপীচাঁদ-ময়নামতীর কাহিনীর প্রচুর মিল দেখা যায়। গীতে একাধিক আরবী-মূলজ কথা থাকায় মনে হয়, হয়তো বা আসাম আক্রমণকারী মুসলমান সৈন্যেরা প্রতিবেশী বঙ্গদেশ থেকে এই কাহিনী আমদানী করে থাকবে। কারো কারো মতে, এই গীত রচনা করেছিল আসামেরই মরিয়া মুসলমানেরা। অখ্যাত, অজ্ঞাত, ও নিরক্ষর গ্রাম্য-কবিরা কোন ঐতিহ্যবাহিত বা পরিব্রজনশীল কাহিনীকে ভিত্তি করে হয়ত এই সব মালিতা সৃষ্টি করে থাকবে এবং সেগুলির উপর নিজেদের স্থান, কাল, পরিবেশের রঙ চড়িয়ে থাকবে। মণিকোয়ঁর কাহিনীর উড়ন্ত কাঠের ঘোড়াটি নিশ্চয় রূপকথার কল্পনা। বিদুষী কন্যার পাণিপ্রার্থীদের পরীক্ষা করে নেবার ব্যাপারটা সম্ভবত কালিদাসের শৈশব কাল-সম্পর্কিত প্রচলিত কাহিনী থেকে ধার করা। সব কিছুই কিন্তু লৌকিক কল্পনার সঙ্গে ওতপ্রোত মিলে মিশে এক হয়ে গেছে। বিহুগীতের মতো মালিতাগুলি ও গীতি কবিতা ধর্মী ও কল্পনাপ্রবণ, এক কথায় রোমান্টিক। রচনা রীতি ও প্রকাশভঙ্গীতে দুয়ের মধ্যে প্রচুর মিল। দেখা যায় বিহু উৎসবের সময়ে অন্যান্য বিহু গীতের সঙ্গে ফুলকোয়ঁর ও মণিকোয়ঁরের মালিতাও গাওয়া হয়ে থাকে।

খণ্ড খণ্ডভাবে কয়েকটি গীতগাথার সন্ধান পাওয়া গেছে। অসম্পূর্ণ বলে এগুলির অভ্যন্তরে কী প্রকার কাহিনী লুকিয়ে আছে জানা যায়নি। 'বৈদেশী কোয়ঁর' (বিদেশী কুমার) ও 'দুবলা শান্তি' (দুর্বলা শান্তি), নিম্ন আসাম অঞ্চল থেকে সংগৃহীত এইরকম দুটি খণ্ডিত মালিতার চরিত্র। বিদেশী কুমার ছিল মাগুরির ধন সদাগরের পুত্র। একটি অজানা বাড়িতে একটা রাতের জন্য তাকে আশ্রয় নিতে হয়। সেখানে অনামা এক যুবতী তার প্রেমে পড়ে এবং সারা রাত প্রণয়লীলায় লিপ্ত থেকে ভোরবেলা কুমার সে-বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। দুবলা শান্তি একজন বিবাহিত

মহিলা। এক সদাগর তার বাড়িতে অতিথি হয়ে থাকাকালীন তার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু শান্তি তার দিদিমা মালিনীর মধ্যস্থতায় এমন সব অসম্ভব দাবী উপস্থিত করে যে সদাগর পিছু হেঁটে পালিয়ে বাঁচে। এই ধরনের একটি তৃতীয় মালিতায় বর্ণিত হয়েছে 'সেন্দুরী পমিলী'-র (সিন্দুর বরণ পমিলী) কাহিনী। যোরহাট মহকুমার মনাই মাঝী গাঁয়ে ছিল পমিলীর বাস। সে সময়টাতে রেলপথ ও টেলিগ্রাফের তার বসানোর কাজ চলছে অর্থাৎ সেটা ছিল উনিশ শতকের শেষ ভাগ। পশ্চিমাঞ্চল থেকে এক নেপালী এসে মনাই মাঝীতে একটা মোষের গোয়াল তুলল দুধের ব্যবসা করবে বলে। সেন্দুরী পমিলী সেই নেপালী গোয়ালার প্রেমে পড়ল। নেপালী পমিলীর মাকে ভোলাবার জন্য রোজ মোষের দুধ থেকে মোটা সরের দই পেতে ভেট দিতে লাগল। সেন্দুরীকে দিত গাদা গাদা সিঁন্দুর মোড়ক। বিহু উৎসব যখন আগত প্রায়, পমিলী জল আনবার ছলে নদীর পারে গিয়ে মিলিত হল প্রেমিকের সঙ্গে। দু'জনে পালিয়ে গেল শদিয়ার দিকে।

ইতিহাসভিত্তিক মালিতার মধ্যে সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য হল 'বরফুকনর গীত' ও 'মণিরাম দেয়ানর গীত'। আহোম রাজত্বের সমাপ্তির মুখে রাজনৈতিক ঘটনাবলীর সঙ্গে জড়িত দুজন ইতিহাস-বিখ্যাত ব্যক্তিকে নিয়ে এই দু'টি মালিতা রচিত। বদন বরফুকন ছিলেন গৌহাটির রাজ্যপাল—নিম্ন আসামে আহোম রাজের প্রতিনিধি। রাজধানী শিবসাগরের প্রধানমন্ত্রী পূর্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁয়ের পুত্রের সঙ্গে হয়েছিল তার কন্যার বিবাহ। দুই বৈবাহিকের মধ্যে সম্বন্ধ ছিল আদায় কাঁচকলায়। বরফুকন প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আরো কয়েকজনের যোগসাজসে চক্রান্ত করতে লাগলেন। ষড়যন্ত্রের বিষয় টের পেয়ে বুঢ়াগোহাঁই বরফুকনকে বন্দী করবার জন্য সৈন্য পাঠালেন। কন্যা সতর্ক করে দেওয়ায় বরফুকন পালিয়ে গিয়ে মান বা বর্মীদের সঙ্গে নিয়ে এসে আসাম আক্রমণ করলেন। প্রধানমন্ত্রী একখণ্ড হীরা গলাধঃকরণ করে আত্মহত্যা করলেন। তারপর শুরু হল মানদের আত্যাচার। রাজমাতা রূপসিং নামে এক ভাড়াটে বরকন্দাজের সাহায্যে বদনকে হত্যা করলেন। বর্মী সৈন্যেরা ফিরে এসে আবার আক্রমণ জোরদার করল। রাজমাতা ও রূপসিং দুজনেই পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করলেন। সুদীর্ঘ ছয় বছর ধরে মানদের অবিরাম হত্যা ও লুণ্ঠনের লীলা চলল। প্রজারা গ্রাম ছেড়ে জঙ্গলে আশ্রয় নিল। তারপর ইংরেজরা এসে দেশে শান্তিস্থাপন করল ও সকলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। কিন্তু দেশ চলে গেল বিদেশীর হাতে। 'বরফুকনের গীতে' এই কাহিনীই বর্ণিত হয়েছে মালিতা আকারে। এই গীত গাথার পাঠে এদিকে ওদিকে সামান্য ইতরবিশেষ দেখা যায়, কিন্তু ইতিহাসের

মূল ঘটনাবলী বিভিন্ন পাঠে একপ্রকার অবিকৃত। তদানীন্তন ইতিহাসের নায়কদের কারো কারো প্রতি জনসাধারণের সহানুভূতি ও কারো কারো প্রতি তাদের ক্রোধের কথা বলিষ্ঠভাবে ব্যক্ত হয়েছে এই সব গীতে। সুনিপুণ শাসক হিসাবে প্রধানমন্ত্রী পূর্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁইকে যথার্থত অবতার বলা হয়েছে। সেইসঙ্গে তাঁকে নারকীও বলা হয়েছে, কারণ তাঁর সূত্রেই বদনকে পালিয়ে যেতে হয়েছিল ও মানদের ডেকে আনতে হয়েছিল। রূপসিং ও রাজমাতাকেও কঠোরভাবে তিরস্কার করা হয়েছে। সরল ঘরোয়া ভাষায় লিখিত এই 'বরফুকনর গীত' হল এক বিরাট ঐতিহাসিক বিপর্যয়ের প্রতি জনসাধারণের মর্মন্তুদ প্রতিক্রিয়ার প্রতিফলন, যেন এক জাতীয় ট্রাজেডির সামূহিক প্রকাশ।

মণিরাম দেয়ান (দেওয়ান) ছিলেন আধুনিক ভারতের প্রথম স্বরাজসাধক বীর-সন্তানদের অন্যতম। 1857 সালে আমাদের সর্বপ্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের আগুন যখন দেশময় ছড়িয়ে পড়েছিল, সেই সময় এই অভিজাত বংশীয় অসমীয়া ব্রিটিশের বিরুদ্ধে আসামের স্বদেশপ্রেমী শক্তিগুলিকে সংগঠন করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। প্রথম প্রথম তিনি বিদেশী শাসনতন্ত্রের পথ সুগম করার উদ্দেশ্যে, ব্রিটিশদের হয়ে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত গঠনে সহায়তা করেছিলেন—'রাইজক চুঁচি নিবলৈ'—অর্থাৎ প্রজাসাধারণকে শোষণ করার জন্য। কিন্তু পরে যখন তিনি বুঝতে পারলেন মতলবী ব্রিটিশ সরকারের আসল উদ্দেশ্য কতখানি জঘন্য, তাঁর মনে একটা সমূহ পরিবর্তন ঘটল। তিনি একটা বিদ্রোহ ঘটাবার জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন। কলকাতা থেকে তিনি ভ্রাম্যমান সাধুদের মারফত গোপনে আসামে খবরাখবর পাঠাতে লাগলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ব্রিটিশেরা তাদের ভারতীয় পুলিশ কর্মচারীদের তৎপরতার ফলে মণিরামকে হাতেনাতে ধরে ফেলল। 1858 সালে নামমাত্র বিচারের অভিনয় করে মণিরাম ও তাঁর বিশ্বাসভাজন সহকর্মী পিয়ালী বরুয়াকে যোরহাটে ফাঁসি দেওয়া হয়। তাঁর বীরত্বব্যঞ্জক কার্যাবলী ও মহৎ আত্মাহুতি স্বভাবতই সর্বসাধারণের অন্তরে আলোড়ন তুলেছিল। তারই ফল হল 'মণিরাম দেয়ানর গীত' নামে পরিচিত বিষাদপূর্ণ গীতগাঁথা :

সোণর ধোঁয়াখোয়াত খালি ঐ মণিরাম
রূপর ধোঁয়াখোয়াত খালি ;
কিনো রজাঘরত দোরোহ আচরিলি
ডিঙিত চিপেজরী ললি।

o

সোনার হুঁকো টেনেছিলি ওরে ও মণিরাম
রূপোর হুঁকোয় দিয়েছিলি টান,
কি দ্রোহ আচরিলি রাজবাড়ি গিয়ে তুই
গলায় তোর দড়ি দেয় টান।

□

মণিরাম হলে ঔ উঠি বহি রজা
দহ বুলিলে হয় পচি ;
ফৌজ্বারী দেয়ানী আদালত পাতি
রাইজক নিলে ঐ চুঁচি।

o

উঠতে বসতে মণিরাম চলে রাজার চালে
দশ বলতে পঁচিশ ফেলে দান ;
ফৌজদারী দেওয়ানী আদালত বসিয়ে
গরীবের চুষে নেয় প্রাণ।

এই সব কবিতার অজ্ঞাত কবিরা কল্পনা করেছিলেন মণিরামের মৃত্যুদণ্ডের কথা শুনে সারা দেশ হৃদয়বিদারক শোকের সাগরে নিমজ্জিত হয়েছিল—এমন কি গাছের পাখিরাও স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। দেওয়ানের যুবতী স্ত্রী চম্পাবতীর প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে কবিরা লৌকিক বিশ্বাস বা অন্ধ সংস্কারের অবতারণা করেছিলেন :

চম্পাবতী গাভরুর সেন্দূর মছে খালে
ঘনে সোঁহাত লরে ;
কাউরীয়ে রমলিয়ার ফেঁচাই কুরুলিয়ায়
সপোনত আগদাঁত লরে।
দেশ পাতিবলৈ ওলালি মণিরাম
যতরাই মারিলে হাঁচি ;
লগর সমনীয়াই শতরু শালিলে
ললি যোরহাটত ফাঁচী।

o

চম্পাবতী যুবতীর সিঁদুর মুছে গেল
ঘন ঘন ডান হাত নড়ে,

কাক ডাকে পেঁচা ডাকে, স্বপনেতে দেখে
আগ দাঁত হল নড়বড়ে।
দেশটাকে গড়ে নিতে বেরোলি মণিরাম
কে যেন হাঁচিল বাটে,
সঙ্গী সাথী যত ছিল শত্রুতা সাধিল
ফাঁসী গেলি তুই যোরহাটে।

অসম্পূর্ণ হলেও যাদের বিষয়ে ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন গীতগাথা পাওয়া গেছে নিচে তাদের হ্রস্ব পরিচয় দেওয়া গেল :

জয়মতী কুঁয়রী—এই উচ্চ-বংশীয়া মহিলাকে একটি কাঁটা গাছের সঙ্গে বেঁধে উন্মুক্ত প্রান্তরে অমানুষিক অত্যাচার করা হয়েছিল, কারণ তিনি তাঁর স্বামী গদাপাণি বা গদাধর কোঁয়র কোথায় আছেন প্রকাশ করতে অস্বীকার করেছিলেন। গদাধর ছিলেন রাজা চুলিকফার সিংহাসনের প্রতিদ্বন্দ্বী। জয়মতী বীরাঙ্গনার মতো মৃত্যুবরণ করার পর গদাধর রাজধানী আক্রমণ করেন এবং রাজাকে হত্যা করে সিংহাসনের অধিকারী হন।

হরদত্ত ও বীরদত্ত—কামরূপের এই সম্ভ্রান্ত ভ্রাতৃদ্বয় কামরূপ অঞ্চলের গরীব প্রজাদের উপর আহোম শাসকদের উৎপীড়ন বন্ধ করার জন্য বিদ্রোহ করেছিলেন। তাঁদের সেই বিদ্রোহ কঠোর হস্তে দমন করেছিলেন গৌহাটির শাসনকর্তা বরফুকন।

হালকণ—আসলে এঁর নাম ছিল হলকম্ (Holcombe)। ইনি ছিলেন ব্রিটিশ আমলের এসিস্টেন্ট কমিশনার। ইনি 197 জন লোকের একটি দল নিয়ে গিয়েছিলেন ওয়াঞ্চোদের পাহাড়ে জরিপ করতে। নাগারা আশিজন লোক সহ হলকম্‌কে হত্যা করে।

নাহর—স্বর্ণকারের মেয়ে কাঞ্চনী রানী হবার আগে নাহর ছিল তার প্রেমাস্পদ। রানী হবার পর কাঞ্চনী নাহরকে কোয়ঁর উপাধি দিয়ে রাজবাড়িতে এনে রাখে। রাজ অনুগ্রহ পেয়ে তারা লঘু-গুরু কাউকে মানত না, যথেচ্ছচার করে বেড়াত। অবশেষে আহোম-রাজ খোঁড়া রাজা দু'জনাকেই কেটে ফেলেন।

চিকন ও সরিয়হ—এই দুই ভাই ছিল নাওবৈচা ফুকনের সাত ছেলের দুজন। নাওবৈচা ফুকন (অর্থাৎ আহোম রাজের নৌ-সেনার অধ্যক্ষ) ছিলেন রাজা জয়ধ্বজ সিংহের শ্বশুর। রানীর দত্তকপুত্রকে সিংহাসনে বসাবার ছল করে এই দুই ভাই নিজেদের হাতে ক্ষমতা নেবার চক্রান্ত করেছিল। কিন্তু ঘটনাচক্রে অপর চারজন ভায়ের সঙ্গে এই দুই ভাইকেও মৃত্যুবরণ করতে হয়।

সাধুকথা হল রূপকথার অসমীয়া রূপ। এই 'সাধুকথা' সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হল লোককথা, উপকথা, রূপকথা, নীতি কাহিনী, রূপক কাহিনী ও পৌরাণিক কাহিনী। 'সাধু' শব্দের অর্থ হল সৎ, আবার সাধু অর্থে সাউত বা সওদাগরও বোঝায়। সুতরাং সাধুকথা অর্থে বুঝতে হবে ঈশপ-এর উপকথার মতো, বাইবেল-এর রূপক কাহিনীর মতো কিংবা দূর বিদেশে বহুকাল থেকে স্বদেশে প্রত্যাগত সদাগরের গল্পের মতো কোন আশ্চর্য অদ্ভূত ঘটনার কথা। সংস্কৃত বই থেকে কিছু কিছু গল্প নিশ্চয় লোকের মুখে মুখে লৌকিক কাহিনীতে পরিণত হয়েছে। কিছু কিছু গল্প সম্ভবত এসেছে আসামে পরিব্রজনকারীদের মুখ থেকে, কিংবা বিভিন্ন সময়ে যেসব জাতি আসামে এসে বসবাস স্থাপন করেছে—তাদের কাছ থেকে। তা না হলে য়ুরোপ-এর সিণ্ডেরেলা গল্পের সঙ্গে প্রায় অবিকল মিলে যাবার মতো অসমীয়া তেজীমলার কাহিনীর অস্তিত্ব কীভাবে আর ব্যাখ্যা করা যায়? চীন দেশে একটি কাহিনী আছে যা অনেকটা আসামের গারোদের মধ্যে প্রচলিত একটি কাহিনীর অনুরূপ। অন্ত বেশ কয়েকটি কাহিনী আছে যা বঙ্গদেশের সেইরকম কাহিনীর সঙ্গে অনেকটা মিলে যায়। সে যাই হোক, স্থানীয় পরিসজ্জায় এইসব বিদেশাগত কাহিনী যখন সরল লোকভাষায় কথিত হয়, মনে হয় ভাবে ও পরিবেশে এগুলি সম্পূর্ণ অসমীয়া। আসামের গ্রামবাসীদের চরিত্রে যেমন অন্ধ বিশ্বাস, উদ্ভট কল্পনা, রসবোধ ও সহজ বুদ্ধির টানা পোড়েন দেখা যায়, এইসব সাধুকথাতেও তেমনি। আধুনিক লেখকেরা তেজীমলার কাহিনীটি নিজেদের মনের মতো করে সাজাতে গিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন সংকীর্ণচিত্ত ব্যক্তিরা কীভাবে বৃহত্তর সমাজের ক্ষতি সাধন করে থাকে। তাঁদের হাতে তেজীমলা হয়ে উঠেছে এক বিদ্রোহিনী—যে নাকি অত্যাচারীর হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করতে চেয়েছে, মরণ বরণ করে নিতে অস্বীকার করেছে। দিদিমা-ঠাকুমাদের মুখে এইসব কাহিনী শুনে শুনে শিশুরা প্রকৃতির জগৎ ও পশুপাখীদের জগৎ সম্বন্ধে পরিচয় লাভ করে। সে জগতে শেয়াল ও কাক সর্বদাই চতুর কিন্তু দুষ্ট; বাঘ শক্তিমন্ত ও ভয়ঙ্কর হলে কি হবে—ভীষণ বোকা; বেড়াল বেজায় লোভী; বাঁদর বুদ্ধিমান, ইত্যাদি। পৌরাণিক কাহিনীগুলিতে অনেক সময় অনেক জানবার মতো কথা আছে, যথা পৃথিবী ও মানুষ সৃষ্টির কথা। সেইসঙ্গে জানা যায় কুকুরের শিং গজায় না কেন, কেনই বা কাঁকড়ার দশটা পা, ইত্যাদি। হাস্যরস ও বুদ্ধিমত্তার মিশেল দেওয়া গল্পগুলি খুবই মজার: রাতকানা জামাই গিয়েছিল শ্বশুরবাড়ি। নিজের খুঁত ঢাকবার জন্য তার আপ্রাণ চেষ্টা। শাশুড়ীকে ঠকাতে গিয়ে জামাই তাকে বেড়াল ভেবে লাগাল গালে প্রচণ্ড এক চড়। ঝোপেঝাড়ে লুকিয়ে থাকতে,

শাশুড়ী তার অভ্যাসমতো বাসনকোষণ ধোওয়া নোংরা জল ফেলে দিল সেই ঝোপের উপর। জামাই তখন সেই নোংরা জলে ভিজে জুবরী! টোটোন তামুলী বুদ্ধি কৌশল খাটিয়ে রাজা ও মন্ত্রীর চোখে ধুলো দিয়ে কেমন করে রাজকুমারীকে বিয়ে করে উচ্চ রাজপদ অধিকার করেছিল—সেই কাহিনীটিও বেশ কৌতুকজনক। কিছু কাহিনী আছে যার কিছু কিছু অংশ ছড়া কেটে বলা হয়, সেগুলির সহজ ছন্দ বহু প্রজন্ম ধরে শিশুদের কল্পনাকে দোলা দিয়ে থাকে। তেজীমলার সদাগর বাবা যখন বাণিজ্যে বেরিয়েছিলেন ডিঙা সাজিয়ে, সেই অবসরে কুটিলা বিমাতা তেজীমলাকে হত্যা করে পুঁতে রেখেছিল মাটিতে। সেই মাটিতে একটা গাছ গজাল, একটি লতা লকলকিয়ে উঠল সেই গাছের ডাল জড়িয়ে, সেই লতার মাথায় ফুটল একটি সুন্দর ফুল। তেজীমলাই সেই ফুল। সদাগরের ডিঙা পারে এসে লাগতে সদাগর হাত বাড়াল ফুলটি ছিঁড়ে নিতে। ফুল তখন কথা কয়ে উঠল :

হাতো নেমেলিবি ফুলো নিছিঙিবি
ক'রে নাওরীয়া তই ?
পাট কাপোরর লগত মাহী আই খুন্দিলে
তেজীমলাহে মই।

o

না বাড়িয়ো হাত যেন না ছিঁড়িয়ো ফুল,
কোথা থেকে মাঝি এলে তুমি,
বিমাতা করিল পাট পাটের সহিতে,
ফুল নই—তেজীমলা আমি।

□

সাত

লোকসঙ্গীত ও লোকনৃত্য

পাঠক যদি মেনে নিতে পারেন যে শিবের আদেশে তণ্ডু ভরতকে তাণ্ডব নৃত্য শিখিয়েছিলেন, এবং পার্বতী উষাকে সেই লাস্যনৃত্য শিখিয়েছিলেন যা প্রথমে যায় গুর্জরাতে, এবং পরে ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র দেশে, তাহলে আসামের লোকেরা খুবই আহ্লাদ বোধ করবে। ইতিপূর্বেই আমরা বলে এসেছি যে শিব ছিলেন আসামেরই বাসিন্দা। এখানেই তিনি তাঁর 'গণ'সমূহের অন্যতম তণ্ডুকে বলে দিয়েছিলেন ভরতকে নৃত্যশিক্ষা দিতে। উষা ছিলেন বাণরাজার কন্যা। বাণরাজার রাজধানী ছিল তেজপুরে। অনিরুদ্ধ গোপনে এই তেজপুরেই এসে উষার পাণি প্রার্থনা করেছিলেন এবং তেজপুর থেকে তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলেন দ্বারকায়। ভারতের প্রথম চিত্রশিল্পী বলে খ্যাত চিত্রলেখা ছিলেন উষার প্রাণসখী।

ভারতীয় ধারণায় সঙ্গীত হল গীত বাদ্য নৃত্য অভিনয় প্রভৃতি কলাত্মক প্রকাশের বিভিন্ন দিকের সমাহার। মোটামুটি ভাবে বলা যায় আসামে জনগণের লোকরঞ্জনের ক্ষেত্রেও এই কথাটা খাটে। সর্ববিধ প্রকাশ কলার একত্র সমন্বয়ের প্রসঙ্গটি বেশ জটিল এক ধারণা। মহেঞ্জোদারোর প্রত্নতত্ত্ব, বেদ-বেদান্ত, ভারতীয় নন্দনতত্ত্ব বিষয়ে ভরত ও পাণিনি প্রভৃতির প্রামাণ্য রচনা থেকে এই ধারণাটি আহৃত। উচ্চাঙ্গ বা শাস্ত্রীয় বলে অভিহিত সঙ্গীত বা নৃত্যের সঙ্গে লোকসঙ্গীত কিংবা লোকনৃত্যের কখনো যে সংস্পর্শ ঘটেনি এমন নয়। শ্রীমতী রুক্মিনী দেবী লিখেছেন : 'একসময়ে নিশ্চয় সমগ্র ভারতে একটিই ক্লাসিকেল নৃত্যপদ্ধতি প্রচলিত ছিল। কালক্রমে অবশ্য দেশের ভিন্ন ভিন্ন সাংস্কৃতিক অঞ্চল আপন বৈশিষ্ট্যমূলক স্থানীয় প্রকাশভঙ্গী গড়ে তুলে থাকবে। এটা ঘটে থাকবে নানা কারণে। এইসব অঞ্চলের লোকনৃত্যে যেসব বিশিষ্ট চাল বা গতি ছিল, সেগুলি ক্রমে ক্রমে ক্লাসিকেল ধাঁচের অঙ্গীভূত হয়ে থাকবে। ব্যবসা বাণিজ্য অথবা বহিরাক্রমণের সূত্রেও হয়ত বিদেশী প্রভাব কিছু এসে থাকবে। আবার নানা কারণে একটা অঞ্চল হয়ত অন্য অঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে পারে। সেই স্বাতন্ত্র্যের ফলে নিরালায় নূতন নূতন বৈশিষ্ট্য গড়ে

উঠতে পারে।...ভারতে নৃত্যকলার চারটি প্রধান গোষ্ঠী বা শাখা—যথা ভারতনাট্যম্, কথাকলি, মণিপুরী ও কথক—হয়ত এইরকম একটা পদ্ধতিতে উদ্ভূত ও বিকশিত হয়ে থাকতে পারে।...কথাকলির ক্ষেত্রে দেখা যায়, ভরতের শাস্ত্রীয় অনুশাসনের উপর কোন প্রাচীন আঞ্চলিক কলা পদ্ধতি অধিস্থাপিত হয়েছিল বলে মনে হয়।'

নিঃসন্দেহে বলা যায় নৃত্য অসমীয়া লোকসংস্কৃতির একটা অপরিহার্য অঙ্গ। কোন কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে নৃত্য তাদের জীবনযাত্রার অংশবিশেষ। অনেকেই ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করে থাকে নৃত্যের সহযোগে। ইতিপূর্বে আমরা দেবধ্বনি উৎসবের কথা বলেছি, যেখানে দেওধারা তাদের নিজ নিজ দেবদেবীর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ভূতগ্রস্ত লোকের মতো চারিপাশের বহির্জগতের কথা বিস্মৃত হয়ে, সারা রাত ধরে নেচে থাকে। বোড়োদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পূজা হল খেরাই পূজা। এই পূজার পাত্র হলেন বোড়োদের মুখ্য দেবতা বাথৌ বা শিব। পূজা যখন চলতে থাকে দেবতার বেদীর সামনে একজন কুমারীকে ধর্মীয় নৃত্য করে যেতে হয়। দেওধনী কন্যাটি খাম-ঢোল ও সিফুং বাঁশীর সংগতের সঙ্গে 'দশায়-পাওয়া' অবস্থায় নেচে চলে। শুরু করে শিবপূজা দিয়ে, শেষ হয় লক্ষ্মীর পূজায়—মাঝখানে প্রার্থনা করা হয় অন্য অন্য দেবদেবীকে। নৃত্যের একটা পর্বে সে হাতে ঢাল-তলোয়ার নিয়ে রুদ্ররসের রণনৃত্য করে। দেওধনী নৃত্যের চালি ও চলনের বিশেষ বিশেষ তাৎপর্য থাকে যা কেবল বোড়ো পুরোহিতই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। এই নৃত্যের সঙ্গে কোন গান থাকে না; কিন্তু প্রত্যেক দেব বা দেবীর বেলা বাঁশির সুর ও ঢোলের বোল ভিন্ন ভিন্ন হয়। তদনুসারে নৃত্যরতা কন্যাটি তার দেহভঙ্গীও অদলবদল করতে থাকে। বরযাত্রার সময় একঘেয়েমি থেকে রক্ষা পাবার জন্য বরের বাড়ির লোকেরা নাচতে নাচতে কন্যার বাড়ি যায়, ফেরবার সময়ও নাচতে নাচতে ফেরে। এইসব লোকনৃত্য ক্লাসিকেল নৃত্যে অভিযোজিত হতে পারে এমন কথা আমরা বলি না। বলিষ্ঠ বিহুনাচকে আজকাল মঞ্চস্থ করা হয়ে থাকে মাঝে মাঝে, তবে এ নাচে অদলবদল ঘটিয়ে নূতন রূপে বিকাশ করা হয়নি। বিহুনাচের সঙ্গে তার উপযোগী গান গাওয়া হয়, বাদ্যও বাজানো হয়। বিহুগীতগুলির নানান সুর আছে। সেইসব সুরের সঙ্গে এবং ঢোল, পেঁপা (মোষের শিঙের সঙ্গে লাগানো নলখাগরার বায়ুযন্ত্র) ও টকার (একখণ্ড গোটা বাঁশ এক মাথায় ফালা করে দুটো ফালা আঘাত করে টকাটক্ শব্দ করার একটি সরল বাদ্য) সঙ্গে তাল রেখে, নাচুনী তার অঙ্গ-সঞ্চালন করে নাচে। বিহুনাচ হল যৌবনের নৃত্য, বসন্ত ঋতুর নৃত্য—সুতরাং এই নাচে সেই ভাবের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে। বিহুগানের মতো বিহুনাচেও শৃঙ্গার

রসেরই প্রাধান্য বেশি। বিহুনাচের জন্য দরকার কমনীয় ও নমনীয় শরীর ও সুরেলা কণ্ঠস্বর—দুটির সমন্বয় সাধিত হলে ফল লাভ হয় আশ্চর্যজনক। বিহুর ঢুলী কথক নাচিয়ের মতো প্রায়ই মুখে বোল বলে যায় এবং ঢোলে চাঁটি মেরে সেই বোল রূপায়িত করে। তারপর সে এমন ভাবে নৃত্য করে মনে হয় দেহে তার হাড় বলতে কিছু নেই। এরকম নৃত্যের কোন বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তি আছে কিনা, সে কথা নিশ্চিত বলা যায় না। মিরি যুবতীরা কমনীয় অঙ্গসঞ্চালন সহকারে তাঁত বোনা, ধান বোনা, ধান কাটা প্রভৃতি বাস্তব জীবনের দৃশ্য মিরি যুবকদের ঢোল বাজানোর তালে তালে অভিনয় করে দেখায়। কামাখ্যার দেবধ্বনি নৃত্য যারা বিশেষ ভাবে চর্চা করেছেন তাদের কারো কারো মতে এই নৃত্যকে তাণ্ডব শ্রেণীভুক্ত করা চলে।

বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষ্যের জোরে বলা চলে অতীতে আসামে মার্গ সঙ্গীতের বিকাশ ও চর্চা হয়েছিল। আমরা চিত্রলেখার কথা না হয় বাদই দিলাম কারণ, চিত্রলেখা পুরাণের চরিত্র বিশেষ মাত্র। কিন্তু তিনি যে বাণের প্রাসাদের জনৈকা অন্তঃপুরচারিনী ছিলেন সেটা প্রণিধানযোগ্য। ডক্টর মহেশ্বর নেওগ উল্লেখ করেছেন যে, হুয়ান চোয়াঙ লিখে গেছেন যে তাঁকে প্রতিদিনই রাজা ভাস্করবর্মার প্রাসাদে নৃত্যগীত দ্বারা আপ্যায়ন করা হত। অকৃতদার রাজার নৃত্যগীতবিশারদা একজন পরিচারিকা ছিলেন। প্রভুর প্রতি তিনি এমনি অনুরাগিনী ছিলেন যে রাজাকে যখন চিতাশয্যায় শোয়ানো হয় তিনি সেই চিতার আগুনেই সহমৃতা হয়েছিলেন। নবম শতকে কামরূপের রাজা বনমালের একটি তাম্রশাসনে শিবমন্দির নৃত্য করার দায়িত্বে রতা নটী, দলুহাঙ্গনা, বেশ্যা ও বারস্ত্রীর উল্লেখ দেখা যায়। দশম শতকের আগের ও পরের যেসব ভাস্কর্যের নিদর্শন পাওয়া গেছে সেগুলিতে নৃত্যরত দেবদেবী ও নরনারীর মূর্তি খোদিত দেখা যায়। তা থেকে প্রমাণ হয় যে এ দেশে ঐতিহ্যবাহী ক্লাসিকেল পদ্ধতিতে নৃত্যের অনুশীলন হত। চোদ্দ শতক থেকে আরম্ভ করে বহু কবি রামায়ণ ও ভাগবতের আখ্যান অবলম্বনে গান রচনা করে এসেছেন। এইসব গান কোন রাগ বা রাগিনীতে গেয়, গীতিকার সবসময় তার উল্লেখ করেছেন। আসামের আঞ্চলিক নৃত্যপদ্ধতির অন্যতম প্রচারক এবং এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, অধুনা আসাম ললিতকলা একাডেমির সম্পাদক শ্রীপ্রদীপ চালিহা অসমীয়া মার্গ নৃত্যকে এইভাবে শ্রেণীবদ্ধ করেছেন: (১) ভাওনা, (২) মন্দির নৃত্য ও (৩) ওজাপালি। ভরতের নাট্যশাস্ত্র, সার্ঙ্গদেবের সংগীত রত্নাকর কিংবা নন্দিকেশ্বরের অভিনয় দর্পনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যে মার্গ নৃত্য প্রস্তুত হয়, তার সঙ্গে লোকনৃত্যের কোন তুলনা হয় না। সে কথা মেনে নিয়েও বলা যায় যে উপরোক্ত তিন রকমের নাচ

লোকরঞ্জনের উপায়রূপে আসামে অতি পুরাতন কাল থেকে শিক্ষা দেওয়া হয়ে আসছে, নেচেও আসা হচ্ছে। মন্দির নৃত্যে প্রশিক্ষণ নেবার জন্য একশ্রেণীর লোক নিযুক্ত হয়ে থাকত। ডুবি, হাজো, বিশ্বনাথ ও দেরগাঁয়ের মন্দিরগুলিতে নটী বলে একশ্রেণীর মেয়েদের এইভাবে শিক্ষা দেওয়া হত। আসামে একটি সম্প্রদায়ই ছিল নটকলিতা নামে। সমাজের অবহেলার ফলে এই সকল লোক তাদের এই বৃত্তি কবেই ত্যাগ করেছেন।

ভাওনা হল বৈষ্ণব ধর্ম সম্পর্কিত একাঙ্ক নাটকের অভিনয়। এর প্রবর্তন করেছিলেন শঙ্করদেব (খৃষ্টীয় 1449-1568 অব্দে)। মুখ্যতঃ বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারের দিকে লক্ষ্য রেখে তিনি এই নৃত্য-নাটকের প্রচলন করিয়েছিলেন। গ্রামের নামঘর ও বৈষ্ণব সত্রগুলিতে ভাওনা অভিনীত হয়। এই একাঙ্ক নাটকগুলি সংস্কৃত রূপকের আধারে রচিত হলেও, এদের বিকাশ ঘটেছিল সম্পূর্ণ স্বাধীন রূপে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, ভাওনার যিনি সূত্রধার, তিনি নাটকের কোন চরিত্র না হলেও অভিনয়ের অপরিহার্য অঙ্গ। তিনি শ্লোক উচ্চারণ করেন, গীত গান, নাচেন এবং ভাওনার বিভিন্ন স্তরে কি কি হচ্ছে তা কথায় বা গদ্যে ব্যাখ্যা করেন। এই পুরাতন নাট্যাভিনয় থেকে সূত্রধারী নাচ, কৃষ্ণভঙ্গী, প্রবেশ ও প্রস্থানের বিশেষ বিশেষ নৃত্যরূপের উদ্ভব হয়েছে। সূত্রধার প্রবেশ করেন দর্শকদের প্রণাম করার ভঙ্গীতে মাটিতে মাথা রেখে। তারপর তিনি মাথা তোলেন, একটি হাতের পর অন্য হাতটি তোলেন, অতঃপর একটি পায়ের পর অন্য পায়ের ভর দিয়ে তিনি উঠে দাঁড়ান, সর্বশেষে তিনি সোজা হয়ে দাঁড়ান। এখন তিনি ধিন্‌দেই ধিন্‌দেই বোলের সঙ্গে ধীরগতি নৃত্যের জন্য প্রস্তুত—তাঁকে দেখে মনে হয় তিনি যেন দেবতা ও ভক্তদের প্রতি ভক্তি নিবেদনের একটি প্রতিমূর্তি। নান্দীগানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অঙ্গসঞ্চালনের গতি খর হতে শুরু করে আর ভাওনা-নাটকের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিপ্রতর হতে থাকে। কৃষ্ণভঙ্গী ও গোপীভঙ্গী নৃত্যও যেমন রুচিকর তেমনি মনোরম। কৃষ্ণের সঙ্গে কখনো কখনো থাকেন বলভদ্র কিংবা অন্য গোপবালকেরা। কৃষ্ণ প্রবেশ করেন বংশীধারী ভঙ্গীতে তাঁর মুখে থাকে কমনীয় কৌতুকের হাসি ও বিমল স্বর্গীয় ভাব। কৃষ্ণভঙ্গীকে 'মজুরা'-ও বলা হয়। প্রদীপ চালিহার মতো বিদগ্ধ ব্যাখ্যাতারা বলেন প্রাচীনকালে যদিও আসামে মার্গ সঙ্গীতের চর্চা ছিল, স্থানীয় সঙ্গীত শিল্পীরা সঙ্গীতবিদ্যার বিকাশ সাধন করেছিলেন তাঁদের ব্যক্তিগত বা দেশগত প্রতিভা অনুসারে, ধ্রুপদী ধারার বাইরে অন্য কোন প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে উত্তর ভারতের বেশ কিছু রাগের উল্লেখ যদিচ

প্রাচীন অসমীয়া সঙ্গীতরচনায় দেখা যায়, সেগুলির সুর একই রকম নয়, সেগুলি স্পষ্টত আঞ্চলিক প্রভাবের সাক্ষ্য বহন করছে। সারঙ্গ, ভৈরব, পাহাড়ী, চৌরথ ও বেলি হল এই ধরনের রাগ। উপরন্তু আসামে আকাশমণ্ডলী, বায়ুমণ্ডলী ও দেবজিনি-র মতো এমন কয়েকটি রাগ আছে যেগুলি ভারতের অন্যত্র প্রচলিত আছে বলে শোনা যায় না। রাগধ্যানের এক প্রকার লোক-প্রচলিত সংস্করণ রাগমালিতার এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। রাগমালিতায় রাগসমূহের নাম উত্তর ভারতীয় হতে পারে, কিন্তু ধ্যান পৃথক। কৃষ্ণের বংশীধারণের মুদ্রাটি অসমীয়া ভাওনাতে কিছুটা অন্যরকম ; কেবল বুড়ো আঙুল ও কড়ে আঙুল দাঁড় করানো থাকে, সুতরাং ভরতের মৃগশীর্ষ থেকে একটু পৃথক। মণিপুরী রাসনৃত্যেও অসমীয়া 'হস্ত' ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কারো কারো মতে মণিপুরী নৃত্যপদ্ধতি প্রাচীনকালে অসমীয়া বৈষ্ণবধারায় পরিপুষ্ট হয়ে থাকবে। একটা সময় ছিল যখন আহোম রাজারা মণিপুরী রাজাদের সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধ ও পারস্পরিক সামরিক সাহায্যের সূত্রে বেশ ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন। অসমীয়া ভাওনার মধ্যে আরো কিছু কিছু উত্তর-ভারতীয় প্রভাব অনুপ্রবেশ করে থাকবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সূত্রধারের পোশাকের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে—ঘুরি বা পুরুষদের ঘাগরা, জামা ও পাগ অর্থাৎ পাগড়ি সহজেই মিলে যায় কোন মোগল সম্রাটের পরিচ্ছদের সঙ্গে। সপ্তদশ শতক থেকে আহোম রাজারা মোগলদের রাজকীয় পরিচ্ছদ ধারণ করতে শুরু করেন, পৃষ্ঠপোষকরূপে তাঁরাই সম্ভবত বৈষ্ণব কলাকারদের এই ধরনের পোশাক পরতে উৎসাহিত করে থাকবেন। কিন্তু মোগল দরবারের কথক নৃত্য ভাওনার সূত্রধারী নৃত্যকে কোন ভাবে প্রভাবিত করতে পারেনি। তবে কমলাবারীর মতো কয়েকটি গোঁড়া সত্রে কোন কোন নাচের মাঝখানে নাচিয়েরা কিছুক্ষণ ক্ষান্ত দেয়, সে সময় বায়েন খোল না বাজিয়ে বোল উচ্চারণ করে এবং বোলের অন্তে বেশ খরগতিতে খোল বাজিয়ে দেয়। তখন সূত্রধার খোলের বোলের সঙ্গে তাল রেখে পায়ের নূপুর বাজিয়ে নাচে। কথক নাচিয়েরাও ঠিক এইরকমই করে থাকে। এ পদ্ধতিটি কী করে সত্রীয়া নাচে প্রবেশ করেছে বুঝতে পারা শক্ত। অনুমান করা হয়, কোন ওস্তাদ বায়েন উত্তরভারতে তীর্থ করতে গিয়ে কথক নৃত্য দেখে থাকবেন ও এই নূতন পদ্ধতি তাঁর নিজের সত্রে আমদানী করে থাকবেন।

মন্দির-নৃত্য সেই আগেকার মতো আসামের কোন অঞ্চলে আজকাল আর দেখা যায় না। আধুনিক যুগে সামাজিক পরিবর্তনের ফলে পেশাদারী নৃত্যকরের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে এবং তাদের বিদ্যাটি প্রায় নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছে। এরকম হওয়াটাই

স্বাভাবিক কারণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে এইসব নৃত্যশিল্পীকে আধুনিক সমাজ ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করেছিল। নবম শতকে রাজা বনমালের তাম্রশাসনটিতে বেশ্যা, নটী, দলুহাঙ্গনা (মন্দির অঙ্গনা) ও বারস্ত্রী বলতে সামগ্রিকভাবে দেবদাসীকেই বোঝাচ্ছে। নটী শব্দটি নর্তকী শব্দের সমার্থক ; কিন্তু আজও লোকে যখন তাচ্ছিল্যভরে নটী কথাটা উচ্চারণ করে, বুঝতে হবে পতিতা কিংবা চরিত্রহীনা কোন নারীর উল্লেখ করা হচ্ছে। কোন পল্লীর নাম যদি নট পাড়া হয়, সেখানকার লোকে উঠে পড়ে লাগে নামটা বদলাতে। ভাবটা এমন যেন ওই নামের সঙ্গে কোন সামাজিক কলঙ্ক জড়িয়ে আছে।

আদি ব্রিটিশ যুগের বেন্টিঙ্ক নামে জনৈক কমিশনার, চন্দন ও রথেই নামে হাজোর দুজন নটীকে তাদের নৃত্যকলার প্রদীপটুকু যাতে জ্বালিয়ে রাখতে পারে সেজন্য আপ্রাণ চেষ্টায় উৎসাহিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। প্রথম বয়সে মন্দিরের নটী ছিল ধুনুচা ; সে যখন বাষট্টি বছরের পাকা বুড়ী, প্রদীপ চালিহা সাক্ষাতকার সূত্রে তার কাছ থেকে জানতে পারেন যে প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী নৃত্যকলার সাধনা তাকে দারিদ্র্যবশত বাধ্য হয়ে পরিত্যাগ করতে হয়। ডুবি গ্রামের পরিহরেশ্বর শিবের মন্দিরে নিতান্ত বালিকা বয়সে নৃত্য করত কৌশল্যা ও তার সখি রৈয়া। প্রখ্যাত শিল্পী গজেন বরুয়া খুঁজে বের করলেন বার্ষিয়সী কৌশল্যাকে—তার নাম দিলেন 'গোসাঁনী' অর্থাৎ দেবী। সাম্প্রতিক কালে আসামের লুপ্ত কলা পুনরুদ্ধারের জন্য একটি যে আগ্রহের সঞ্চার হয়েছে, ইতিমধ্যেই তার ফল ফলতে আরম্ভ করেছে। ডুবি গ্রামের বাসিন্দা রত্ন তালুকদার তাঁর বালক বয়সে পরিহরেশ্বর মন্দিরে রৈয়া ও কৌশল্যার নৃত্য দেখেছিলেন। তিনি চেষ্টা করলেন তাদের সহায়তায় যদি সেই মন্দির-নৃত্য পুনরুদ্ধার করা যায়, তাঁর এই সাধু প্রচেষ্টায় গ্রামের আরো কেউ কেউ যোগ দিলেন। নানা বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও তাঁরা বেশ কিছু সাফল্য অর্জন করেছেন। স্থির হয়েছিল যে রৈয়া ও কৌশল্যা যতটা পারেন তাঁদের স্মৃতি থেকে এই বিস্মৃত কলাবিদ্যা একালের মেয়েদের শিখিয়ে দেবেন। লীলা দাস, জয়া পাটগিরি, বীণা দাস ও রেনু চৌধুরী নামে চারজন মেয়ে এগিয়ে যায় শিক্ষা নিতে। দুজনেই বুড়ী, উপরন্তু বহুকালের অনভ্যাস, তবু রৈয়া ও কৌশল্যা যথাসাধ্য করলেন এদের হাতে ঐতিহ্যের ঐশ্বর্যটুকু তুলে দিতে। রৈয়া এখন আর ইহজগতে নেই। প্রাচীন মুদ্রা, অঙ্গহার ও বেশবাসসহ মন্দির-নৃত্য যে পুনরায় চালু করতে পারা গেছে, এমন দাবী করা যায় না। তবু রত্ন তালুকদার আমাদের ধন্যবাদের পাত্র, কারণ বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর অন্ততপক্ষে কলামোদীদের আনন্দ বিধানের জন্য তিনি ডুবি গ্রামের

নৃত্যপদ্ধতির একটি রূপ রঙ্গমঞ্চে উপস্থাপন করতে পেরেছেন। তাঁর নৃত্যশিল্পীর দল আসামের বিভিন্ন শহরে ছাড়াও কলকাতা, ভুবনেশ্বর ও দিল্লীতে এই নৃত্য প্রদর্শন করেছেন। সঙ্গীত-নাটক একাডেমি এই নৃত্যকে স্বীকৃতি দান করেছেন এবং ফিল্মস্ ডিভিসন ও আসাম সরকারের প্রচার বিভাগ থেকে এর সবাক ছবি তোলা হয়েছে। মুদ্রা ও অঙ্গহার সহযোগে দেবদাসীদের মতো ডুবির নাচিয়েরা বিগ্রহের সামনে স্নান, জলকেলি, প্রসাধন আরতি ও প্রণতির অভিনয় করে থাকে। এ পর্যন্ত বারোটি বোল উদ্ধার করা হয়েছে, নাচ হয় সেই সব বোল অনুসারে। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় খোলের গুরুখাট (অথবা গুরুঘাট) বাদনের সঙ্গে। নাচের দল সেই সময়টুকু হাতজোড় করে বসে থাকে, গুরুখাট শেষ হলে পর তারা উঠে দাঁড়ায়। আবার খোলে যখন বোল তোলা হয় তখনো তারা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। নাচের পোশাক তালুকদার শৈশবে যেমন দেখেছিলেন, সেই পুরাতন কালের পোশাকের অনুরূপ—লম্বা-হাতের জামা (পরে ছোটহাতা করা হয়েছে); প্রধান পরিধেয় হল ছ-গজ লম্বা একটি বস্ত্রখণ্ড, উত্তরীয়ের মতো বুকের উপর দিয়ে টেনে নেবার মতো অপেক্ষাকৃত ছোট আর একটি বস্ত্রখণ্ড এবং মাথায় ঘোমটা দেবার মতো তৃতীয় একটি বস্ত্রখণ্ড; পায়ে পরা হয় নূপুর; অন্যান্য অলঙ্কারের মধ্যে থাকে যুরীয়া, গলপতা, জোনবিরি, গামখারু প্রভৃতি প্রাচীন যুগের অসমীয়া অলঙ্কার। পরিধেয় বস্ত্র সবগুলিই সাদা। তালুকদার বলেন পোশাক, সাদা হবার ফলে মনে হয় দেবদাসীরা যেন 'কোন রহস্যলোক থেকে সদ্য বেরিয়ে আসা শুদ্ধ পবিত্র কিছু সত্ত্বা'। কিন্তু ডুবি-নৃত্য পুনরুদ্ধারকল্পে এ পর্যন্ত যতটুকু করা হয়েছে তাতে তালুকদার সন্তুষ্ট নন। স্বর্গীয় বেচারাম বায়ন তাঁর খোল-বাদনের দ্বারা একটি বিগত দিনের পরিবেশ ও মৃতপ্রায় কলাকে নূতন করে সৃষ্টি করার কাজে কৌশল্যা ও রৈয়াকে সাহায্য করার জন্য যথাসাধ্য প্রযত্ন করেছিলেন। কিন্তু তখন তারা বর্ষীয়সী; বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গহারের জন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যে পরিমাণ নমনীয়তা প্রয়োজন, তা তাঁরা একপ্রকার হারিয়ে ফেলেছেন। খণ্ডিত ভাবে তাঁদের বালিকা বয়সে শেখা নৃত্যকলা যতটুকু তাঁদের স্মরণে ছিল সেটুকু জোড়াতাড়া দেবার জন্য তাঁরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। অনেক সময় চেষ্টা করেও যখন বিফল হয়েছেন, কেঁদে তাঁরা বুক ভাসিয়েছেন। ডুবির পরিহরেশ্বর শিবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আহোম রাজারা। আহোম রাজমহিষী ফুলেশ্বরী কুঁয়রীর সময় থেকে মন্দিরে তাঁরা দেবদাসী নৃত্যের প্রথা প্রবর্তন করেন। ফুলেশ্বরী কুঁয়রী ফুলমতী রূপে স্বয়ং ছিলেন মন্দিরের এক জন নৃত্যপটিয়সী দেবদাসী। ডুবির মন্দিরে নৃত্যগীতের ব্যবস্থা করার জন্য আহোম রাজারা উত্তর আসাম থেকে কিছু

কিছু নট-নটী ও গায়েন-বায়েনদের পরিবার এনে ডুবিতে জমিজায়গা দিয়ে বসিয়েছিলেন। তাদের বংশধরেরা এখনো ডুবিতেই থাকে। বিগ্রহের সম্মুখে দৈনিক দুইবেলা যে সব নটীদের নাচতে হত, তাদের আজীবন কুমারীব্রত পালন করতে হত।

নটুয়া নাচ বা চালি নাচ বোধহয় কোন মন্দির-নৃত্যের ছাঁদে গড়ে উঠে থাকবে ; এ নাচ ভাওনার অন্তর্ভুক্ত করা হলেও মনে রাখতে হবে, ভাওনা হল বৈষ্ণব কলা। সুতরাং ভাওনার সঙ্গে পুরাতন মন্দিরের কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না। বৈষ্ণব নাটকের অভিনয়ে গদা ও ধনু হাতে নিয়ে যোদ্ধারা সচরাচর এই নটুয়া নাচে। প্রদীপ চালিহা যেমন বলেছেন, এ নাচে 'হস্তের' (মুদ্রার) ব্যবস্থা করা হয় না, অথবা রসসৃষ্টির খাতিরে চক্ষু-সঞ্চালনও করা হয় না—যদিচ নটুয়া নাচে করণ, আসন ও সংক্রমণের মতো অন্য সব অলংকরণ থাকে। নটুয়া নাচ দু'রকমের—পখৌজিয়া ও হাজোওলীয়া। অধুনা অপ্রচলিত এই শেষোক্ত নাচটি খুব সম্ভব হাজোর জয়গ্রীব মাধব মন্দির-নৃত্যের উপর আশ্রিত। এ নাচ ছিল সম্পূর্ণ নারী নৃত্য—নাচত হাজোর নটীরা। এ নাচ ছিল শুদ্ধ নৃত্য—তাণ্ডব ও লাস্য রসের সংমিশ্রনে এর উৎপত্তি। ঘুনুচার মতো মন্দিরের নটীদের কাছ থেকে যতটুকু জানা গেছে (যুবতী বয়সে ঘনুচা নিজে হাজোর মন্দিরে নাচত, উপরন্তু সে স্বচক্ষে চন্দন ও রথেই-এর নাচও দেখেছিল) তা থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে নটুয়া নাচের বর্তমান পোশাকটা হাজোর মন্দির-নৃত্যে নটীদের পোশাকের অনুরূপ। বর্তমান নাচটাও মনে হয় সেই মন্দির নৃত্যেরই অনুকরণ। মাথার উপর ঝুঁটিবাঁধা খোঁপা, লহঙা অথবা মেখলার উপর ছোট ছোট করমণি বা পুঁতি, আর মুখ-ঢাকা ওড়না—এই হল নটুয়া নাচের পোশাক। মণিপুরী রাসনৃত্যে এই ধরনের পোশাকই ব্যবহৃত হয়। দক্ষিণপাট সত্রে ভাওনার সময় গোপীরা একই রকম পোশাক পরে থাকে। এ নাচের নৃত্যলিপি বা Choreography খুবই জটিল, উত্তর ভারতের নৃত্যসমূহ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। নাট্যশাস্ত্র, সঙ্গীত রত্নাকর এবং অভিনয় দর্পনের সঙ্গেও এই নৃত্যলিপির কোনো সংগতি নেই। নটুয়া, হাজোর নটী এবং মণিপুরী নাচের 'খরলুটি'—এইসব নাচের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। চালি ও নটুয়া এই দুটি নাম ভিন্ন ভিন্ন সত্রে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে কেন যে ব্যবহার করা হয়, তা এখনো পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি। বলা হয় যে, বৈষ্ণব সঙ্গীতে চালি নৃত্য অন্তর্ভুক্ত হয় হাজোর মন্দিরে নটী নৃত্যের ভিত্তিতে গঠিত হবার পর। নটুয়া কথাটা শঙ্করদেবের কালে ব্যবহৃত হত অভিনেতা অর্থে, এটাও মনে রাখা উচিত। পরে অবশ্য নটুয়া বলতে বোঝাত নটুয়া নাচে সেইসব নর্তকেরা।

ওজা-পালি হল সমস্বরে গান ও সমানতালে নাচ করার একটা দল। ওজা-পালির

ঐতিহ্য ভাওনা থেকেও অনেক প্রাচীন। আসামের জনসাধারণের কাছে ওজা-পালি এতই জনপ্রিয় ছিল যে, ওজা-পালির প্রকৃতি অবৈষ্ণব হওয়া সত্ত্বেও, বৈষ্ণব সংস্কারকেরা তাঁদের নূতন ধর্ম প্রচার করার জন্য ওজা-পালি অনুষ্ঠানের করণ-কৌশল প্রয়োগ করতে এক প্রকার বাধ্য হয়েছিলেন। ওজা হলেন দলের নেতা এবং পালি হল তাঁর দলের লোক। দাইনাপালি হল ওজার প্রধান সহকারী। ওজার পালিতে তিন, চার কি পাঁচজন সহকারী থাকতে পারে। তারা নাচে, খঞ্জনী বজায় এবং রামায়ণ মহাভারত কিংবা পুরাণের কাহিনী নিয়ে গান গায়। পালিদের নৃত্যে ভারতের ক্লাসিকেল নৃত্যের হস্ত, গতি, ভ্রমরী, উৎপ্লবন, আসন প্রভৃতি অনেকগুলি দিকের স্পষ্ট আভাস দেখা যায়—অবশ্য নিয়মিত ও বিজ্ঞানসম্মত চর্চা ও অনুশীলনের অভাবে কিছু পরিমাণে অধঃপতন ঘটে থাকবে। ওজা মোগল নবাবদের মতো পাগ (পাগড়ি), জামা ও ঘুরি (ঘাগরা) পরে, হাতে খারু (বলয়) পরে, কানে উণ্টি (মাকড়ি), আঙুলে আংটি, পায়ে নূপুর আর কোমরে বাঁধে কোমর-বন্ধ। এই পাগ্-জামার ব্যবহার থেকেই সহজে বুঝতে পারা যায়, ভাওনার সূত্রধারের মতো ওজা-পালির ওজারাও সাজ-পোশাকে মোগল প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে থাকবে। কোন কোন ওজা ঘাগরা কিংবা নূপুর পরে না, তার বদলে সাধারণ ধুতি পিরাণ প'রে লম্বা চুল চূড়ো করে বেঁধে বের হয়। ওজা-পালিতে স্বরের যে বিভাজন—যোরা, মন্ত্র ও তারা—তা ভারতীয় বিভাজন উদারা, মুদারা ও তারার সঙ্গে মিলে যায়। কোন কোন প্রবাদ বাক্য থেকে অনুমান হয়, প্রাচীনকালে ওজা-পালি গানে তারা সপ্তস্বরের সকল স্বরই প্রয়োগ করত ; কিন্তু আজকাল আর করে না। তারা মুখ্যত যেসব রাগে গান গায় সেগুলি হল—বড়ারি, সারঙ্গ, পাহাড়ী, চলন, বেহাগ, গান্ধার, কল্যাণ, সৌরথ ও বিভাস। ওজাদের গানে এই সব রাগের ব্যবহার সেই সেই রাগের উত্তর ভারতীয় রূপের সঙ্গে ঠিক ঠিক মেলে না, কিন্তু বলা হয় কয়েকটি রাগ আসামে এখনো শুদ্ধ রূপে সংরক্ষিত। আসল রাগে গিয়ে পৌঁছবার আগে তারা যে রাগমালিতা গায়, সেটি গানের একটি উল্লেখযোগ্য অঙ্গ। রাগমালিতায় কখনো হয় রাগের ধ্যান বর্নন, আবার কখনো রাগ বিশেষের লক্ষণ গীত। এই প্রথা বৈষ্ণব গায়ন-পদ্ধতিকেও প্রভাবান্বিত করেছিল। বৈষ্ণব ওজা পালি যখন গাওয়া হত তারাও রাগমালিতা গাইত। কিন্তু আজকাল রাগে বাঁধা বরগীত গাইবার সময় তারা আর রাগমালিতা গায় না। কোন কোন ওজা তাদের আলাপ শেষ ক'রে হা, রি, তা বলে না। আসল রাগের সূত্রপাত করে। এইসব সরগম ক্রমান্বয়ে ব্রহ্মা, কৃষ্ণ, গণেশ ও শিবকে

বোঝায়। এই সেদিন পর্যন্ত বৈষ্ণব গায়করাও এই অভ্যাস অনুসরণ করত, আজকাল আর করে না। কোন কোন ওজা মালচী বা মালশ্রী বলে একধরনের গান গায়। এইসব গানের সুর খুবই শ্রুতিমধুর, গানের কথাগুলি শুনে মনে হয় অনুপ্রাস-রণিত সংস্কৃত ভাষায় লেখা হয়েছিল। তারা দুর্গা দেবীর অকাল বোধন বিষয়ে যে গান গায় (এ গানকে কখনো কখনো 'জাগর' বলা হয়। সম্ভবত জাগরণ থেকে জাগর কথাটির উদ্ভব) তার ভাষাও সংস্কৃতবহুল। তারা 'পাতশা গীত' বলে এক ধরনের বিমিশ্রিত গানও গেয়ে থাকে। এই সব গানের অর্থ বোঝা খুবই শক্ত কারণ, গানের কথায় অসমীয়া, বাংলা, হিন্দী, ফারসি শব্দরাজি বিমিশ্রিত হয়ে থাকে। এইসব গান মুসলমান প্রভাবে লিখিত হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়। এক শ্রেণীর ওজা মনসার বিষয়ে প্রশস্তিমূলক গান গাইবার পরে নৃত্য শুরু হবার আগের একটি শ্লোক উচ্চারণ করে, যা অভিনয় দর্পণের একটি শ্লোকের সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। ওজা-পালি নাচিয়েরা যখন নৃত্যাভিনয় যোগে হাতি, ঘোড়া ও সিংহের গতিভঙ্গী কিংবা নকুল ও সারসের গ্রীবাভঙ্গী দেখায়, তাদের বর্ণনা বহুলাংশে মিলে যায় অভিনয় দর্পণের বর্ণনার সঙ্গে।

মনসা পূজায় যে দেওধনী নাচ হয়—দুর্গা, শীতলা ও কালীপূজার নাচের সঙ্গে তার অনেকটা মিল আছে! কামাখ্যার পুরুষ দেওধাদের মতো এই দেওধনী মেয়েরাও যেন দশাগ্রস্ত অবস্থায় বাস্তবজ্ঞানরহিত হয়ে যায়। সেই অবস্থায় তারাও নাকি ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে। এইসব মেয়েরা দেবদাসীর মতো উৎসর্গিত জীবন যাপন করে, আজীবন কুমারী থাকে। দেবীর উদ্দেশে জীবন উৎসর্গ করে এরা গুরুর কাছে তাল-লয় সমন্বিত জটিল নৃত্যকলায় শিক্ষা নিয়ে থাকে। কপালে সিঁদুরের একটি প্রকাণ্ড টিপ পরে, দীঘল চুলের গোছা মেলে দিয়ে দেওধনী নাচতে শুরু করে এবং ধীরে ধীরে তার পায়ের গতি ক্ষিপ্রতর হতে থাকে, মস্তক সঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গে তার এলোচুল চারিদিকে ছড়িয়ে যায়। জয়ঢাক ও ভুটিয়া করতালের ক্ষিপ্র বাদনের সঙ্গে তাল রেখে এই যে নাচ, একে তাণ্ডব নৃত্য বলা চলে। মনে রাখা উচিত, বোড়ো দেওধনীর মতো মারৈ দেওধনীও শিব, ধর্ম, দুর্গা, কুবের, কার্তিক, লক্ষ্মী ও অন্যান্য দেবতারও অর্চনা করে। যখন যে দেবতার অর্চনা করে সেই দেবতার সঙ্গে যোগযুক্ত কোন যন্ত্র, যথা ঢাল তরোয়াল, প্রজ্বলন্ত মশাল, ডম্বরু ইত্যাদি হাতে নিয়ে তাকে তখন ভিন্ন ভিন্ন তালে-মানে নাচতে হয়। দুর্ভাগ্যবশত যত দিন যাচ্ছে, সমাদরের অভাবে এবং শিক্ষিত ব্যক্তিরা অধিক সংখ্যায় এইসব কলা সম্বন্ধে চর্চা না-করার

ফলে, অতীতের অনেক কৃতির মতো এই নৃত্যও বিস্মৃতির অতলে যাবার দাখিল হয়েছে।

শিক্ষিত ব্যক্তিদের অনাদর ও উপেক্ষার কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সখেদে উল্লেখ করা দরকার যে ভাবনা, মন্দির-নৃত্য বা ওজা-পালির সঙ্গে যে কণ্ঠসঙ্গীত বা যন্ত্রসঙ্গীত হয়, সেই ঐতিহ্যসম্ভার থেকে লোক-গীতি রচয়িতারা যে যথেষ্ট পরিমাণে আহরণ করেছেন—এমন কথা বলা যায় না। তার কারণ অবশ্য এই যে, উপরি-বর্ণিত নাচগুলি এক-একটি সুসংগঠিত ও বিকাশপ্রাপ্ত ধর্মপদ্ধতির সঙ্গে জড়িত হয়ে এসেছে এবং ফলে সেই সব নাচের সঙ্গে গীত-গানগুলির মধ্যে একটা ধ্রুপদী ভঙ্গী রয়ে গেছে। বিহু নাচও অপেক্ষাকৃত অমার্জিত হলেও শস্যের মঙ্গলে সংশ্লিষ্ট দেবতাদের সন্তোষ সাধনের জন্য কৃষককুলের একটা প্রয়াস আছে বলে ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু সুনিয়ন্ত্রিত কোন ধর্মপন্থার সঙ্গে লোকগীতগুলিকে জড়িয়ে নেবার কোন কারণ ঘটেনি। কথায় ও সুরে এই লোকগীতগুলি সরল অথচ শ্রুতিমধুর। এইসব গীতের সূত্রে আঞ্চলিকভাবে কোন রাগের বিকাশ ঘটেছে কিনা, এখনো তা প্রমাণিত হয়নি। কিন্তু এটাও সত্য যে আসামে কয়েকটি রাগ ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে প্রযোজিত পদ্ধতি থেকে পৃথকভাবে প্রয়োগ করে আসা হয়েছে। বরগীত থেকে এই কথাটা বেশ ভালোভাবে বুঝতে পারা যায়। বরগীত অবশ্য লোক সঙ্গীত পর্যায়ভুক্ত নয়—বরগীত বিশেষ বিশেষ রাগে বাঁধা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট তালে সন্নদ্ধ-বৈষ্ণবদের ভক্তিমূলক গীত। দুই মহাপুরুষ শ্রীশঙ্করদেব ও শ্রীমাধবদেব রচিত বরগীতের সংখ্যা 'ন কুড়ি এগারো'। মহাপুরুষদ্বয়ের আগামী অন্যান্য প্রচারক-কবিরাও গান রচনা করেছেন, কিন্তু সেগুলিকে বরগীত বলে স্বীকৃতি না দেবার পিছনে একটা অনমনীয় দৃঢ়তা সেকালেও কাজ করত, এখনো করে থাকে। এমনকি অঙ্কীয়া নাটকে একই পদ্ধতি, একই ভাষা এবং একই উদ্দেশ্য নিয়ে যে সব গীত রচিত, সেগুলিকেও বরগীত বলা হয় না। বৈষ্ণবদের দৈনন্দিন ধর্মানুষ্ঠানে বরগীতের স্থানটুকু বিশিষ্ট। গ্রামের কোন গাইয়ের যদি গানের গলা ভালো হয়, ভাওনা অভিনয়ে যদি সে সুদক্ষ হয়, তা হলে তার পক্ষে দু-চারটি বরগীত শিখে নেওয়া কঠিন নয়। এইভাবে শিখে নেবার ফলে বরগীতের জটিল সঙ্গীত পদ্ধতিটুকু খানিকটা দূর পর্যন্ত লোকস্তরেও প্রসারিত হয়েছে। বরগীতগুলি প্রায় ত্রিশটি রাগে বিন্যস্ত—সেই সব রাগের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। অন্য যেকোন ভারতীয় রাগের মতো এগুলি অনিবদ্ধ ও নিবদ্ধ উভয় অংশেই গীত হয়। বরগীতের ত্রিশটি রাগের উল্লেখ প্রাচীন ভারতীয় সঙ্গীত শাস্ত্র-গুলিতে পাওয়া যায়, একমাত্র কৌ' নামক রাগটির পরিচয় এখনো সন্তোষজনকভাবে

প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সাধারণত বরগীতের সঙ্গে কেবল খোল, মৃদঙ্গ ও নাগরা বাজানো হয় তালবাদ্যরূপে। কোন কোন অঞ্চলে সীমিতভাবে তূর্য-জাতীয় একটি স্বরযন্ত্র বাজানো হয়, অসমীয়া ভাষায় এর নাম হয় 'কালি'। কথিত আছে, শঙ্করদেবের একজন শিষ্য বরগীত গাইবার সময় সঙ্গে বীণার মতো একটি যন্ত্র বাজাতেন যার নাম রবাব। শঙ্করদেবের অনুগামিনী কোচবিহার রাজ পরিবারের জনৈকা মহিলা তাঁর গুরুর রচিত গান গাইবার সময় সারেঙ্গী বাজাতেন। এই দুটিই হল তার বাদ্য। আজ-কাল বরগীত গাইবার সময় কোন স্বর-যন্ত্র বাজানো হয় না। ইতিপূর্বে বলা হয়েছে বরগীতগুলি লোকগীত নয়; কিন্তু লোকগীত সৃষ্টিতে বহুবিস্তৃত প্রেরণা বরগীত অতীতেও যেমন জুগিয়েছে, তেমনি আজকের দিনেও। আজও লোকগীত গাইবার সঙ্গে যন্ত্রসঙ্গীত রূপে বাজানো হয় করতাল, একতারা, খঞ্জনীর মতো বাদ্য। প্রধানত কৃষ্ণকে কেন্দ্র করে যেসব গীত আজও কামরূপে রচিত হয়ে থাকে, সেগুলিকে বরগীতের গ্রাম্য সংস্করণ বলা যেতে পারে। এইসব লোকসঙ্গীত লোকরঞ্জনের একটি বিরাট উৎস, আজকের দিনের সঙ্গীতপ্রেমীরা ক্রমেই যেন এইসব গানকে বেশি করে সমাদর করতে শুরু করেছেন। দেহবিচারের বা দেহতত্ত্বের গানগুলি আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যেন বরগীতের অনুকরণ। এইসব গান একতারা বাজিয়ে বৈরগীরা ঘুরে ঘুরে গেয়ে বেড়ায়। বিয়ানাম, বিহুনাম এবং কামরূপী লোকগীতির সুরসম্পদ ক্রমেই বেশি করে প্রয়োগ করা হচ্ছে আধুনিক গানে। এ থেকেই প্রমাণ হয় লোকগীতি হল নবাবিষ্কৃত সম্পদ বিশেষ।

ইতিপূর্বে লোকগীতের সঙ্গে যেসব বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার হয়, তাদের কথা বলা হয়েছে। আবার সে প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। অনদ্ধ অর্থাৎ হাত বা আঙুলের কিংবা কাঠির আঘাতে যেসব বাদ্যযন্ত্র বাজানো হয় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঢোল, কাড়া, নাগরা, খোল, মৃদঙ্গ, জয়ঢাক ইত্যাদি। বিহুনাচে বাজানো হয় ছোট সাধারণ ঢোল। অন্য যন্ত্রগুলি ব্যবহৃত হয় ধর্মানুষ্ঠানে। খোল বৈষ্ণব সঙ্গীতের মুখ্য তালযন্ত্র। জয়ঢাক বাজানো হয় বিয়েতে। খঞ্জনী হল ঢোল ও করতালের সংমিশ্রণস্বরূপ ক্ষুদ্রাকার এক লঘুবাদ্য। টকা হল গোটা বাঁশের একটি মাথায় ফালি কেটে তারপর দুটি ফালির সংঘাতে টকাটক্ তাল বাজাবার সরল একটি বাদ্য। বিহুনাচ ও বিহুগানে তাল রাখবার জন্য টকা বাজানো হয়। অসমীয়া লোকসঙ্গীতের সঙ্গে যেসব শুষির অর্থাৎ সচ্ছিদ্র বায়ুযন্ত্র বাজানো হয় তারমধ্যে আছে বাঁশি, বোড়োদের সিফুং বাঁশি, কালি, খোঁপা, শিঙা ও গগণা। সিফুং এক ধরনের লম্বা বাঁশি যা বোড়োদের উৎসবে বাজানো হয়ে থাকে। কালি বাজানো হয়

বিবাহ উৎসবে—এর উন্নত সংস্করণ সানাইয়ের মতো। শিঙা (শিং শব্দ থেকে) হল মোষের শিঙে লাগানো একটি বাঁশের বায়ুযন্ত্র। কোন কোন পার্বত্য জাতির লোক মোষের শিঙের বদলে গোরুর শিঙও ব্যবহার করে থাকে। পেঁপা বিহুউৎসবে অপরিহার্য—এটিও মোষের শিঙে লাগানো সচ্ছিদ্র একটি নলখাগরার বাঁশি মাত্র। গগণা হল বেণু— যুবতী মেয়েরা নাচতে নাচতে বেণু দাঁতে কামড়ে ধরে, ডানহাতের তর্জনীটি ছিদ্রের উপর রেখে ইচ্ছামতো বায়ু চেপে কিংবা ছেড়ে দিয়ে বাজায়। গ্রামের লোক যেসব তারযন্ত্র বাজায় তার মধ্যে আছে টোকারী, বীণ এবং সেরজা অথবা সেরেন্দা। টোকারী বাজানো হয় একতারা কিংবা তানপুরার মতো— লোকগীতের গাইয়েরা এবং দেহতত্ত্ব গান গাইয়ে ভ্রাম্যমান বৈরাগীরা এই যন্ত্র প্রচুর ব্যবহার করে। সেরজা বা সেরেন্দা হল বোড়োদের বাদ্যযন্ত্র—সারেঙ্গী যন্ত্রের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি মিল। সারেঙ্গীর মতো সেরেঙ্গাও বাজাতে হয় ছড়ের সাহায্যে— কারো কারো মতে সারেঙ্গী হল সেরেন্দার উন্নত সংস্করণ। বীণও বাজাতে হয় ছড় দিয়ে। গাঁয়ের যুবকেরা সুরেলা লোকগীতের কলি গাইতে গাইতে যখন সন্ধ্যায় বেড়াতে বের হয়, বীণখানি সঙ্গে রাখে। 'বীণ' কথাটি প্রণিধানযোগ্য—উত্তর ভারতের 'বীণা' বলতে যা বোঝায় বীণও তাই। প্রাচীন কালে সকল প্রকার তারযন্ত্রকেই বীণা বলা হত। আসামেও বীণ-বরাগী (বীণা বৈরাগী) নামে একশ্রেণীর ভ্রাম্যমান লোক ছিল, যারা বীণ বাজিয়ে গান গেয়ে ঘুরে বেড়াত। ঘন শ্রেণীর বাদ্যের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল তাল। বিভিন্ন রকমের তাল আছে, যথা—ভোড়তাল, খুটিতাল, করতাল, মন্দিরা ইত্যাদি। ভোড়তাল এইসব তালযন্ত্রের মধ্যে সবচেয়ে বড়। ভোড়তাল বৈষ্ণবেরাই বেশি ব্যবহার করে—বলা হয়, এই বাদ্যযন্ত্রটি ভোট অর্থাৎ ভুটীয়াদের কাছ থেকে আমদানী করা হয়েছে। সবচেয়ে ছোট তাল হল খুটিতাল অথবা কত্তাল যা না কি ওজা-পালির দল ব্যবহার করে। পূজা কিংবা আরতি যখন বেশ জমে উঠে, তখন একটা চেপ্টা ধ্বনিবাদ্য বাজানো হয়, যার নাম কাঁহ অর্থাৎ কাঁসর। আর বাজানো হয় ঘণ্টা। এ-দুটিও ঘন শ্রেণীর বাদ্য।

□□

নির্দেশপঞ্জী

□□